

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য গোস্ট কিংস

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু



অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য গোস্ট কিংস

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

পাহাড়ি ঢল যখন র্যাচেলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক তখন ঈশ্বর প্রেরিত দূত হয়ে ওকে বাঁচাতে এল রিচার্ড ড্যারিয়েন। প্রেমের দেখা পেল ও। প্রমত্তা নদী, পাহাড়ি ঢল আর হিংস্র সিংহের থাবা এড়িয়ে বেঁচে যাওয়ায় নেটিভরা ওর নাম দিল ইনকোসাজানা অর্থাৎ স্বর্গীয় কন্যা। জুলুল্যাণ্ডে ইনকোসাজানার উপস্থিতি চাইল রাজা ডিনগান। বোয়েরদের সাথে লড়াইয়ে যাবে কিনা, ইনকোসাজানার কাছে তা জানতে চাইল ডিনগান। ওদিকে প্রথম দর্শনেই র্যাচেলের প্রেমে পড়ল নিশাচর ইসমাইল। ডিনগানের সাথে ষড়যন্ত্র করে র্যাচেলের বাবা-মাকে হত্যা করল ইসমাইল। চাইল বন্দি করে ওকে দখল করতে। একই সময় সবার চোখে মৃত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো রিচার্ডকে। শেষ আশ্রয় রিচার্ডকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেল র্যাচেল। এখন, ডিনগান কি তার প্রশ্নের উত্তর পাবে? র্যাচেল কি ফিরে পাবে নিজেকে? আবার কি ফিরবে রিচার্ড? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে র্যাচেলের সাথে আমাদেরও যেতে হবে বামুনভূত জাতির এলাকায়, বিশাল মহীরুহের বনে। চলুন তা হলে রওনা হওয়া যাক অন্ধকার আফ্রিকার গহীনে।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

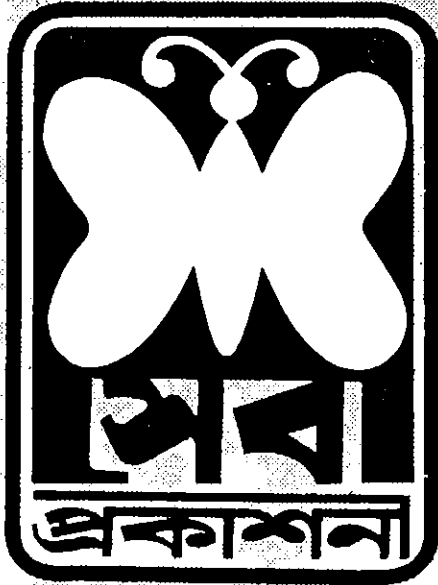
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
দ্য গোস্ট কিংস
রূপান্তর ■ সাইফুল আরেফিন অপু



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3271-3



একশ' ছেচল্লিশ টাকা

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব, অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রুনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮

mail: alochonabibbhag@gmail.com

webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE GHOST KINGS

By: Sir Henry Rider Haggard

Trans. By: Saiful Arefin Aupu

দ্য গোস্ট কিংস

‘১২ই মে, ১৮৫৫ তারিখ, রাজার ক্রাল, জুলুল্যাণ্ড’ শিরোনামের চিঠির উল্লেখযোগ্য অংশ:

স্থানীয় জুলুদের মাঝে শ্বেতাঙ্গ এক নারীকে নিয়ে একটা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে।

গল্প মতে, রাজা ডিনগানের আমলে এক শ্বেতাঙ্গ নারীর দেখা পেয়েছিল জুলুল্যাণ্ড, যার ভেতর বাস করত দেবীর আত্মা! লোকে বলে ওই নারী ছিল দারুণ সুন্দরী ও ভীষণ সাহসী। তাকে ডাকা হতো জুলুদের আত্মা, সংক্ষেপে জুলা নামে। বলা হয়, কুখ্যাত ‘ব্লাড রিভার’ যুদ্ধের আগের সময়টায় জুলুদের ওপর তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। সে ছিল কোন এক পরিব্রাজক-মিশনারির কন্যা। মেয়েটির মা-বাবাকে হত্যা করিয়েছিল জুলু রাজা ডিনগান। বাবা-মা হারানোর শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। তখন সে জুলুদেরকে অভিশাপ দিয়েছিল। জুলু রাজা ডিনগানের মৃত্যু, যুদ্ধে তাদের পরাজয় ও অন্যান্য দুর্ভাগ্যের জন্য জুলুরা এখনও এই অভিশাপকেই দায়ী ভাবে।

ওই নারীর অপদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য বনের গভীরে বসবাসকারী এক বামুন জাতির পুরোহিতদের কাছে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল জুলুরা। জানা যায়, অরণ্যচারী ওই বামুনরা ছিল বৃক্ষ পূজারী। এরপর থেকেই ওই নারীর ব্যাপারে আর কোন কথা শোনা যায়নি। জুলুদের মতে ওই ঘটনার পর অভিশাপও থেমে গিয়েছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে আরো কিছু জানতে বা শুনতে পেলো তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাব। তবে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে যে, এই ব্যাপারে আর কোন খবর পাব কি না। ডিনগান মারা গেছে ১৮৪০ সালে। এরপর পনেরো বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও জুলুরা ওই নারীর ব্যাপারে মুখ খোলে না। আর জুলুরা যতটুকুই বলেছে, আমাকে তাদের বন্ধু ভেবে বলেছে। ভেবেছে আমি সরকারী লোক নই বা মিশনারীও নই তাই আমাকে অল্প-স্বল্প বললে অসুবিধা নেই। জুলুদের মুরুব্বীদের কাছে প্রথমে যখন এই শ্বেতাঙ্গ নারীর ঘটনা জিজ্ঞেস করি, ওরা সোজা বলে দিয়েছিল এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। পরে আমার চাপাচাপিতে ওদের একজন শুধু বলেছিল যে, মোপোর মৃত্যুর সাথে ওই দুর্ভাগ্য আনয়নকারীর ঘটনাও অতীত হয়ে গেছে।

এ যাত্রা বলে রাখি, আমার সন্দেহ, ডিনগানের ভাই, সাবেক রাজা চাকাকে ছুরি মেরে হত্যা করেছিল এই মোপো। এমনকী ডিনগানের মৃত্যুর পেছনেও তার হাত আছে বলে অনেকের সন্দেহ। তবে জুলুল্যাণ্ডের সিংহাসনে পাণ্ডা বসার পর থেকেই লাপান্তা হয়ে গেছে মোপো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

‘অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন’ কালোদের মাঝে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের মিশন নিয়ে সপরিবারে নেটালের গভীরের দিকে চলেছে মি. ডাভ। তার বর্তমান ক্যাম্প পণ্ডা ল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী এলাকায় সাগর তীর থেকে আনুমানিক দুই মাইল ভেতরে উঁচু একটা জমির ওপর।

সকাল থেকেই গুমট হয়ে ছিল আবহাওয়া। এখন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে পুরো আকাশ। মেঘ এতই ঘন হয়ে উঠেছে যে এই ভর দুপুরেও শেষ বিকেলের মতো আঁধার ছেয়ে আছে। সুপের মতো ঘন হয়ে গেছে বাতাস, দম নেয়াই দায়। আর গরমের কথা বলাই বাহুল্য। অস্বাভাবিক, ভয়াবহ যা-ই বলি না কেন গরমের প্রচণ্ডতা লিখে বোঝানো যাচ্ছে না। র‍্যাচেলদের কাফ্রি ড্রাইভার টমের ধারণা, একটা ঝড় ঘনিয়ে আসছে। ভয়াবহ ঝড়। টমের ভাষায় ঝড়ের বাপ। এবার হয়তো খরার অবসান হবে।

ঝড় বাদল হলে গবাদিপশুরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ঠিকমতো সামলে না রাখলে দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে যায় ওগুলো। অভিযাত্রীর তখন ভোগান্তির আর শেষ থাকে না। বলা বাহুল্য, এই জনবিরল দেশে ষাঁড় ছাড়া মালামালা আর ওয়াগন নিয়ে এক পা নড়াও সম্ভব না। তাই ঝড়ের আশঙ্কায়

কাছাকাছি একটা পাহাড়ের গুহায় পাঠানো হয়েছে ওয়ানগন আর ষাঁড়। ওগুলো দেখে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দুজন কাক্সিকে। ওদের সাথে টম-ও গেছে।

গত রাতেই মারা গেছে র্যাচেলের কয়েক দিন বয়সী ছোট্ট ভাইটা। আজ ওর মৃতদেহ দাফন করা হবে। তবুও পাহাড়ে পাঠানো গবাদিপশুর দেখাশোনার কাজ “তদারক” করতে চলে গেছে টম। তদারকিটা আসলে অছিলা। আসল কথা হচ্ছে, কোন সমাহিতকরণে ও থাকতে চায় না। লড়াইয়ে অ্যাসেগাইয়ের আঘাতে মৃত্যু হলে সেটা নেটিভদের সহ্য হয়। কিন্তু অন্য কোনভাবে মৃত্যু তাদের খুবই অপছন্দ। টমও এর ব্যতিক্রম নয়। কয়েকদিন মাত্র বেঁচে ছিল র্যাচেলের ভাইটা। কিন্তু এ কয়দিনেই ক্যাম্পের আর সবার মতো টমও ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিল ওকে। এখন মাসুম বাচ্চাটার মৃতদেহ কবরে শোয়ানো সহ্য করতে পারছে না ও। তাই ষাঁড় দেখাশোনার অছিলায় সরে গেছে।

খরা চলছে অনেকদিন হয়। শুকিয়ে পাথরের মতো খটখটে হয়ে আছে মাটি। পাথুরে মাটি যতটুকু সম্ভব খুঁড়ে কবর বানানো হয়েছে। বাচ্চাটাকে কবরে শোয়ানোর আগে অন্তিম প্রার্থনা করল র্যাচেলের বাবা। তারপর ছোট্ট দেহটা কবরে শুইয়ে লাল মাটি ফেলে ঢেকে দিল। কবরের ওপর পাথর বিছিয়ে দিল যেন শ্বাপদের দল সহজে মাটি খুঁড়তে না পারে। বাচ্চাটাকে কবরে নামানোর সময় র্যাচেল ছাড়া আর কেউ কবরের পাশে রইল না। অবশ্য পাশেই একটা পাথরের ওপর বসে থাকা দুটো খরগোস আর গাছের ডালে বসে থাকা একটা বেবুনকে যদি দর্শক ধরা হয়, তাহলে দর্শক সংখ্যা বাড়বে বৈকি।

এই শুকনো মৌসুমে ফুল পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই বাচ্চাটার কবরে কোন ফুল জোটেনি। মিমোসা গাছের দুটো শুকনো ডাল

আড়াআড়ি বেঁধে কবরের ওপর যেনতেনভাবে একটা ক্রুশ দাঁড় করানো হয়েছে কেবল।

র্যাচেলরা কবরের পাশ থেকে চলে যাওয়ার পর গাছ থেকে নেমে এল কৌতূহলী বেবুনটা। ওদের দেখাদেখি একটা পাথর ঠেলে দিল কবরের ওপর। তারপর নিজের ভাষায় ডাকাডাকি করতে করতে সরে গেল ওখান থেকে। ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। তবে সেটা দেখার জন্য ওখানে কেউ নেই।

বাচ্চাটাকে কবরে শোয়ানোর সময় ওর মা সেখানে উপস্থিত হতে পারেনি। জ্বরে বিছানা থেকে মাথা তোলার জো নেই তার। ওয়াগনের পর্দার কাপড় দিয়ে বানানো তাঁবুর ভেতর চামড়ার বিছানায় শুয়ে আছে মিসেস ডাভ। রোগে শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে মহিলাটির চেহারা, অকালে পাক'ধরতে শুরু করেছে চুলে। পর্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে দমকে দমকে কাঁদছে সে। মায়ের এই বেদনাতুর অবস্থার ছবি চিরকাল গঁথে রইবে র্যাচেলের মনে। তাঁবুর একটা পাশ তুলে রাখা হয়েছে, যেন একটু হলেও বাতাস ভেতরে ঢোকে।

ভীষণ শোকাতুর হয়ে আছে র্যাচেলের বাবাও। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সাধুসুলভ উজ্জ্বল চেহারা। ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে পরস্পরের ওপর। তাঁবুতে ঢুকে নার্ভাস হাতে পুরোহিতের সাদা আলখেল্লাটা গা থেকে খুলে দ্রুত গুছিয়ে ফেলল সে। পাশে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে বাবা-মা দুজনেরই দেখছে র্যাচেল। কাপড় গোছানো শেষ হলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওর বাবা। কণ্ঠে চেঁচামেচি উৎফুল্লতা এনে শোকসন্তপ্ত স্ত্রীকে বলল, 'কেঁদো না, জেনি। মনে রেখো, যা হয়, সবার মঙ্গলের জন্যই হয়। ঈশ্বর কিছু নিলে তাতেও কল্যাণ ও তাঁর আশীর্বাদ থাকে।'

কষ্ট করে উঠে বসল র্যাচেলের মা। স্কটিশ টানে শান্ত কণ্ঠে

স্বামীকে সে বলল, ‘গ্রাহামস্ টাউনে থাকতে আমাদের আগের সন্তানটা যখন মারা গেল, তখনও একই কথা বলেছিলে তুমি, জন। কিন্তু এই কথা আর শুনতে চাই না। না, ঈশ্বরের ভুয়া আশীর্বাদের আমার দরকার নেই। শুধু আমি কেন, মায়ের কোল থেকে সন্তান তুলে নিলে কোন মা-ই এমন আশীর্বাদ চাইবে না। ঈশ্বর চাইলেই তো ওকে ছেড়ে দিতে পারত! আর ঠিক এই সময় আমাকেই বা কেন জ্বরে ফেলল ঈশ্বর? যেন আমার সন্তানের পরিচর্যা করতে না পারি—সেই জন্য? আর এই সময়ই বা কেন আমাদের দুধেল গাইটাকে সাপে কামড়াবে? এই সবই যদি ঈশ্বরের লীলা হয়, তাহলে বলব জংলী কালোদের দেবতারাও তাঁর চেয়ে অনেক দয়াবান!’

সাথে সাথে তাকে থামাতে গেল র্যাচেলের বাবা মি. জন। বলল, ‘না, না, এভাবে বোলো না, জেনি, ধর্মদ্রোহিতা হয়ে যাবে যে। তোমার তো এখন খুশি থাকার কথা, কারণ তোমার সন্তান এখন স্বর্গে আছে।’

‘তুমি থাকো তোমার খুশি নিয়ে, আমাকে আমার শোক নিয়েই থাকতে দাও। আজ থেকে আমার একটাই প্রার্থনা, আর যেন আমার কোন সন্তান না হয়,’ বলে থেমে গেল মিসেস ডাভ। কিন্তু পরমুহূর্তেই রীতিমত বিস্ফোরিত হলো সে। সমস্ত রাগ সে ঢেলে দিল স্বামীর ওপর। বলল, ‘সব তোমার দোষ। আমি আগেই বলেছিলাম এ-ই হবে। বলেছিলাম, অসময়ে যাত্রা শুরু করলে বাচ্চাটা ধকল সহিতে পারবে না, মারা পড়বে। কিন্তু আমার কথা তুমি শুনলে না। আমি বলে রাখছি এই যাত্রা শেষ হবার আগেই আমরা সবাই মারা পড়ব। তবু র্যাচেল বাঁচবে। আর আমার কথা কী বলব, যত তাড়াতাড়ি মরি তত মঙ্গল। আমার বাচ্চাদের কাছে যেতে পারব আমি।’

‘কী বলছ এসব! এ যে শয়তানি কথা। ধর্মদ্রোহিতা...’

‘শয়তানি, জন? ধর্মদ্রোহিতা? আমার মায়ের মতো প্রকৃতি-
প্রদত্তভাবেই আমারও অন্তর্দৃষ্টি আছে। সেটাও শয়তানি? তাহলে
তো বলতে হয় আসল শয়তান খোদ প্রকৃতি। তোমাকে বিয়ে
করলে কী হবে তা আগেই বলেছিল আমার মা। কিন্তু আমি
শুনিনি। গতবার আমিই তোমাকে সাবধান করলাম, কিন্তু তুমিও
শুনলে না। এখন র্যাচেল ছাড়া আমাদের সবাইকেই এর
পরিণতি ভোগ করতে হবে। শুনে রাখো, যে তোমাকে টেনে
নিচ্ছে তার একটাই সাধ, তোমার বলি নেবে সে,’ বলল জেনি
অর্থাৎ র্যাচেলের মা।

এবার গর্বভরে জবাব দিল প্যাস্টর, ‘ঈশ্বর তাঁর বাণী
প্রচারের জন্য আমার বলি নেবেন? আমার জন্য এর চেয়ে বড়
সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?’

‘দাও, আত্মবলি দাও। কিন্তু, ধর্মের নামে তোমার
পাগলামীর জন্য আমাদের সন্তান কেন মরবে? তোমার মতো
অতি ধার্মিক লোকের বিয়ে করা বা সন্তান নেয়া কখনোই উচিত
না, জন!’

আর সহ্য হলো না র্যাচেলের। ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে
গেল ও। ক্যাম্পের কাছেই একটা পাথরের ওপর বসে সজল
নয়নে তাকিয়ে রইল সাগরের লোনা পানির দিকে। র্যাচেলের
বয়স মাত্র পনেরো। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে ধরে
নেয়া হয় এই বয়সেই নারীত্বের পূর্ণতা পেয়ে যায় মেয়েরা।

র্যাচেলের জন্মের কয়েকদিনের মাথায় লওনে কোন এক
কনফারেন্সে গিয়ে বিদেশে ধর্ম প্রচারের ভূত চাপে ওর বাবার
মাথায়। যদিও হেটফোর্ডশায়ারে থাকতেই সম্মানজনক জীবিকা
সহ খ্রিস্ট ধর্মীয় পুরোহিতের পেশায় রত ছিল সে। কিছু পৈত্রিক
সম্পত্তিও ছিল তার। ওগুলো থেকে যৎসামান্য আয়ও হতো।
কিন্তু এসবের কিছুই আর তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি।

র্যাচেলের বয়স তখন মাত্র চার বছর। ফলে ইংল্যান্ডের কোন স্মৃতিই ওর নেই।

যা হোক, মি. ডাভের আফ্রিকায় আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এখন অবস্থা এমন যে, র্যাচেলের মাকে হয় ইংল্যান্ডে থেকে যেতে হবে, নয়তো মি. ডাভের সাথে রওনা হতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে। মাঝামাঝি কিছু করার উপায় নেই। কারণ “আত্মার ডাক” উপেক্ষা করার মতো “পাপ” কোনমতেই করবে না মি. ডাভ। নেটিভ কাফ্রিদের মাঝে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে দক্ষিণ আফ্রিকা সে আসবেই।

ধর্ম সংক্রান্ত বাতিক্ষণ্ততা বাদ দিলে আসলে খুবই ভাল একজন মানুষ মি. ডাভ। কাজেই স্ত্রী হিসেবে তার প্রতি ভালবাসা থাকাই জেনির জন্য স্বাভাবিক। সুতরাং সবার বাধা উপেক্ষা করে স্বামীর সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে সে-ও রওনা হয়। তবে রওনা হবার আগে গম্ভীর কণ্ঠে একদিন হঠাৎ সে বলে, তার মন কু-ডাক দিচ্ছে। তার মনে হচ্ছে স্বদেশ বা আত্মীয় স্বজনদের মুখ আর কখনো দেখবে না তারা। আফ্রিকার অসভ্য জংলীদের হাতেই মৃত্যু হবে তাদের সবার।

মিসেস ডাভের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাক বা না যাক, তার নিজের দৃঢ়বিশ্বাস যে এটা ঘটবেই। ব্যাপারটা তার মাকে সহ পরিবারের অন্যান্যদেরও জানিয়েছিল সে। তার মনোভাব নিয়ে এক বিন্দুও সন্দেহ করেনি ওরা। কারণ মিসেস ডাভের মা সহ তার পরিবারের অনেকেই এমন ক্ষমতা আছে। অন্তত তাদের বিশ্বাস, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে তাদের। কাজেই মিসেস ডাভ অর্থাৎ জেনির “মনে হওয়াটাকে” অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে তারা। চেয়েছে এই অনিশ্চিত যাত্রা থেকে মি. ডাভকে ফেরাতে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মি. ডাভ নিজেও স্ত্রীর কথা অবিশ্বাস

করেনি। তবে তার মনোভাব “যখন হবে তখন দেখা যাবে”।
তাই স্ত্রীকে প্রস্তাব করল যে, ইংল্যাণ্ডেই থেকে যাক সে। দক্ষিণ
আফ্রিকায় একাই রওনা হবে মি. ডাভ। কিন্তু, তখন অভাবনীয়
দৃঢ়তা দেখাল তার স্ত্রী জেনি। বলল, ভালো-মন্দ সবকিছুতে এক
সাথে থাকার, এক সাথে সব বিপদ মোকাবেলা করার শপথ
নিয়ে মি. ডাভের স্ত্রী হয়েছে সে। কাজেই লম্বা সময় একা বেঁচে
থাকার চেয়ে স্বামীর সাথে জংলীদের হাতে মরে যাওয়াও তার
জন্য অনেক সুখের।

এরপর আর কথা থাকতে পারে না। একটা পাল তোলা
জাহাজে চেপে স্ত্রী আর এক মাত্র কন্যা র্যাচেলকে নিয়ে দক্ষিণ
আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে যায় মি. ডাভ। সেদিনের পর থেকে
তাদের সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনেনি তাদের আত্মীয়
পরিজনদের কেউ।

এরপর থেকে আজকে সন্তান কবরে শোয়ানো পর্যন্ত মি.
ডাভের কার্যক্রমের ইতিহাস খুব সংক্ষেপেই বলা যায়, যা এমন:

মিশনারী হিসেবে কেপ কলোনিতে একেবারেই অসফল মি.
ডাভ। নিজের প্রাতিষ্ঠানিক উর্ধ্বতনের “একটু” বাঁকা কথা মেনে
নেয়া তার দ্বারা সম্ভব ছিল না। সেই সাথে তার দূরদৃষ্টির অভাব।
বোয়েররাও তাকে ভাল চোখে দেখত না। আর যেভাবে সে
নেটিভদের আলোর পথে আহ্বান করতে লাগল তা-ও ওদের
পছন্দ হয়নি। আরেকটা ব্যাপার সে মাথায় নেয়নি যে কালোকে
তাদের হাজার বছরের সংস্কার দুদিনেই মাথা থেকে ঝেড়ে
ফেলতে পারে না। তাদেরকে সময় দিতে হয়, তালিম দিতে
হয়। তারপর তাদের ভেতর একটু একটু করে পরিবর্তন আনা
সম্ভব। কিন্তু তা না করে তীব্রভাবে ওদের কেটাক্ষ করে প্রকাশ্যেই
সে বলতে থাকে যে, কালোরা সব নরকে যাবে। সুতরাং, তার
সম্বন্ধে কালোদের মনোভাব কী হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

ভিনদেশি ধর্ম আর ধর্মপ্রচারককে পছন্দ করতে কালোদের বয়েই গেছে।

ওদিকে স্থানীয় চার্চের কার্যকলাপ তার মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে বিমোদগার করে ইংল্যাণ্ডে অভিযোগ পাঠায় সে। ব্যাপারটা আমলে নিয়ে বুকে প্রকাশও করে চার্চ পাবলিকেশন। এক সময় সেটার কপি কেপ কলোনিতেও এসে পৌঁছায়। ফলে তার ওপর ভীষণ, ভীষণ রেগে যায় স্থানীয় চার্চ কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে-বোয়েররা তার পক্ষে নেই, বোয়েরদের কালো দাস-ভৃত্যরা তার পক্ষে নেই, স্থানীয় চার্চ তার পক্ষে তো নেই-ই, এমনকী খোদ ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় চার্চ কর্তৃপক্ষ থেকেও তার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। সোজা ভাষায় বললে কেপ কলোনিতে তাকে স্থান দেবার মতো পরিস্থিতিই আর 'রইল না। তদুপরি, তাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে বসেছে বোয়েররা। অবস্থা এখন এমন যে, বাঁচতে হলে তাকে হয় এই দেশ ছাড়তে হবে, নয়তো ধর্ম প্রচার থামাতে হবে। তবে ধর্ম প্রচার থামাবার বান্দাই সে না। কাজেই কেপ কলোনি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল মি. ডাভ।

মিসেস ডাভ তখন প্রস্তাব দিল যে, ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হওয়াই ভাল। তাতে নিজের লোকদের সামনে অন্তত এখানকার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে এর প্রতিকার ও বিচার চাওয়া যাবে। প্রথম প্রথম পরামর্শটা ভালই লাগল মি. ডাভের। কিন্তু এক রাতের প্রার্থনা আর কিছু চিন্তাভাবনার পর সে সিদ্ধান্ত নিল, ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলে বিলাসী জীবন পাওয়া যাবে মনে, কিন্তু তা হবে শয়তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করা। আর সফল ধর্মপ্রচারকের মহিমা থেকেও বঞ্চিত হবে সে। এমন কিছু করার চিন্তা এমনকী অতিবড় দুঃস্বপ্নেও সে করে না। তাই স্ত্রীকে সে বলল, র্যাচেল ও তাদের অপর পুত্র সন্তানকে নিয়ে জেনি একাই

যেন ইংল্যান্ডের পথে রওনা হয়ে যায় (এর মধ্যে তাদের দুটো কন্যা সন্তান মারা গেছে। কেপ কলোনিতেই দাফন করা হয়েছে তাদের।)।

এরই মধ্যে কিছু ইংরেজ অভিযাত্রীর সাথে কথা হয়েছে মি. ডাভের। তাদের কাছ থেকেই শুনেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার গভীরে নেটাল নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে কিছু শ্বেতাঙ্গ পরিবার। ওখানে জুলু নামে একটা বড়সড় লড়াকু জাতি বাস করে। তাদের রাজার নাম চাকা বা ডিনগান। তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের পবিত্র বাণী প্রচার করতে যাবে সে। যদিও শুনেছে এই রাজা খুবই হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তারপরও ঝুঁকি নেবে প্যাস্টর। জুলুদের ধর্মের খারাপ দিকগুলো সম্বন্ধে তাদেরকে অবগত করবে। সেই সাথে চেষ্টা করবে ওদের বহু-স্ত্রী রাখার প্রথা সংশোধনের।

নীরবে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীর কথা শুনে গেল মিসেস ডাভ। তার ভেতর বিশ্বাসটা আরো দৃঢ়মূল হয়েছে যে, ধর্মপ্রচার নামের পাগলামি করতে গিয়েই শহীদ হয়ে যাবে তারা সবাই। মিসেস ডাভ এটাও বিশ্বাস করে যে, সহজে ওই নেটিভদের খ্রিস্টান বানানো যাবে না। অন্তত এখনই নয়। আর বহু-স্ত্রী রাখার প্রথার ব্যাপারে তার নিজস্ব ধারণা হচ্ছে, ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ নয়। খারাপই যদি হতো তাহলে খোদ নবী ডেভিড, নবী সলোমন, এমনকী নবী অাব্রাহাম [পড়ুন দাবিদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ) ও ইব্রাহিম (আঃ)] এঁদেরকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কখনোই দিতেন না ঈশ্বর। সর্বোপরি তার স্থির বিশ্বাস, জুলুল্যান্ডের দিকে এগুলো এক র্যাচেল ছাড়া বাকি সবাই জংলীদের হাতে বা অন্য কোনভাবে ক্ষতি পড়বেই। কিন্তু তারপরও, স্বামীকে ছেড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক সে। আর র্যাচেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার বিশ্বাস, এমনকী জংলীদের

মাঝেও ভালই থাকবে সে। এটাই র্যাচেলের নিয়তি। কাজেই স্বামীর সাথে অজানার পথে রওনা হলো মিসেস ডাভ।

এগুলোই ভাবছে র্যাচেল। বাবা-মায়ের পুরো গল্পটা ও জানে না। তবে বেশিরভাগই যেহেতু ওর চোখের সামনে ঘটেছে আর অনেকখানি মায়ের মুখে শুনেছে, সেহেতু বাকিটা অনুমান করে নেয়াও খুব কঠিন কিছু না। এসব নিয়ে অবশ্য র্যাচেলের খুব একটা মাথা ব্যথাও নেই। বাবার সম্বন্ধে ওর ধারণা, খুব মহৎ একটা কাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মায়ের চিন্তাধারাকেই সমর্থন করে ও।

মায়ের সৌন্দর্য ইতিমধ্যেই ফুটতে শুরু করেছে র্যাচেলের ভেতর। মায়ের মতোই বিশ্বস্ত মেয়ে সে। সেই সাথে যোগ হয়েছে বাবার চমৎকার গঠনের প্রভাব। মানসিকভাবেও ও খুবই দৃঢ়। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ওর ভেতর খুব স্পষ্টভাবে কাজ করে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। সন্দেহ কী, মায়ের এই গুণটাও পেয়ে গেছে ও।

এই মুহূর্তে র্যাচেলের মন ভীষণ খারাপ। না, গরম বা যাত্রার শ্রম ওকে কাবু করতে পারেনি। এসবে অভ্যস্ত ও। মন খারাপ ওর ভাইয়ের জন্য। ছোট ভাইটাকে খুব ভালবেসেছিল ও। ওর মারা যাবার ইঙ্গিত র্যাচেল আগেই পেয়েছে। কিন্তু ও ভেবেছে ঘটনাটা আরো পরে ঘটবে। কিন্তু তা আর হলো কই? মাকেও র্যাচেল খুব ভালবাসে। নিজের জন্য ওর যতটুকু কষ্ট, মায়ের কষ্ট দেখে ওর ভেতরটা গুমরে ওঠে আরো অনেক বেশি। আর বিশেষত, এখন মাকে অসুস্থ দেখে খারাপ লাগাটা আরো বেশি কাজ করে। মায়ের মতো ও-ও মনে করে আলেয়ার পিছে ছুটছে ওর বাবা। নেটিভদের ভাষায়, তারার পেছনে ছুটছে। কখন যে তাকে পৃথিবীর প্রান্তে নিয়ে যাবে সেই তারাটা, তা সে টেরও পাবে না। পেছনে ফেলে আসা গ্রাহামস টাউনও মিস করে

র্যাচেল। কারণ আর সব কিছু বাদ দিলেও ওখানে অন্তত কিছু বস্তু ছিল ওর। বোয়েরদের স্থানীয় ভাষায় ওদের মতো করে র্যাচেল কথা বলতে পারত না, কিন্তু ছিল তো তারা ওরই মতো শ্বেতাঙ্গ! এখন অবশ্য সবই অতীত। বাবা পাশে থেকেও নেই। সারাক্ষণ স্বর্গের চিন্তায় ব্যস্ত সে। আর মা ব্যস্ত অতীত স্মৃতি রোমন্থনে। এদিকে একা গুমরে মরছে র্যাচেল।

ভীষণ একা হয়ে গেছে ও। চোখ দুটো জলে ভরে আছে। ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ থেকে অশ্রু মুছে ফেলল। তখনই চোখে পড়ল পায়ের সামনে একটা কাঠি নিয়ে লড়াই করছে দুটো প্রেয়িং মেনটিস (দক্ষিণ আফ্রিকান পতঙ্গ, এক জাতের ঘাস ফড়িং)। হটেনটটরা এগুলোকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করে। র্যাচেলের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল লড়াইরত এক ঘাস ফড়িংয়ের ওপর। সম্ভবত ওটা ভাবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই ছুটে পালাল এই ফড়িংটা। আর দিগ্বিজয়ীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল অপর ফড়িংটা। ঠিক তখনই পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল র্যাচেল। বাবা আসছে। চোখ মুছে ফেলল ও।

মি. ডাভ এসে র্যাচেলকে জিজ্ঞেস করল, ‘কাঁদছ কেন, র্যাচেল? ভাইয়ের জন্য? ওকে তো স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে, ওর জন্য চোখের পানি ফেলা ঠিক নয়।’

জবাবে র্যাচেল বলল, ‘ল্যাজারাসের জন্য অশ্রুপাত করেছিলেন স্বয়ং যীশু। সে এমনকী যীশুর ভাইও ছিল না। যাক ওসব। আমি কাঁদছিলাম না, বাবা। দুটো “হটেনটট দেবতার” লড়াই দেখছিলাম।’

র্যাচেলের প্রথম কথার কোন জবাব দিতে পারল না মি. ডাভ। তবে দ্বিতীয়টা ধরে বসল। বলল, ‘খারাপ কাজ। শুনেছি, বোয়েরদের বাচ্চা ছেলেরা তো বটেই, এমনকী বড়রাও এমন

দুটো পতঙ্গের লড়াই বাধায়। তারপর ওগুলোর হারা-জেতা নিয়ে বাজী ধরে।’

মাথা ঘুরিয়ে ভাইয়ের কবরটার দিকে তাকিয়ে রইল র্যাচেল। বলল, ‘আমি নই, বাবা, খারাপ হচ্ছে প্রকৃতি।’

কথাটার কোন উত্তর দিতে পারছে না ওর বাবা। দ্বিধামস্ত হয়ে গেছে সে। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘মায়ের অবস্থা এখন কেমন, বাবা, ভালর দিকে?’

‘নাহ্, সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছে সে। বাস্তব আর কল্পনার পার্থক্য করতে পারছে না।’

বাবার দিকে ফিরল র্যাচেল। বলল, ‘মাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলছ না কেন, বাবা? আত্মীয়-বান্ধবহীন বন্য পরিবেশে এই অসুস্থ অবস্থায় তাকে টেনে নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না।’

ভীষণ রেগে গেল মি. ডাভ। আত্মার ডাক সে শুনবেই, এই পথ থেকে তাকে ফেরানো সম্ভব না ইত্যাদি বলে আবোল তাবোল বকা শুরু করল সে।

তখন আবার মুখ খুলল র্যাচেল। বলল, ‘কিন্তু, বাবা, মা-ও যে একটা “ডাক” শুনতে পেয়েছে!’

তৃতীয়বারের মতো কথা হারাল মি. ডাভ। তারপর বলতে থাকল মা-মেয়ে একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঈশ্বরের পথ থেকে তাকে ফেরাতে চাইছে সবাই। তার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে ফেরাতে তার দুর্বলতাকে ব্যবহার করছে শয়তান। একই সাথে মা-মেয়েকেও ব্যবহার করছে সে। কিন্তু কিছুতেই সে বিভ্রান্ত হবে না। পথের শেষ পর্যন্ত সে যাবেই... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল র্যাচেল।

রাগ কমার পর একটু স্থির হয়ে মি. ডাভ বলল, ‘খুব অস্থির একটা সময় পার করছি আমরা। সম্ভবত তীব্র গরম আর দুর্ঘটনা

দিয়ে আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন ঈশ্বর। তোমাকে কী যেন বলতে এসেছিলাম? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার মা কিছুই মুখে তুলছে না। ফল খেতে চাইছে। তুমি কি জানো, এখানে ওসব কোথায় পাওয়া যেতে পারে?’

প্রথমে না করল র্যাচেল। কিন্তু পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, ‘কয়েক দিন আগে এক জায়গায় কিছু ফল দেখে এসেছি। আমাদের ক্যাম্পের বেশ খানিক পেছনে শুকনো নদীর মাঝে দ্বীপ মতো একটা জায়গা আছে। ফুল তুলতে ওখানে গিয়েছিলাম আমি আর মা। ওখানেই কেপ ওসবেরি দেখেছি। অনেক বেরি জন্মে আছে ওখানে। সব পাকা।’

‘অন্ধকার হতে এখনো অনেক বাকি। যাও তাহলে, যতগুলো ‘পারো নিয়ে এসো,’ বলল র্যাচেলের বাবা মি. ডাভ। চলতে শুরু করেও থেমে গেল র্যাচেল। বলল, ‘নদীর পাড়ে একা যেতে আমাকে নিষেধ করেছিল মা। ওখানে সিংহের নাদি আর পানিতে অনেক কুমির দেখে এসেছি।’

‘ভয় পাচ্ছ, র্যাচেল? সিংহ আর কুমির থেকে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন।’

‘না, বাবা, ভয় পাচ্ছি না। কোন কিছুকেই এখন আর ভয় পাই না আমি। কোন কিছুর পরোয়াও করি না। যাই, বুড়ি নিয়ে আসি। এখনই বেরি তুলতে যাব,’ বলল র্যাচেল।

পেছন থেকে মেয়ের অপসূয়মাণ অবয়বের দিকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মি. ডাভ। মনের গভীরে সে নিজেও অনুভব করছে পুরো যাত্রাটাই বোকামী। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকেই সে বলল, ‘তোমাকে রক্ষার জন্য ফেরেশতা পাঠাবেন ঈশ্বর,’ তারপর নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে গেল সে। নিজেকেই বলল, ‘আমার নিজের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই যত অশান্তি হচ্ছে। এ কারণেই বারবার ফেরত যেতে মন চাইছে। কিন্তু

কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। থেকে থেকে পাহাড়ের চূড়াটা চেটে দিচ্ছে বিজলির লকলকে জিভ। বৃষ্টির ছোট ছোট কণায় ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়ে বাষ্পের মধ্যে তৈরি হচ্ছে রঙধনু। এদিকে র্যাচেলের মাথার ওপর আকাশটা অন্ধকার থেকে পরিণত হচ্ছে কালিগোলা অন্ধকারে। প্রতি মিনিটেই মাটির আরো কাছে নেমে আসছে মেঘ।

সাথে আনা ঝুড়িটায় বেরি ভরছে র্যাচেল। হঠাৎ দূরগত একটা গোঙানি কানে এল ওর। সাথে এল উষ্ণ বাতাসের একটা ঝাপটা। এরপরই এল হিমশীতল বাতাসের দমক। বাড়তেই থাকল বাতাসের শক্তি। গাছ তো গাছ, বাতাসের তোড়ে ঘাসের ডগাও নুয়ে পড়ছে। র্যাচেল এখনও বেরি তুলে চলেছে। কারণ ওর ঝুড়ির অর্ধেকও এখনো ভরেনি।

আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে আকাশ। গোঙানি দিয়ে শুরু হয়ে ইতিমধ্যেই গর্জনে রূপান্তরিত হয়েছে মেঘের ডাক। শুরু হলো বৃষ্টি। শিলিং আকৃতির বৃষ্টির এক একটা ফোঁটা এসে পড়তে শুরু করল র্যাচেলের গায়ে। আর দেরি করা যায় না, এবার ফিরতেই হবে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাথুরে পাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে ও। এ ধরনের খাড়া জায়গাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ডোঙ্গা। কিন্তু তীরে ওঠার আগেই তীব্র শক্তিতে নেমে এল প্রচণ্ড ঝড়। হারিকেনের শক্তি নিয়ে নেমে এল প্রচণ্ড বাতাস। ঘন মেঘ এত দ্রুত নীচে নেমে এল যে, সময়ের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এতই অন্ধকার যে কোথায় পা ফেলছে তাও দেখতে পাচ্ছে না র্যাচেল। ঠিক তখনই প্রচণ্ড নীলচে আলোয় ঝলসে গেল চারদিক। মনে হলো যেন মাটি, আকাশ, বাতাস সবকিছুতে এক সাথে আগুন ধরে গেছে। সেই সাথে ঝড়ও বিস্ফোরণ। যেন এক সাথে গর্জে উঠেছে হাজারটা কামান। মুহূর্মুহঃ বজ্র গর্জনে কানে তাল লাগে যাবার অবস্থা। এরই মধ্যে কোনমতে টলমল

পায়ে তীরের দিকে পৌঁছুল র্যাচেল।

বজ্রপাতের “এই আছে এই নেই” আলোতে র্যাচেলের চোখে পড়ল ডোঙ্গার অপর পাড়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ। হাত নেড়ে আর চিৎকার করে ওকে ডাকছে সে। ওকে ডাকার ব্যাপারটি র্যাচেল নিশ্চিত হয়েছে তরুণের ঠোঁট নড়তে দেখে। আর হাতের ইশারার কথা তো বললামই।

এই নির্বাক্তব পরিবেশে একটা শ্বেতাঙ্গ তরুণকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো র্যাচেল। একই সাথে কৃতজ্ঞও বোধ করল। আবার, অবাকও হলো যে, এই বাজ পড়া এলাকায় ছেলেটা এসেছে কেন!

বজ্রপাতের ক্ষণিক আলো যতবার পেল ততবারই ছুট দিল র্যাচেল। তীরের আরেকটু কাছে যেতেই বুঝল তরুণটি আসলে ওকে ডাকছিল না, অপর দিকে চলে যেতে বলছিল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল র্যাচেল। পর মুহূর্তেই কারণটা বুঝল এবং আকাশ ভেঙে পড়ল র্যাচেলের মাথায়।

র্যাচেল যেখানে আছে তার একশ’ গজ মতো উজানে নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে। হঠাৎই সেখান থেকে সগর্জনে উথিত হলো তীব্র বেগে আগুয়ান পানির বিশাল এক দেয়াল। পাহাড়ী ঢল নেমে এসেছে। সেই পানিতে খড়কুটোর মতো ভাসছে বিভিন্ন পশুর মৃতদেহ আর বিশাল সব গাছের গুঁড়ি। ভীষণ দ্রুতগামী একটা ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত ছুটে আসছে জলোচ্ছ্বাস।

প্রবল আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেছে র্যাচেল। দেখতে পাচ্ছে সবই, কিন্তু একটা আঙুলও নাড়তে পারছে না। দেখছে, পানির বিশাল দেয়ালের আগে আগে আসছে অপেক্ষাকৃত ছোট, ওর হাঁটু সমান উঁচু একটা স্রোত।

ওর স্তব্ধ অবস্থা দেখে তীর থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে এল

ছেলেটা। ছুটে এল ওর দিকে। ঠিক তখনই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বজ্রপাত হলো ছেলেটির ত্রিশ গজের ভেতর। থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সে। পর মুহূর্তেই আবার সামলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ওদিকে পানিটা র্যাচেলের গোড়ালি ছুঁয়ে ফেলেছে। তবু ওর হুঁশ ফিরছে না। ঘোলা পানির স্রোতটা ওর থেকে আর মাত্র পাঁচ গজ দূরে। বজ্রপাতের আলোয় র্যাচেল দেখল, ঢেউয়ের চূড়ায় দেখা যাচ্ছে একটা মোষের শিং। মোষটা অবশ্য অনেক আগেই মারা গেছে। কিন্তু নীচ থেকে প্রবল পানির ধাক্কায় ওটা এমনভাবে ভেসে আছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ঢেউয়ের চূড়ায় চেপে চার্জ করে আসছে ওর দিকে। পর মুহূর্তেই বাহুতে সেই ছেলেটির হাতের স্পর্শ পেল র্যাচেল। সাথে সাথেই সংবিশ্রিত ফিরল ওর। পানি ততক্ষণে ওর হাঁটু ছুঁয়ে ফেলেছে। দ্বীপের তীর ওদের থেকে আর গজ খানেক দূরেও নেই। হাঁটু সমান পানি ঠেলে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল দুজনে।

শুদ্ধ ইংরেজিতে চিৎকার করে ছেলেটি বলল, ‘বাঁচি, মরি, এক সাথে চেষ্টা করব।’ অবশ্য পানির বজ্রসম হুঙ্কারের কারণে ছেলেটির গলা ফিসফিসানোর মতো করে এল র্যাচেলের কানে। কোনমতে তীরের নাগাল পেল ওরা, তখনি ক্ষুধার্ত প্রাণীর মতো ওদের পায়ে এসে পড়ল পানির স্রোত। র্যাচেল উঠে পড়লেও ছেলেটি তখনও পুরোপুরি তীরে ওঠেনি। ভাসমান গুঁড়ির একটা ডাল প্রচণ্ড আঘাত করল ছেলেটির কাঁধে। কাপড় ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। পড়েই যাচ্ছিল সে। এবার র্যাচেল ওকে ধরে ফেলল। ওর সহায়তায় তীরে নিরাপদ মাটির ওপর উঠল ছেলেটি।

দম ফিরে পেয়ে উঠে বসল দুজনে। বজ্রপাতের আলোয় র্যাচেল দেখল, ছেলেটি দেখতে বেশ সুদর্শন। ভীষণ ফর্সা ওর

তুক। চুলের রঙ সোনালী, তবে সেটা র‍্যাচেলের চেয়ে বেশ খানিক গাঢ়। চোখের মণি ওর মতোই ধূসর। বয়স সতেরো আঠারোর বেশি হবে না। আর চেহারার বৈশিষ্ট্য অনেকটাই ওর মতো। স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলে লোকে ওদেরকে ভাই-বোন বলেই মনে করবে।

প্রথমে মুখ খুলল র‍্যাচেল। বজ্র গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করল, ‘কে তুমি? এখানে এসেছ কেন?’

ছেলেটি জবাব দিল, ‘আমার নাম রিচার্ড ড্যারিয়েন। কেন এসেছি জানি না। মনে হলো কেউ বা কিছু একটা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সম্ভবত তোমাকে উদ্ধার করতে।’

‘অবশ্যই কিছু একটা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। নয়তো ওই ভেসে যাওয়া মৃত মোষটার মতো আমিও এতক্ষণে মরে ভেসে যেতাম-আমার বাবার ভাষায় “গর্বিত পথের দিকে”।’

‘গর্বিত পথ? আমার তো মনে হচ্ছে মরে সাগরের দিকে ভেসে যেত তোমার প্রাণহীন শরীরটা! সেটা গর্বিত পথ হয় কী করে?’ অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রিচার্ড।

‘তোমার বাবা মিশনারী নয়। তাই কথাটার অর্থ বোঝনি,’ বলল র‍্যাচেল।

‘না, আমার বাবা ন্যাভাল অফিসার। মানে, আগে ন্যাভাল অফিসার ছিল আর কী। এখন অবসরপ্রাপ্ত। ব্যবসা আর শিকার নিয়েই আপাতত তার দিন কাটছে। আমরা নেটাল থেকে ফিরছি। কিন্তু তোমার নাম কী?’ প্রশ্ন করল রিচার্ড।

‘র‍্যাচেল ডাভ।’

‘র‍্যাচেল ডাভ, সুন্দর নাম। কাদায় মাখামাখি না হলে আসলেই হয়তো “ডাভ” হয়ে উঠতে তুমি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আশ্রয় নেবার মতো কোন জায়গার হৃদিস জানো?’ প্রশ্ন করল রিচার্ড।

খানিক আবেগশূন্য কণ্ঠেই র্যাচেল বলল, ‘তুমি যতটা পরিচ্ছন্ন আমিও তা-ই। নদীর কাদাগোলা পানি আমাকে নোংরা করে দিয়েছে। ওখানে পাথরের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারো তুমি। আমি বৃষ্টিতে খানিক ভিজব। গা থেকে কাদা মাটি ধুয়ে ফেলতে চাই।’

‘হ্যাঁ, ভিজতে গিয়ে সর্দি লাগুক আর বোনাস হিসেবে বজ্রপাত তো আছেই। আশপাশে একটা পড়লে আর দেখতে হবে না। ওখানেই ছাই হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জানি, তুমি অসুন্দর নও। এখন বলো আশ্রয় নেয়ার মতো জায়গা আছে এখানে?’

মাথা ঝাঁকিয়ে র্যাচেল বলল, ‘সম্ভবত আছে একটা। চলো,’ বলে নিজেও উঠল আর হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটির দিকে। অন্ধকারে পরস্পরের হাত ধরে দ্বীপের উচ্চতম প্রান্তের দিকে চলল দুজনে। ওখানে পাথরের ওপর পাথর পড়ে ছোট্ট একটা প্রাকৃতিক গুহা তৈরি হয়ে আছে। মায়ের সাথে এসে এখানেই প্রথম বসেছিল র্যাচেল। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে তারপর গিয়েছিল ফুল তুলতে। ওরা এগুতে শুরু করতে করতেই গুহার ওপরের সবচেয়ে লম্বা গাছটার ওপর বজ্রপাত হলো। ক্ষণিকের জন্য দুজনেরই চোখ কান দুটোই স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রাকৃতিক গুই গুহার ভেতর কিছু প্রাণী আশ্রয় নিয়েছিল। বজ্রপাতের পর ছুটে বের হয়ে গেল প্রাণীগুলো।

রিচার্ড বলল, ‘জায়গাটা তো খুব একটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। তবে আশার কথা হচ্ছে, এক জায়গায় দুইবার বাজ পড়ে না।’

র্যাচেল বলল, ‘বন্দুকটা রেখে গেলে ভাল হয় না?’ কারণ ওর জানা আছে, সরু লোহার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ আকৃষ্ট হয় বেশি।

কিন্তু রিচার্ড বলল, ‘কখনোই না। এটা আমার বাবার দেয়া

বন্দুক। কখনোই এটা আমি কাছ ছাড়া করি না।’

ওরা গুহার ভেতর ঢুকতে না ঢুকতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। গুহার ভেতরটা এখনো শুকনো। তবে ঝড়ো হিমেল বাতাসে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। পাশে পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা দিয়ে নিজেদের ঢাকার চেষ্টা করল ওরা। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক বাড়ি খেতে খেতে র্যাচেল বলল, ‘একটু আগুন পেলে এখন বর্তে যেতাম।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বন্দুকের স্ট্র্যাপের সাথে বাঁধা একটা চামড়ার পাউচ খুলল রিচার্ড। সেটা থেকে বের করল খানিক বারুদ, বন্দুকের ফ্লিণ্ট আর স্টিল। সেই সাথে জড়ো করল কিছু আধ-ভেজা লতাপাতা। বেশ পরিশ্রম করে স্টিলে ফ্লিণ্ট ঠুকে সেটা দিয়ে আগুন ধরাল ও। আগুনে আরো কিছু আধ-ভেজা লতাপাতা, কাঠি, ছোট ডালপালা ঠেলে দিল র্যাচেল। গত বন্যার সময়ই হয়তো গুহায় ঢুকে পড়েছিল এসব ডালপালা আর শুকনো লতাপাতা। সেগুলোই আজ আগুনের জ্বালানী হয়ে ওদের প্রাণ বাঁচিয়ে দিল। যা হোক, আগুন জ্বালানো গেছে সেটাই হচ্ছে আসল কথা। আগুনটা গুহার মুখে জ্বালানোয় ধোঁয়াটা বাইরে চলে যাচ্ছে, তাপটা থেকে যাচ্ছে ভেতরে। ধীরে ধীরে উষ্ণ হলো ওরা। সেই সাথে ফিরে এল আত্মবিশ্বাস। আগুন আর আশ্রয় পেয়ে বাইরের তুমুল ঝড়ের তাণ্ডব আপাতত ওদের মন থেকে বিদায় নিয়েছে। ভুলে গেছে একটুর জন্য বাণের জলে শুঁসে যেতে যেতে রক্ষা পেয়েছে ওরা।

স্বগতোক্তির মতো করে র্যাচেল বলল, ‘আমার ক্ষুধা পেয়েছে।’

আবার কী যেন খুঁজতে শুরু করল রিচার্ড। এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কোথা থেকে যেন বের করল রোদে শুকানো লম্বা এক ফালি মাংস। বলল, ‘বিলটং চলবে?’

‘অবশ্যই!’

‘নাও। অবশ্য এটা নিজ হাতে কেটে খেতে হবে। আমার হাতে ব্যথা করছে, আমি কাটতে পারব না,’ বলল রিচার্ড।

‘ইশ! কী স্বার্থপর আমি, তোমার হাতের আঘাতের কথা ভুলে বসে আছি। দেখি, আঘাতের জায়গাটা আমাকে দেখতে দাও,’ বলল র্যাচেল। সত্যিই লজ্জিত ও।

কোট খুলে আঘাতের জায়গাটা র্যাচেলকে দেখাল রিচার্ড। আগুনের আলোয় র্যাচেল দেখল ত্বক ছড়ে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। র্যাচেলের নিজের রুমালটা হারিয়ে গেছে। তাই রিচার্ডেরটা চেয়ে নিল। তারপর গুহার সামনে একটা বেসিন আকৃতির পাথরে জমে থাকা বৃষ্টির পরিষ্কার পানিতে রুমালটা ধুয়ে নিল। ক্ষত পরিষ্কার করে রুমালটা দিয়েই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল র্যাচেল।

আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল, ক্ষতটা দিন কয়েকের মধ্যেই একদম ঠিক হয়ে যাবে।’

‘বাহ! দারুণ হাতের কাজ তো। ব্যাণ্ডেজ করতে তোমাকে কে শিখিয়েছে?’ প্রশ্ন করল রিচার্ড।

‘আমার বাবা কালোদের চিকিৎসা করে। আমি হচ্ছি তার একমাত্র সহকারী,’ বলতে বলতে বৃষ্টির পানিতে হাত ধুয়ে নিল র্যাচেল। তারপর বিলটংটা সরু ফালি করে কাটল। আগে রিচার্ডকে খেতে দিল ও। কারণ র্যাচেল খেয়াল করেছে যে শ্রুত যাওয়ায় দুর্বল হয়ে গেছে ছেলেটি। হাপুস হপুস করে খেল রিচার্ড। ওর খাওয়া দেখে হেসে ফেলল র্যাচেল। আসলে রিচার্ড নিজেও বোঝেনি ও কতটা ক্ষুধার্ত। এক ফালি মাংস রেখে দিল র্যাচেল। কারণ যদি লম্বা সময় পর্যন্ত এখানে আটকে থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই খাবার লাগবে। সেজন্য এই অগ্রিম সতর্কতা।

রিচার্ডের খাওয়া শেষ হওয়ার পর নিজের জন্য পাতলা এক ফালি মাংস তুলে নিল র্যাচেল। বলল, ‘কাফিরা বলে পুরুষরাই নাকি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ওদেরকে আগে খাইয়ে নিতে হয়।’

‘বলতে চাইছ পুরুষরা বেশি স্বার্থপর, তাই ওরা আগে খায়?’ বলল রিচার্ড। র্যাচেলকে এত অল্প খেতে দেখে খানিকটা অবাকই হলো রিচার্ড। র্যাচেলকে বিশ্রাম নিতে বলে তারপর বলল যে সকালে কিছু একটা শিকার করবে ও।

কিন্তু মাথা নাড়ল র্যাচেল। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি শিকারী?’

গর্বভরে রিচার্ড বলল, ‘হ্যাঁ, না, মানে প্রায়। ইল্যাও মেরেছি, হাতি শিকার করেছি, তবে এখনও কোন সিংহ শিকার করিনি। গতকাল একটা সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই এখানে এসেছিলাম, দেখেওছিলাম ওটাকে। কিন্তু গুলি করার আগেই লাফ দিয়ে একটা পাথরের পেছনে চলে গেল ওটা। আমার ধারণা সিংহটা তোমার পেছনে লেগেছিল।’

‘হতে পারে। আমিও জানি, এই এলাকায় সিংহ আছে। গত রাতেও গর্জন শুনেছি।’

‘সিংহটা পালানোর পরই তোমাকে দেখি ঝুড়ি হাতে যাচ্ছ আর ওদিক থেকে তেড়ে আসছে ঢলের পানি। বাকিটা তো নিজেই জানো।’

‘হ্যাঁ, জানি। আমাকে বাঁচাতে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। তাই এই জীবন এখন থেকে তোমার,’ দুটো কণ্ঠে কথাগুলো বলল র্যাচেল।

র্যাচেলের দিকে এক নজর তাকিয়ে রিচার্ড বলে চলল, ‘তাহলে তো ভালই হতো। আজ সকালেই ভাবছিলাম আমার নতুন রোয়ারটা দিয়ে একটা সিংহ শিকার করব (রিচার্ড ওর ভারী বন্দুকটাকে নাম দিয়েছে রোয়ার)। কিন্তু দেখো, কী হলো।

সিংহের প্রাণ নেয়ার বদলে তোমার প্রাণ বাঁচালাম। আহ, সত্যিই যদি তোমার প্রাণ আমার হতো!’

দু’জোড়া চোখ পরস্পরের সাথে মিলিত হলো। জানি না, রিচার্ডের চোখে কী দেখল র্যাচেল। মাথা ঘুরিয়ে নিল ও। তারপর প্রশ্ন করল, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

‘গ্রাফ রেইনেট-এ, আমার বাবার খামারে যাচ্ছি। খামারে বাবার আরো তিনজন পার্টনার আছেন। দুজন বোয়ের আর একজন ইংলিশম্যান। আইভরি বিক্রি করতে যাচ্ছি আমরা,’ জানাল রিচার্ড।

র্যাচেল বলল, ‘আমি যাচ্ছি নেটালে। কাজেই, আমার জীবন তোমার হলেও মনে হচ্ছে না যে আজকের পর আমাদের আর দেখা হবার সম্ভাবনা আছে।’

ঠিক তখনই আবার বেড়ে গেল ঝড়ের প্রচণ্ডতা। সেই সাথে হারিকেনের তীব্রতায় বাতাস তো বইছেই। উপরন্তু বৃষ্টির বেগও ভীষণ বেড়ে গেল। মুহূর্মুহঃ বজ্রপাতে প্রকম্পিত হতে লাগল আকাশ-বাতাস। বজ্রনাদের আওয়াজে নিজের চিন্তাই ঠিক মতো শুনতে পারছে না ওরা, মুখের কথা তো বহুদূরের ব্যাপার। কাজেই কথাবার্তা বন্ধ। রিচার্ড একবার গুহার বাইরে মাথা বের করল। সাথে সাথেই আবার ভেতরে টেনে নিল মাথা। তারপর র্যাচেলকে ইশারা করল বাইরে দেখতে। বাইরের দৃশ্যটা দেখে র্যাচেলের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। বজ্রপাতের আলোয় দেখল, ওদের ছোট দ্বীপটাকে ঘিরে তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে ঢলের পানি। নদীটাকে দেখাচ্ছে বাদামী একটা চাদিরের মতো। দ্বীপের উঁচু পাথুরে অংশটা কেবল বাকি আছে বাকি পুরোটাই ডুবে গেছে স্রোতের পানির নীচে। আর কিছুক্ষণ পানি বাড়লে ওরাও পানিতে ভেসে যাবে। কথাটা রিচার্ডও বলল।

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে র্যাচেল বলল, ‘এসো, প্রার্থনা যা করার

করে প্রস্তুতি নিই।’ “গর্বিত গন্তব্য” (পড়ুন, মৃত্যু) যে কাছিয়ে এসেছে সেটা বুঝেই এই কথা বলল ও।

বজ্রপাত একটু কমে এসেছে। তাই পরস্পরের কথা আবার শুনতে পাচ্ছে ওরা। গুহার ভেতর রিচার্ডকে টেনে নিয়ে গেল র্যাচেল। পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসল দুজনে। শুরু করল করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

প্রার্থনা শেষ হলে পরে রিচার্ড জিজ্ঞেস করল, ‘কী প্রার্থনা করলে?’

‘প্রার্থনা করেছি তুমি যেন এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারো। আর আমার মৃত্যু হলে মা যেন আমার জন্য বেশি শোক না করে। তুমি কী প্রার্থনা করলে, রিচার্ড?’

‘অনেকটা তোমার মতোই। প্রার্থনা করেছি, তুমি যেন বেঁচে যাও। আমার মা মারা গেছে তাই তার জন্য কিছু বলিনি। আর বাবার জন্য প্রার্থনা করতে ভুলে গেছি।’

ঠিক তখনি বিশাল দুটো সচল হলদে অবয়ব দেখে লাফিয়ে উঠল রিচার্ড। ‘দুটো সিংহ!’ বলেই বন্দুক টেনে নিল ও।

র্যাচেল বাধা দিল ওকে। বলল, ‘দাঁড়াও, গুলি কোরো না। ও দুটোও হয়তো আমাদের মতোই আশ্রয় নিতে এসেছে এখানে। গুলি করলে ওদের কেবল রাগিয়ে দেয়া হবে।’

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। তারপর ওর মনে পড়ল, ওর বন্দুকটা ফ্লিন্ট-লক ঘরানার বন্দুক। পানিতে ভিজে অবশ্যই গুলির ফ্লিন্টগুলো ড্যাম্প হয়ে গেছে। সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে লাগল ও। নতুন করে বন্দুকে বারুদ আর ফ্লিন্ট গুলি রিলোড করল। আর ভেজা ফ্লিন্টটা রেখে দিল আগুনের পাশে একটা পাথরের ওপর। সব মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের সামান্য কিছু বেশি সময় খরচ হলো তাতে। তারপর বন্দুক হাতে হামাগুড়ি দিয়ে গুহা মুখের বাইরে মাথা বের করল ও।

ঝড়ের ভয়াবহতা কমতে শুরু করেছে। বৃষ্টিও একটু ধরে এসেছে। তবে থেকে থেকে চমকে যাচ্ছে বিজলী। সেই উজ্জ্বল নীলচে বেগুনি আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে বিশ্ব-চরাচর। সেই আলোয় ভারী অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল রিচার্ড। দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাথরচূড়ার পাশে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে সিংহ দুটো। তবে কেবল ওই দুটোই নয়, ওগুলোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় নানা জাতের প্রাণী। সবগুলোই বানের পানি থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। এদের মধ্যে বিশাল ইল্যাণ্ড থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত ছোট রিড বাক, ওয়াটার বাক ইত্যাদিও আছে। ওগুলোর ভেতরই অস্বস্তিভরে হেঁটে বেড়াচ্ছে সিংহ দুটো। তবে আক্রমণের সামান্যতম নমুনাও ওদের ভেতর নেই। ওই প্রাণীগুলোও সিংহগুলোকে ভয় পাচ্ছে না। বরং নাক ঝাড়তে ঝাড়তে ঝড়ের গতিপ্রকৃতি খেয়াল করছে। পালানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করছে না কেউ, আশ্চর্য কাণ্ড!

রিচার্ড বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছিলে, র্যাচেল। প্রাণীগুলো সন্তুষ্ট হয়ে আছে। পানি আরো না বাড়লে ওরা এদিকে আসবে না। তবে পানি বাড়লে ছেড়ে কথা কইবে বলে মনে হয় না। ঠিকই গুহায় এসে ঢুকবে। তার আগেই এসো আগুনটা জ্বালিয়ে রাখি।’ আগুন জ্বালিয়ে পরস্পরকে তাদের জীবনের গল্প শোনাতে বসল দুজনে।

পাঁচ বছর হয় বাবার সাথে আফ্রিকায় এসেছে রিচার্ড। ওর বাবা অবসরপ্রাপ্ত নেভি ক্যাপ্টেন। তার আয়ের একমাত্র উৎস পেনশন। কিন্তু পেনশন মানে তো অর্ধেক বেতন। তা দিয়ে কী আর দিন চলে? তাই ভাগ্য পরিবর্তন করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসে রিচার্ডের বাবা। গ্রাফ রেইনেট জেলায় খামার করার অনুমতি পায় সে। কিন্তু অন্যান্য আদি সেটলারদের মতো তাকেও পেয়ে বসে দুর্ভাগ্য। কাজেই ভাগ্য বদলাতে হাতি

শিকারে নাম লেখায় সে। শিকারের উদ্দেশ্যেই নেটালের প্রায় অনাবিষ্কৃত একটা এলাকায় অভিযানে গিয়েছিল রিচার্ডরা। অভিযান দারুণ সফল। প্রচুর আইভরি পেয়েছে ওরা। এখন ওখান থেকেই ফিরছে। লোকালয়ে ফিরে গিয়ে কলেজের পাট চোকাতে তিন বছরের জন্য কেপটাউনে যাবে রিচার্ড। তারপর পড়া শেষে যে কোন একটা পেশা বেছে নিতে পারবে ও। বলতে বলতেই মনে মনে রিচার্ড সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে শিকারীই হবে ও। সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত শিকার ছাড়া আর কিছুই করবে না। তারপর একদিন যখন আর শিকারের সামর্থ্য থাকবে না তখন খামারে মনোযোগ দেবে। তবে মুখে এই ব্যাপারে কিছুই বলল না।

এরপর নিজের গল্প বলল র্যাচেল। খুব আগ্রহ নিয়ে সেটা শুনল রিচার্ড। শেষে বলল, ‘তোমার বাবা কি পাগল নাকি?’

সাথে সাথে প্রতিবাদ করল র্যাচেল, ‘বাজে কথা একদম বলবে না। আমার বাবার মতো ভাল মানুষ হয় না। খুবই ভাল লোক সে।’

‘ওটাই তো বললাম। মানে, “খুব বেশি ভাল” আর “পাগলামি” প্রায় কাছাকাছি ব্যাপার। কিন্তু, মাথা খারাপ না হলে এভাবে ঝড়ের মুখে একটা মেয়েকে একা কেউ ক্যাম্প থেকে বের হতে দেয়?’

পাল্টা প্রশ্ন করল র্যাচেল, ‘তাহলে, ঝড়ের মুখে তোমার বাবা তোমাকে শিকার করতে পাঠাল কেন?’

‘বাবা পাঠায়নি, আমিই এসেছি। হরিণ শিকার করতে এসে সিংহের পায়ের ছাপ পেয়ে গেছি। তারপর থেকে সিংহটাকেই অনুসরণ করছিলাম আমি। আমাদের ঝগড়াগুলো এতক্ষণে হয়তো বহুদূরে এগিয়ে গেছে। এমন ঝড় বাদলের পর আমাকে এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না। কেউ কল্পনাই করবে না যে,

এত পেছনে চলে এসেছি আমি। বৃষ্টিতে ঘোড়ার খুরের দাগও ধুয়ে গেছে। কীভাবে ওদের কাছে ফিরব ঈশ্বরই জানে,’ বলল রিচার্ড।

‘তোমার ঘোড়াটা খুঁজে না পেলো কী করবে? আমাদের কোন ঘোড়া নেই যে তোমাকে ধার দেব। এখন উপায়?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘হেঁটে এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করব, এছাড়া আর কিছু করার নেই।’

‘যদি ওদের ধরতে না পারো?’

‘এখানে ফিরে আসব। কারণ সামনে মানুষখেকো জংলীরা আছে। একা আমাকে পেলে মেরে ফেলবে।’

‘বুঝলাম, কিন্তু তোমার বাবা কী ভাববে?’

‘ভাববে তার একটা ছেলে ছিল, সে মারা গেছে। কিছুদিন দুঃখ করবে, তারপর ভুলে যাবে। আফ্রিকায় অনেক সিংহ আর মানুষখেকো অসভ্য জংলী আছে। ওদের হাতে হরদমই মানুষ মরছে। বা হারিয়ে যাচ্ছে অজানায়।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল র্যাচেল। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে না পেরে প্রসঙ্গ বদল করল। বলল “ওদের” সিংহ দুটো কী করছে দেখা দরকার। বাইরে থেকে দেখে এসে রিচার্ড জানাল সিংহ বা অন্য কোন জানোয়ার দ্বীপের ওপর নেই। ঝড় থেমে যাওয়ায় ওগুলো হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। টেলের পানিও নেমে যাচ্ছে। শুনে যত লতাপাতা ছিল সব আঁঙনে ঠেসে দিল র্যাচেল। আবার গল্প শুরু করল দুজনে। তারপর একসময় ঘুমিয়েও পড়ল ওরা।

তিন

আগুনটা নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। তাই ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেছে র্যাচেলের। ঝড়, বৃষ্টি, বাতাস কিছুই এখন নেই। গুহা থেকে বের হলো র্যাচেল। ভোর সমাগত। আর বাইরে অসম্ভব ঘন কুয়াশা জমে আছে। নদী ও ভেজা মাটি থেকে বাষ্প উঠে কুয়াশা আরো ভারী হচ্ছে। কুয়াশা এত ঘন যে, দুই হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না। গুহা থেকে দূরে সরে গেলে সিংহের ঘাড়ে গিয়ে পড়তে পারে। তাই ভয়ে দূরে সরল না র্যাচেল। গুহা মুখের পাশেই একটা বেসিন আকৃতির পাথরে বৃষ্টির পানি জমেছে। তা দিয়েই নিজেকে পরিষ্কার করল ও। মানে সাবান চিরুনি ছাড়া যতটা পরিষ্কার করা সম্ভব আর কী। তারপর ফিরে এল গুহায়।

তখনও ঘুমিয়ে আছে রিচার্ড। আগুনের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা রিচার্ডের মায়াকাড়া চেহারাটা র্যাচেলের ভেতরও মায়া জাগিয়ে তুলল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর বুকের ভেতর। কেমন অজানা একটা অনুভব। ঠিক তখনি বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর মনে পড়ল যে রিচার্ড যাচ্ছে কেপ-এর দিকে। আর ওরা যাচ্ছে বিপরীত দিকে। মানে, নেটালে। তাহলে আর দেখা হবে কীভাবে?

তখনি ওর ভেতর মাথা চাড়া দিল স্কটিশ হাইল্যান্ডার

পূর্বপুরুষদের দিক থেকে পাওয়া ইনটুইশন। সেটা তাকে বলল, যুক্তি যা-ই বলুক, রিচার্ড আর র্যাচেলের ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা। তখন একটু যেন টলে উঠল র্যাচেল। চলে গেল তন্দ্রার ঘোরে। একটা স্বপ্ন দেখল ও। দেখল, লড়াইয়ের রক্তাক্ত ময়দান, যোদ্ধা আর তাদের স্বজনদের আতঁনাদ-আহাজারী। তারপর দেখল কিছু লোককে রাণীর মতো শাসন করছে ও। একবার ওর মনে হলো ও যেন পাগল হয়ে গেছে। একাধিকবার ও মৃত্যুর কাছে চলে গেল কিন্তু কোন অদ্ভুত উপায়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিল বারবার। রিচার্ড ড্যারিয়েনও আছে ওর সাথে। একবার ওকে হারিয়ে ফেলল র্যাচেল, তারপর ওকে খুঁজতে গেল। ভীষণ অদ্ভুত ও ভয়ংকর এক মৃত্যুলোকে গিয়ে তাকে খুঁজল ও। কীভাবে গেছে-জানে না র্যাচেল। এরপর এল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাকি সব কিছু ভুলে গেলেও শেষ এই দৃশ্যটা জীবিত থাকাবস্থায় কখনোই ভুলবে না র্যাচেল।

দেখল টাওয়ারের মতো উঁচু, বিশাল বিশাল সব গাছপালা। মাথার ওপর পাতার ছাদ এতই ঘন যে, ভর দুপুরেও সেখানে সন্ধ্যার মতো অবস্থা। আর অন্ধকার যখন নামে সেটাকে জীবিত প্রাণীর মতো অনুভব করা যায়। ওখানকার বাসিন্দারা আকার আকৃতিতে ভীষণ ছোট, বামুন আকৃতির। খুবই আদিম চেহারা ওদের, প্রায় বানরাকৃতির। বিবর্ণ ওদের গায়ের রঙ। অর্ধনগ্ন আরেকটা লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে ওরা। তার চুল দাড়ি সব সোনালী। চামড়ার রশি দিয়ে একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। তার সামনে পড়ে আছে চওড়া ফলার লম্বা একটা বর্শা। লোকটা আর কেউ নয়, রিচার্ড ড্যারিয়েন!

দৃশ্যটা থেমে গেল বা হয়তো র্যাচেলের ঘুমই ভেঙে গেছে। শুনতে পেল নরম সুরে ওকে ডাকছে রিচার্ড। বলছে, 'ওঠো, র্যাচেল। ঘুমের সময় শেষ। কিন্তু তোমাকে এমন দেখাচ্ছে

‘কেন? অসুস্থ বোধ করছ?’

‘আমি অনেক আগেই উঠেছি। কিন্তু অসুস্থতার কথা কী বললে?’

‘না, মানে, মিনিট খানেক আগেও ভীষণ অদ্ভুত দেখাছিল তোমায়। কেমন ভূতের মতো হয়ে গিয়েছিল তোমার চেহারা। এখন অবশ্য স্বাভাবিক। আগের র‍্যাচেল হয়ে উঠেছ। হয়তো আলোর স্বল্পতার জন্য অমন মনে হয়েছে,’ বলল রিচার্ড।

‘কী জানি, তবে স্বপ্নেও ভূত দেখেছি বা ভৌতিক কিছু একটা দেখেছি,’ বলে ওর স্বপ্নের কথা রিচার্ডকে জানাল র‍্যাচেল।

‘ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন। তবে স্বপ্নের শেষটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে আমার,’ বলল রিচার্ড।

গম্ভীরভাবে র‍্যাচেল বলল, ‘একদিন এর বাকিটুকু চোখের সামনেই আমরা দেখব।’

‘স্বপ্নটা সত্যি হবে ভাবছ?’

‘হ্যাঁ। একদিন তোমাকে গাছে বাঁধা অবস্থায় আমার দেখতে হবে।’

‘আশা করি সেদিন আমাকে রশি কেটে নামাবে তুমি।’ তারপর বলল, ‘সম্ভবত তোমার খিদে লেগেছে। এক কাজ করো, বিলটংটা খেয়ে ফেল,’ কথার সুরটা এমন যেন র‍্যাচেলের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে রিচার্ডের।

‘না, এখন খেতে পারব না। বাইরে একটা পাণ্ডুরের ওপর বৃষ্টির পানি জমে আছে। যাও ওখান থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। তারপর তোমার ব্যাগেজটা বদলে দেব।’

চলে গেল রিচার্ড। কিন্তু দুই মিনিট না যেতেই আবার ফিরে এল। ফিসফিসিয়ে বলল, ‘রোয়ারটা দাও। নীচে একটা রিড বাক দাঁড়িয়ে আছে। শিকার করব। ও দিয়েই তোফা ব্রেকফাস্ট

করা যাবে।’

রিচার্ডের পিছু পিছু বেরিয়ে এল র্যাচেল। আসলেই ত্রিশ গজ মতো দূরে একটা মোটাসোটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। সন্তর্পণে বুকে হেঁটে ওটার কাছে চলে গেল রিচার্ড। কারণ মিস করতে চায় না ও। একটা পাথরের পেছনে লুকাল র্যাচেল। হরিণের মাংস খেতে ওর আপত্তি নেই বটে কিন্তু সুন্দর প্রাণীটাকে হত্যা করার দৃশ্য ও দেখতে চায় না।

একসময় হরিণটা সন্দেহ করে বসল। ফিরে চাইল এদিকে। পালাবার পায়তারা কষছে। ঠিক যখন ওটা লাফ দেবে, গুলি করল রিচার্ড। নীচে গড়িয়ে পড়ল হরিণটা। আগেই মারা গেছে। ছুরি হাতে এগিয়ে গেল রিচার্ড। পরে কয়লার আগুনে ঝলসানো হরিণের মাংস দিয়েই সকালের নাস্তা করল ওরা।

বাইরে এখনও কুয়াশা আছে। তবে কুয়াশার পর্দার ওপর চমকাচ্ছে ঝলমলে রোদ। কাজেই রওনা হলো ওরা। পাথুরে দ্বীপ থেকে নেমে দেখল ঢলের পানি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমন রাতে রাতেই নেমে গেছে। সাক্ষী হিসেবে নদীর তলদেশে রয়ে গেছে স্রোতে ভেসে আসা হাজারো ভাঙা ডাল, গাছের গুঁড়ি, অজস্র ছোট প্রাণীর মৃতদেহ। তবে কোথাও সিংহের চিহ্ন নেই। এ পাথর ও পাথর করে কষ্টে সৃষ্টে ডোঙ্গার পাড়ে গিয়ে উঠল ওরা। পাড়ে পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শুনতে পেল, কুয়াশার ওপাশ থেকে একটা শঙ্কিত পুরুষ কণ্ঠ ডেকে চলেছে, ‘মিসি, আপনি এখানে আছেন, মিসি?’

‘এ যে আমাদের ড্রাইভার টমের গলা! আমাদের খুঁজতে এসেছে ও। আমার হয়ে জবাব দাও, রিচার্ড,’ বলল র্যাচেল।

কাজেই চিৎকার করে রিচার্ড বলল, ‘হ্যাঁ, আছি। কুয়াশা কমে পানি নামার অপেক্ষায় আছি, ভাল আছি।’

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম বানের

পানিতে ভেসে গেছেন আপনি। কিন্তু আপনার গলার কী হয়েছে?’

এবার র্যাচেল বলল, ‘আমার সাথে একজন ইংলিশ লোক আছে। তার ঘোড়াটা আছে আশপাশে কোথাও। ওটাকে খুঁজে বের করো আর লম্বা রশি জোগাড় করে এনো। বাবা আর মাকে জানিয়ো আমি ভাল আছি।’

তখন ওপাশ থেকে ভেসে এল র্যাচেলের বাবা মি. ডাভের কণ্ঠ। সে বলল, ‘আমি এখানেই আছি, র্যাচেল। সারা রাত ধরে তোমাকে আমরা খুঁজেছি। ঘোড়াটাকে আগেই পেয়েছি, ওটা আমাদের সাথেই আছে। তবে এখনি পানি পার হয়ো না। কুয়াশা কমুক। সব যখন দেখা যাবে তখন পানি পার হবে। আপাতত অপেক্ষা করো।’

র্যাচেলকে রিচার্ড বলল, ‘এটা ভাল খবর বটে। অবশ্য আমাদের ওয়াগনগুলোকে ধরতে হলে খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে হবে।’

মলিন হয়ে গেল র্যাচেলের মুখখানা। মলিন স্বরেই ও বলল, ‘হ্যাঁ, আসলেই ভাল খবর।’

‘তুমি খুশি হয়েছেো, আমি চলে যাচ্ছি?’ খানিক অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করল রিচার্ড।

জবাবে ভদ্র স্বরে র্যাচেল বলল, ‘তুমিই বলেছ, যে ঘোড়া পাওয়াটা ভাল সংবাদ।’

‘আমি বোঝাতে চেয়েছি ঘোড়া পাওয়া গেছে। এটা ভাল সংবাদ। কিন্তু চলে যাব বুঝাইনি। তোমার খারাপ লাগছে?’ শেষের কথাটা রিচার্ড উচ্চারণ করল খুবই আগ্রহী কণ্ঠে।

‘হ্যাঁ, খারাপ তো লাগছেই। কারণ আমরা বন্ধু হয়েছিলাম। অবশ্য তোমার জন্য এটা কোন ব্যাপার না। ‘কেপ-এ যাচ্ছ তুমি। ওখানে অনেক লোক দেখবে। কিন্তু এই বন্য পরিবেশে

আমার আর কোন বন্ধু থাকবে না। এই নির্বাসনের জংলী পরিবেশে একা থাকতে হবে আমাকে। তাই না?’

র্যাচেলের চোখের দিকে চাইল রিচার্ড। ওর মনটা কেমন করে উঠল। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতর। খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি! প্রেম শব্দটা অসংখ্যবার শুনেছে ও কিন্তু সেটা কী তা কখনো জানা হয়নি। তবে বুঝতে পারছে র্যাচেলের সরল স্বীকারোক্তি ওকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। এ এক নতুন অনুভূতি, অন্যরকম অনুভব। এবং বলা বাহুল্য, ভীষণ অদ্ভুত।

‘আমাকে কী করেছ বলো তো! আমি তো কখনোই মেয়েদের পছন্দ করতাম না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে একদমই মন চাইছে না!’ খানিকটা স্বগতোক্তি, খানিকটা বিস্ময়বোধক মন্তব্যের সুরে অনেকটা যেন নিজেকেই বলল রিচার্ড। তারপর বলল, ‘কিন্তু না গেলে যে বাবাকে ঠকানো হবে। নইলে কোন অবস্থাতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। সত্যি করে বলো তো, কী জাদু করেছ আমাকে?’

‘কই, তোমার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছাড়া আর তো কিছু করিনি!’ বোকা বোকা কণ্ঠে বলল র্যাচেল।

‘যে কেউই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে। জানি, কথাটা বলা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু তারপরও, খুব ভাল হতো যদি ওয়াগন খুঁজে না পেতাম। তাহলে তোমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হতাম আমি।’

কেঁদে ফেলে র্যাচেল বলল, ‘না, তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করবে। তোমার যাওয়াই উচিত। যেতেই হবে তোমাকে। দূরে চলে যেয়ো, অনেক দূরে।’

‘থামো। যাকে গতকালের আগে আর কখনো দেখিনি তার জন্য আমি কাঁদতে চাই না,’ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল রিচার্ড। বলতে বলতে ওর চোখেও চলে এল এক ফোঁটা পানি। এক

মুহূর্ত ওভাবেই কাটল, তারপর দুজনের চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়ল পানির ফোঁটা। এক পর্যায়ে র্যাচেলকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল রিচার্ড। আরো খানিক অশ্রুপাতের পর নিজেকে সামলে নিল রিচার্ড। বলল, ‘এখন আসলেই আমরা বন্ধু হয়ে গেছি।’

‘হ্যাঁ, তবে জানি না, কেন তুমি ওভাবে আমাকে চুমু খেলে, আর আমিই বা কেন তোমাকে বাধা দিলাম না,’ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলল র্যাচেল।

ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেল রিচার্ড। তাই প্রসঙ্গ বদলে বলল, ‘তোমার ওই স্বপ্নটার কথা মনে আছে, আমাকে গাছে বাঁধা থাকতে দেখেছ যেটায়? স্বপ্নটা আমার পছন্দ হয়নি। কেমন গা শিউরানো! সিংহ দুটো যখন গুহার বাইরে বসে ছিল তখনও অমন গা শিরিশির করছিল আমার। তবে তারপরও বলব, স্বপ্নটা সত্যি হলে আমি খুশিই হব। কারণ তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। তাতে যদি কেবল তোমাকে গুড নাইট বলার সময়টুকুও পাই, আপত্তি নেই।’

‘আমি নিশ্চিত, আমাদের আবার দেখা হবে। তখন কেবল গুড নাইট না, অনেক কিছুই বলার সময় পাব আমরা,’ আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল র্যাচেল।

ঠিক তখনই বাতাসের একটা ঝাপটা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল কুয়াশার মেঘ। হেসে উঠল উজ্জ্বল সূর্যালোক। গত রাতের ঝড় এখন কেবলই স্মৃতি। র্যাচেল আর রিচার্ডের ভেতর একটু আগে জেগে ওঠা আবেগও বিস্মৃত হয়েছে। সূর্যালোকের সাথে সাথে হেসে উঠল ওদের মনও। আবার দুটো তরুণ প্রাণে পরিণত হলো দুজনে। এখন ওদের ভাবনা ওপাড়ে যাবে কীভাবে। এগিয়ে গিয়ে রিচার্ড দেখল পানি এখনও অনেক গভীর ও স্রোতস্বিনী। এদিক দিয়ে পার হওয়া যাবে না।

ওদিকে একশ’ গজ মতো সামনে এগিয়ে খানিক অগভীর ও

অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্রোতওয়ালা একটা বাঁক খুঁজে পেল মি. ডাভ।
ড্রাইভার টম ও অন্যান্য কাফ্রিদের নিয়ে ওখানেই গিয়ে দাঁড়াল
সে। রিচার্ডদেরও ওদিকে আসতে ইশারা করল ওরা। সামনা
সামনি দেখে রিচার্ডও বুঝল কষ্ট হলেও এখান দিয়ে নিরাপদে
নদী পার হওয়া যাবে। একটু শক্তিশালী স্রোতের মুখে পড়ল
ওরা। তবে সাথে সাথেই রশি ছুঁড়ে দিল টম। রশি ধরে
নিরাপদেই অপর পাড়ে গিয়ে উঠল দুজনে।

খুশিতে বাচ্চা ছেলের মতো হাত তালি দিয়ে উঠল টম।
বলল, ‘বজ্রপাত আর পাহাড়ী ঢলকে ফাঁকি দিয়ে ঠিকই বেঁচে
গেছে আমাদের র‍্যাচেল। আকাশের বিজলী আর উন্মত্ত পানিও
শোনে আমাদের লেডির কথা। তাই আজ থেকে তার নাম লেডি
অভ লাইটনিং।’

নেটিভ উপাধিটাকে সঠিকভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় স্বর্গের
রাণী। ভবিষ্যতে এই কথাটাই ওর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলতে
চলেছে। তবে সেই গল্প সময়মতোই বলা হবে।

‘তোমাকে আবার দেখার আশাই আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম।
তোমাকে ওভাবে একা আসতে দিয়ে বিরাট বড় ভুল করে
ফেলেছি আমি। ঝড় শুরু হলে পরে তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায়
আতঙ্কে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। খুব খারাপ একটা রাত
কাটিয়েছি তোমার মা আর আমি। তবে এখন তাকে জানানো
হয়েছে যে নিরাপদে আছ তুমি,’ বলে মেয়েকে বুকে টেনে নিল
প্যাস্টর মি. ডাভ।

‘বা-রে, তুমিই না বললে, ঈশ্বর আমাকে দেখে রাখবে?
আমাকে দেখে রাখার জন্য রিচার্ডকে তো তিনই পাঠিয়েছেন।
সময়মতো ও না এলে বানের পানিতে ভেসে যেতাম, নিশ্চিত
মৃত্যু হতো আমার,’ বলল র‍্যাচেল।

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের লীলা বোঝা বড় দায়। তা,

তোমার এই নতুন বন্ধুটির নিশ্চয়ই রিচার্ড ছাড়াও আরো কোন নাম আছে?’

‘জী, রিচার্ড ড্যারিয়েন,’ রিচার্ড নিজেই বলল।

‘ড্যারিয়েন? ড্যারিয়েন নামে ইংল্যাণ্ডে আমার এক বন্ধু ছিল। তবে এ দেশে আসার পর থেকে তার সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। শুনেছিলাম, নেভিতে যোগ দিয়েছিল সে,’ বলল মি. ডাভ।

‘তাহলে সেটা আমার বাবাই হবে। কারণ তার মুখ থেকেই শুনেছি, গত একশ’ বছরেও ড্যারিয়েন নামে নেভিতে কেউ যোগ দেয়নি,’ বলল রিচার্ড।

‘হতে পারে। তোমার চেহারা তার ছাপ আছে। ডরমিটরিতে এক বিছানায় থেকেছি আমরা। অবশ্য সেটা পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। আজ আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছ তুমি। অদ্ভুত ঘটনাই বটে। যাক, তোমার গল্প শোনাও এবার।’

শোনাও রিচার্ড। তবে অবশ্যই প্যাস্টরের মেয়েকে চুমু খাওয়ার ঘটনাটা বাদ দিয়ে। গল্প শুনে মি. ডাভ মন্তব্য করল, ‘আসলে ঈশ্বর তোমাদের দুজনকেই নিজ হাতে আগলে রেখেছেন। তোমার ঘোড়াটা তো পেয়েছ, তো, কী করবে এখন? এক মাইল দূরে ওটাকে পেয়েছি আমরা। ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছিল তখন। জিনটা পিঠ থেকে নেমে পেটে গিয়ে পড়ে ছিল! ঘোড়া দেখে অবাক হয়ে আমরা ভাবছিলাম এই বাজ পড়া জায়গায় কোন শ্বেতাঙ্গ কী করতে এসেছে? গেল কোথায়? সে? তার ঘোড়ার জিনের এই বেহাল দশা কেন! আমার ভুলপার অবশ্য জানিয়েছিল যে, গতকাল আমার ক্যাম্প থেকে পাঁচ মাইল দূরে দুটো ওয়াগন দেখেছে সে। ওগুলোর আঙুলেরা জানিয়েছিল যে কেপ-এর দিকে যাচ্ছে তারা। আর বলেছে রিচার্ড নামে কারো দেখা পেলে যেন তাকে জানানো হয় যে, যত শীঘ্রি সম্ভব সে

যেন রওনা হয়ে যায়। তারা অপেক্ষা করবে। ওখানে তাদের ধরতে না পারলে পণ্ডা ল্যাণ্ডের সীমায় থ্রি-স্ট্রুইট নামের একটা জায়গায় তোমাকে চলে যেতে বলেছে তারা।’

‘জায়গাটা চিনি আমি। এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। ওখানে পৌঁছুতে হলে এখনি আমার রওনা হওয়া উচিত। নইলে ওরাই আবার আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে,’ রিচার্ডের মন্তব্য।

‘যেয়ো, কিন্তু আগে আমাদের সাথে বসে নাস্তা করে বিশ্রাম নাও, তারপর রওনা হবে, ঠিক আছে?’ নির্দেশের সুরে প্রশ্ন করল মি. ডাভ।

‘না, না, খাওয়া লাগবে না। নাস্তা আগেই করেছি। তাছাড়া আমার কাছে কিছুটা শুকনো মাংসও আছে। আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। নইলে বাবা খুব রেগে যাবে। আসলে গত রাতে তার অনুমতি ছাড়াই হরিণ শিকার করতে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম আমি।’

‘ওহো! দেখলে তো নিয়মের তোয়াক্কা না করার ফল কী হয়...’ লেকচার শুরু করল মি. ডাভ।

‘জী, স্যর, তবে কিনা, নিয়মটা না ভাঙলে র‍্যাচেল সম্ভবত প্রাণে বাঁচত না। একটু আগে আপনিই বলেছেন, স্বয়ং ঈশ্বর পাঠিয়েছেন আমাকে। তবে নিয়ম ভেঙেছি বলে আমাকে খারাপ ভাববেন না। অন্তত এই একটিবার নিয়ম ভাঙায় নিজের প্রতি আমি খুবই খুশি। সম্ভবত আপনিও তাতে খুশি হয়েছেন, মি. ডাভ। যা হোক, আর দেরি করব না। বিদায় নিতে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, আমিও খুশি হয়েছি। কখনো কখনো খারাপের ভেতর দিয়েও ভাল কিছু বেরিয়ে আসে। তবে তাকে অবশ্য খারাপটা ভাল হয়ে যায় না,’ বলার মতো আর কিছু খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল মিশনারী।

রিচার্ডও কিছু বলল না। র‍্যাচেলের কাছ থেকে নীরবে বিদায়

নিল সে। কারো মুখেই কোন কথা জোগাল না। কেবল পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে একবার হাত ঝাঁকিয়ে দিল দুজনে। তারপর লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল রিচার্ড। একবারও পিছে না তাকিয়ে পাহাড় শ্রেণীর দিকে মুখ করে রওনা হয়ে গেল ও।

এতক্ষণে মুখ খুলল র্যাচেল। বলল, ‘বাবা, ওকে থামাও!’

‘সে কী, কেন?’

‘ওকে আমাদের একটা জামা দেব বলেছিলাম। আর ওরটা রেখে দেব।’

‘কিন্তু আমার তো কোন বাড়তি পোশাক নেই! তাছাড়া ইতিমধ্যেই অনেক দূরে চলে গেছে ও। আমার ডাক শুনতে পাবে না। এক মুহূর্তের পরিচয় মাত্র, ওর জন্য এত উতলা হচ্ছে কেন?’

‘কারণ ও আমার প্রাণ ঝাঁচিয়েছে, বাবা,’ বলে মুখ নামিয়ে নিল ও। তারপর আর একটা কথাও না বলে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল র্যাচেল। ক্যাম্প অভিমুখে যাত্রাটা খুব লম্বা আর কষ্টকর বলে মনে হলো র্যাচেলের।

ক্যাম্প পৌঁছে র্যাচেল দেখল ওর মায়ের জ্বর অনেকটাই সেরে গেছে। যদিও এখনও অনেক দুর্বল সে। তবে শোয়া থেকে উঠে বসেছে। র্যাচেলের মৃত ছোট ভাইটার কাপড় চোপড় গুছিয়ে একটা ট্রাভেল বাক্সে ভরে রাখছে সে। নীরবে ঠোঁট থেকে পানি ঝরছে তার। দুঃখজনক একটা দৃশ্য। র্যাচেলকে দেখা মাত্রই দু’হাত বাড়িয়ে দিল। ছুটে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল র্যাচেল। জিজ্ঞেস করল, ‘আমাকে নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করোনি তো, মা?’

‘একটুও না। কারণ আমি ভাল করেই জানতাম, তোমার কিছুই হবে না। স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন। তবে ওই

অবস্থায় একা তোমাকে পাঠিয়ে তোমার বাবা মারাত্মক খারাপ কাজ করেছে। মনে রেখো, তোমার নিয়তিই হচ্ছে বেঁচে থাকা। কাজেই কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। কিছুকেই ভয় পাবে না। মনে রেখো, বুড়ো হয়েই মরবে তুমি। কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করবেন।’

‘বুঝতে পারছি না, মা, এতে আমি খুশি হব কিনা। কারণ, বেঁচে থাকা সবসময় খুব সুখের ব্যাপার নয়, তাই না, মা? অন্তত আমাদের মতো যাদের জীবন তাদের তো নয়ই।’

‘জীবনে সুখ-দুঃখ আসবেই-রে, মা। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই সুখ-দুঃখ যখন যা আসে সেটাকে সেভাবেই নিতে হবে। মনে রেখো, আমাদের পথ আমরা বেছে নিতে পারি না, মা। আর যখন পথ শেষ হয়ে যায় তখন থেমে দাঁড়াতেই হয়। কিন্তু তোমার কী হয়েছে বলো তো, র্যাচেল। গতকালের তুমি আর আজকের তুমি এক নও। কী হয়েছে তোমার?’

‘অনেক কিছু হয়েছে, মা। সব তোমাকে আমি শোনাতে পারি। শুনবে?’ জিজ্ঞেস করল র্যাচেল।

মাথা নেড়ে সম্মতি দিল র্যাচেলের মা। কাপড় গুছিয়ে রেখে সেই বাস্তবের ওপরই বসল সে। তখন র্যাচেল তাকে বলল রিচার্ডের সাথে দেখা হওয়া, ওর হাতে ঢলের পানি থেকে উদ্ধার পাওয়া, গুহায় বসা, গুহার মাথায় সিংহ ও অন্যান্য প্রাণীর সহ-অবস্থানের অদ্ভুত দৃশ্য দেখা, ভোর বেলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা অদ্ভুত সেই স্বপ্ন, হরিণ শিকার আর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হওয়ায় দুজনের কান্না, শেষে পরস্পরকে চুমু খাওয়া, কিছুই বাদ দিল না ও।

র্যাচেল ভেবেছিল রেগে যাবে ওর মা। কিন্তু সে মোটেও রাগল না। বরং র্যাচেলকে সান্তনা দিয়ে বলল, ‘ভয় পেয়ো না,

দুঃখও কোরো না। আজ রিচার্ড চলে গেছে বটে। কিন্তু একদিন তোমার কাছে সে ফিরবেই। হয়তো তুমি যেনভাবে দেখেছ সেভাবেই বা হয়তো অন্য কোন উপায়ে। তবে ফিরবেই।’

‘সেটা নিশ্চিত হতে পারলে আর কিছুই চাইতাম না, মা। কিন্তু কেন ওকে নিয়ে এত ভাবছি বুঝতে পারছি না।’

‘আজ বুঝছ না বটে, কিন্তু একদিন বুঝবে। সেই দিন আমার কথাগুলো মনে রেখো। এখন বলো রিচার্ডের চেহারা কেমন। হয়তো ওকে দেখতে পাব না তবে ওর চেহারার বিবরণ মনে গেঁথে রাখতে চাই,’ বলল র্যাচেলের মা।

বলল র্যাচেল। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, মা, ওই জংলীদের দেশে কি আমাদের যেতেই হবে? তুমি বললে কি বাবা ফিরে যেত না?’

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে মিসেস ডাভ বলল, ‘হয়তো ফিরত। কিন্তু তাকে সেই অনুরোধ আমি কখনোই করব না। কারণ তোমার বাবা যা করছে, সেটাকে তার পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করছে। আমি অনুরোধ করলে সে হয়তো ফিরবে। কিন্তু আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না। এটা সত্যি যে, ইংল্যান্ড না হোক, কেপ-এ থাকলেও আমরা সুখী জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু সত্যি বলতে তার দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বও বটে। তোমার বাবাকে কখনো ভুল বুঝো না, র্যাচেল। কারণ তিনি একজন সাধু পুরুষ। আর সত্যি বলতে, সাধুদের জন্য বা তাদের পরিবারের জন্য পৃথিবীটা খুব একটা সুখের জায়গা নয়। বিশেষত তাদের পরিবারের জন্য তো নয়ই। তোমার হয়তো মনে হবে, আমার বা তোমার মৃত ভাইয়ের জন্য তোমার বাবার দুঃখ হয় না, আমাদের কষ্ট তিনি বোঝেন না। কিন্তু জেনো, আমাদের সবার জন্য খুব কষ্ট পায় সে। এতটাই যে, তুমি ভাবতেও পারবে না। এক রাতে ঘুমের ভান ধরে পড়ে ছিলাম। ওকে বুক ফাটা কান্না কাঁদতে

শুনেছি আমি। আমার জন্য কাঁদছিল ও। কাঁদতে কাঁদতে ও
 ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল, যেন এই কষ্টের বোঝা বইবার
 শক্তি ঈশ্বর ওকে দেন। আর ওর দায়িত্ব যেন ঠিকভাবে পালন
 করতে পারে সেই শক্তিও চাইছিল ও। গত রাতে তোমার জন্য
 দুশ্চিন্তায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ও। কাফিরা কেউ ওয়াগন থেকে
 নামার সাহস দেখায়নি। কিন্তু তোমাকে খুঁজতে একাই রওনা
 হয়ে গিয়েছিল সে। কারণ, সে তোমার বাবা। বজ্রবিদ্যুতের
 আলোয় যতটা সম্ভব খুঁজে বেড়িয়েছে। তোমাকে কোথাও না
 পেয়ে মধ্যরাতে ফিরে এসেছে অর্ধমৃত অবস্থায়। কিন্তু তোমাকে
 ওসবের কিছুই সে বলবে না। তার ধারণা, ওই কথা শুনলে তুমি
 হয়তো ভাববে, ঈশ্বরের প্রতি ওর ভরসা কমে গেছে। আমিও
 জানি, আজব লোক ও। কিন্তু, ও যেমন সেইভাবেই ওকে স্বামী
 হিসেবে গ্রহণ করেছি আমি। স্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছি, ভাল
 হোক বা মন্দ, সবসময় ওর পাশে থাকব। এখন আমিই যদি
 ওকে ওর দায়িত্ব থেকে পিছু হটতে বলি, হয়তো ঠিকই পিছু
 হটবে। কিন্তু শোকেই পাগল হয়ে যাবে তখন। তখন আমি
 নিজেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। কাজেই, র্যাচেল,
 জীবনে সুখ-দুঃখ যখন যা আসে হাসিমুখে গ্রহণ কোরো। হাতে
 যা আছে তার পূর্ণ সদ্যবহার কোরো, আর এ দিয়েই সুখী হতে
 চেষ্টা কোরো। আমিও তা-ই করি। আমার জীবনের
 বেশিরভাগটাই তো পেছনে ফেলে এসেছি, যা-ও বা বাকি ছিল,
 তা তোমার ভাইয়ের সাথে ওর কবরে চলে গেছে। কিন্তু তোমার
 জীবনের পুরোটাই সামনে পড়ে আছে। কাজেই শিক্ষা নাও,
 বলে এক মুহূর্ত থামল সে। তারপরই বলল, “শুধু, তোমার বাবা
 আসছে। এখন কাজে হাত লাগাও। আজ বিকেলেই আবার
 রওনা হব আমরা।’

চার

রিচার্ডের আগে কোন বন্ধু পাওয়ার সৌভাগ্য র্যাচেলের হয়নি। সঙ্গী বলতে ছিল ওর অতি ধর্মভীরু বাবা আর একের পর এক সন্তান হারানোর বেদনায় মন ভেঙে যাওয়া মা। আর ছিল নেটিভ কাফ্রিরা।

কাফ্রিদের কাছে র্যাচেল রাণীর মতো। কারণ একে তো দারুণ সুন্দরী, তার ওপর নির্ভীক ও দয়ালু। ফলে অবধারিতভাবে সেই প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব আর পাহাড়ী ঢলের প্রমত্তা স্রোত এড়িয়ে “রাণীর” বেঁচে যাওয়ার গল্প কাফ্রিদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মজার ব্যাপার হচ্ছে একেক জায়গায় এর একেক সংস্করণ রটল। “ঝড় এড়িয়ে বেঁচে গেছে” কথাটা অতিরঞ্জিত হয়ে নেটিভদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল যে, বজ্রপাত চলে র্যাচেলের ইশারায়। কারণ, “স্বর্গের সন্তান” ও। এমনকী পানির ওপর দিয়েও হাঁটতে পারে র্যাচেল। নইলে অমন ভয়াবহ স্রোত এড়িয়ে বাঁচল কীভাবে? আর এই রটনায় সর্বশেষ সংযোজন, বন্য প্রাণীরাও ওর কথা শোনে। দ্বীপে যে গুহায় র্যাচেলরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটার সামনেই সিংহের পায়ের ছাপ ছাপ দেখেছে ওদের ড্রাইভার টম আর ভুরলুপার। কাফ্রিদের মাঝে কথাটা ছড়াল এভাবে যে, রিচার্ড আর র্যাচেলকে পাহারা দেয়ার জন্য ওই সিংহ দুটোকে ডেকে এনেছিল খোদ র্যাচেল।

যাতে অন্য কোন বন্য প্রাণী ওদের ক্ষতি করতে না পারে। সুতরাং র্যাচেলকে বিরাট এক উপাধি দিয়ে দিল কাফ্রিরা। তার সহজ অর্থ, “স্বর্গীয় নারী” বা জুলু ভাষায় “ইনকোসাজানা-ই-জুলা”। জুলা জুলুরই প্রতিশব্দ। এবং আরেকটা উপাধি দিল, “উদাদে-ই-সিলওয়ানা” অর্থাৎ বন্য জন্তুদের বোন! পুরো দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে যাত্রাপথে র্যাচেলের স্বর্গীয় কন্যা উপাধির সুবাদে বিশেষ সম্মান ও সহযোগিতা পেল ওরা।

নেটিভ কাফ্রিদের সাথে খুব সহজেই মিশতে পারে র্যাচেল। কারণ ওদের চিন্তাধারা সহজেই বুঝতে পারে ও। দুর্লভ গুণই বটে। সাদা মানুষরা নিজেদেরকে কাফ্রিদের চেয়ে উন্নত বলে ভাবে। প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানে তারা অগ্রসর বটে। কিন্তু চিন্তাভাবনা বা জীবন দর্শনে কুটিরবাসী একজন বাণ্টুর চেয়ে তারা কি আদৌ খুব বেশি উন্নত? মোটের ওপর, এক গায়ের রঙ ছাড়া আর ভিন্নতা কোথায়? একটা বুলেট থেকে একটা অ্যাসেগাইয়ের ফলা কি বেশি বর্বর? নেপোলিয়ানের মতো চাকাও তো ছিল দিগ্বিজয়ী এক রাজা। তাছাড়া, ওরা অন্তত আমাদের মতো ভগ্নামি করে না। মনে এক কথা রেখে মুখে আরেক কথা বলে না। আমাদের তথাকথিত শহুরে ও সভ্য মানুষদের মতো ওদের ভেতর রুচি বিকৃতি নেই। ওরা ওদের মতো করে সভ্য। খুবই সভ্য।

যাক, যা বলছিলাম, র্যাচেল ওদের সাথে সহজেই মিশতে পারে। যোদ্ধার সাথে কথা বলতে পারে যুদ্ধ নিয়ে, শিকার কর্মরত মহিলাটির সাথেও সহজেই মিশতে পারে। আবার বাচ্চাদের সাথে বাচ্চা হয়ে আশপাশের দুনিয়াকে তাদের মতোই বিস্মিত নজরে দেখতে পারে। ফলে নেটিভদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে ওকে সম্মান না করে। ওদের চোখে র্যাচেল হচ্ছে ইনকোসাজানা। মহান স্বর্গীয় কন্যা।

র্যাচেলের মা যেহেতু নেটিভদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে,

গম্ভীর থাকে, তাই ওদের কাছে সে রহস্যময়। নেটিভরা
র্যাচেলের মায়ের যে নাম দিয়েছে তার সহজ অনুবাদ “কবরের
বুকে জন্মানো ফুল”।

তবে র্যাচেলের বাবার ব্যাপারে কাব্যিকতার ধার ধারেনি
ওরা। সোজাসাপ্টা লম্বা নাম দিয়েছে: “যা বোঝে না, তা নিয়ে
চিৎকারকারী”, সংক্ষেপে “চিৎকারকারী”। এর কারণ হচ্ছে
বক্তৃতা দেয়ার সময় আবেগে আপ্ত হতে গলে চিৎকার করে
ভাষণ দেয় সে। আর “যা বোঝে না” অংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে,
কাফ্রিদের পারিবারিক ব্যাপার-সাপার বা নিয়ম কানুন কখনো
পাত্তা দেয় না মি. ডাভ। আসলে ওসব সে বোঝেও না।
অপরদিকে কাফ্রিরাও সাদাদের পারিবারিক সংস্কার ও নিয়ম
কানুন ভালভাবে গ্রহণ করেনি। তাই মি. ডাভকে নিয়ে ওরা
উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ওদের রীতি-নীতি ঐতিহ্যের কিছুই
বোঝে না মি. ডাভ। তাই তার এই নাম।

আবার র্যাচেলের কথায় আসি। আসলেই প্রকৃতির সন্তান
ও। ওর একাকী সময়গুলো কাটে আকাশ, বাতাস, নদী, সাগর,
বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে। এরাই ওর বন্ধু। জীবিত কোন কিছুকেই
ও কখনো আঘাত করে না। হরিণরা ঘাস খেতে খেতে ওর
হাতের নাগালের মধ্যে চলে আসে। ওর সংস্পর্শে পাখিদের গান
বন্ধ হয় না। লাজুক প্রাণী হাতির দলের খাওয়াও খুব কাছ থেকে
দেখতে পারে ও। এমনকী গোঁয়ার-গোবিন্দ মোষের পালের
কাছে চলে যেতেও ভয় পায় না। জীবিত কেবল দুটো প্রাণীকেই
ভয় পায় র্যাচেল। সে দুটো হচ্ছে কুমির আর সাপ। ওদের
ভেতর দয়ামায়া নেই। এছাড়া ও যেমন কিছুকে ভয় পায় না,
তেমন বনের পশুরাও ওকে ভয় পায় না।

যা হোক, নীরবে ও কোনরকম ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার না করেই
নেটালে পৌঁছে যায় র্যাচেলরা। ওখানে পৌঁছে প্রথম দিকে ওরা

যেখানে আবাস গড়ে সে জায়গাটা বর্তমানে ডারবান নামে পরিচিত। তখন সেখানে মুষ্টিমেয় কিছু রুক্ষ লোকের বাস ছিল কেবল। তাদের জীবিকা ছিল শিকার আর সামান্য কিছু বিনিময়। সেটাকেই তখন আদর করে বলা হতো “ব্যবসা”। শহরের ঘেরের বাইরে ছিল কাফ্রিদের বাস। জুলুল্যাণ্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। এদের মাঝেই ধর্ম প্রচার করতে শুরু করল মি. ডাভ।

কিন্তু ওখানেও স্থানীয়দের সাথে ঝগড়া বাধতে দেরি হলো না মি. ডাভের।

জঙ্গলে থেকে থেকে সাদারাও জংলী আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের সংশোধন করতে চাইল মি. ডাভ। কিন্তু লোকগুলোর মতামত আর ইচ্ছা অনিচ্ছার পরোয়া করল না সে। উপরন্তু প্রতি পদে ওদের ভুল ধরতে লাগল। শেষে অবস্থা এমনই কঠিন রূপ নিল যে, সাদাদের মাঝেও অস্পৃশ্য হয়ে গেল সে। সাদা তো বটেই, এমনকী ভৃত্যদের ধারে কাছে ঘেঁষতেও মি. ডাভকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিল তারা। আগের বিভিন্ন সময়ের মতোই এখানেও ব্যর্থ হলো মি. ডাভ। আবারও তার স্ত্রী-কন্যা আশায় বুক বাধল, ভাবল এবার বোধ হয় ফিরে যাবে প্যাস্টর। কিন্তু আদপে তা হবার নয়। একদিন ঘোষণা দিল এই স্থান ছেড়ে আরো বন্য এলাকার দিকে এগিয়ে যাবে সে। এবারের সিদ্ধান্ত সাবেক জুলু রাজা চাকার ভাই ও খুনি রাজা ডিনগানের রাজত্ব জুলুল্যাণ্ডে গিয়ে ধর্ম প্রচার করবে মি. ডাভ। একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে তা হয়তো বাস্তবায়ন করত সে। ঘটনাক্রম অনুসারে যথাসময়ে তা বলা হবে।

ডারবান শহর ছাড়িয়ে চল্লিশ মাইল দূরে টুগেলা নদীর একটা শাখা নদী আছে। এখান থেকেই জুলুল্যাণ্ডের সীমানা শুরু। জায়গাটা অসাধারণ সুন্দর। এই জায়গার এক মাইল পূর্ব থেকেই

ভারত মহাসাগর শুরু। পশ্চিমে বিশাল টাওয়ারের মতো মাথা তুলে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। ওই পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ছোট একটা ঝর্ণা। ছোট একটা টিলার পাশ ঘেঁষে বিশাল রূপালি সাপের মতো ঐক্যবৈক্যে এগিয়ে গিয়ে মিশেছে টুগেলার সাথে। পুরো জায়গাটা অনেকটা গোছানো ইংলিশ পার্কের মতো। বিস্তীর্ণ ঘেসো প্রান্তরে কোথাও চরে বেড়াচ্ছে ইল্যাণ্ড আবার কোথাও হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে অন্য কোন জাতের হরিণ। এদের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশালাকার গণ্ডার।

ওয়াগন নিয়ে এখানেই পৌঁছুল মি. ডাভ। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল র্যাচেল। নেমেই ওয়াগন থেকে নামতে মাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল ও। ওদিকে ওদের ভৃত্যরা ততক্ষণে ওয়াগনের জোয়াল থেকে ক্ষুধার্ত গরুগুলোকে আলাদা করতে শুরু করেছে।

বড় হয়ে গেছে র্যাচেল। নারীত্বের পূর্ণতা এসে গেছে ওর মধ্যে। লম্বা একহারা কাঠামোর র্যাচেল দেখতেও ভীষণ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। মাকে র্যাচেল বলল, ‘লাফ দাও, আমি তোমাকে ধরব।’

দ্বিধা করছে র্যাচেলের মা। তাই দেখে হাত বাড়িয়ে মাকে রীতিমতো কোলে তুলে মাটিতে নামিয়ে আনল ও।

ওর মা তখন বলল, ‘কত বড় আর সমর্থ হয়ে গেছ তুমি। ভাবতেই অবাক লাগে যে, একদিন এই তোমাকেই আমি কোলে নিতাম।’

হাসতে হাসতেই উচ্ছল র্যাচেল বলল, ‘একটু আমার সাথে একটু হাঁটো। জঘন্য ওই ওয়াগনে বসে নিষ্কৃত তোমার কোমর ধরে গেছে।’ বলে কয়েক কদম হাঁটিয়ে মাকে নিয়ে গেল ছোট্ট একটা টিলার চূড়ায়। সবুজ ঘেসো জমি দেখিয়ে বলল, ‘দেখো, মা, কী সুন্দর! পুরো আফ্রিকার আর কোথাও এত সুন্দর জায়গা

আমি দেখিনি। ওদিকে দেখো! হরিণ চরছে, ওরে, বাবা, একটা গগুরও আছে দেখছি। ওটা এখন আমাদের দিকে তেড়ে না এলেই হলো।’

চারদিকেই দেখতে লাগল মিসেস ডাভ। কিন্তু পাহাড়ের বিশাল কাঠামোর দিকে চোখ পড়তেই তার চেহারায় কেমন যেন শঙ্কার ছায়া পড়ল। বলল, ‘এই জায়গা আমি চিনি। আগে কোথাও দেখেছি।’

‘কী যে বলো না, মা। আগে আমরা কখনো এখানে আসিনি। তাহলে এই জায়গা তুমি চেন কীভাবে?’

‘কীভাবে চিনি জানি না। কিন্তু চিনি। এই পাহাড়, ওই ঝর্ণা, ওই বিশাল গাছ তিনটা আর নীচে চরে বেড়ানো হরিণ সবই আমার চেনা মনে হচ্ছে।’

‘কখনো কখনো এমন লাগে, মা। হঠাৎ কোথাও গেলে জায়গাটা পরিচিত মনে হয়। অবশ্য স্বপ্নে কিছু দেখে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।’

‘হ্যাঁ, স্বপ্ন! কিন্তু মনে করতে পারছি না। মনে হয় দেখেছিলাম এখানেই থাকছি আমরা। র্যাচেল কাঁদছে, আর... আর...’

মাকে থামিয়ে দিল র্যাচেল। স্বপ্নের কথা শুনতে চায় না ও। বলল, ‘আমি জুলুল্যাও যেতে চাই না, ভয়ানক রাজা ডিনগানকেও দেখতে চাই না। এখানেই যদি থাকতে পারি তো মন্দ কী। আমি নিশ্চিত, ওই খুনি রাজাকে বাবা খ্রিস্টান বানাতে পারবে না। মানুষ হত্যা করে যে আনন্দ পায় খুব খারাপ লোক সে। সবুজে ঘেরা এই জায়গাটা আমার কাছে স্বর্গের বাগানের মতো লাগছে। ওই যে প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই গাছটাকে কল্পনা করো জীবন বৃক্ষ বলে। ও, ঈশ্বর! ওই দেখো, অ্যাডামকেও দেখা যাচ্ছে।’

র্যাচেলের বাড়ানো হাত অনুসরণ করে মিসেস ডাভ দেখল, বন্দুক হাতে বুকে হেঁটে একদল হরিণের দিকে এগুচ্ছে পশুর চামড়া গায়ে এক শ্বেতাঙ্গ শিকারী। বলে দিতে হয় না, লোকটার উদ্দেশ্য হরিণ শিকার। তার খানিক পেছনে একটা টিলার পাশে একটা ঘোড়ার রাশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক কাফ্রি। বলা বাহুল্য শ্বেতাঙ্গ লোকটির ভৃত্য সে।

মিসেস ডাভ সকৌতুকে মন্তব্য করল, ‘অ্যাডাম নয়, আমার কাছে ওকে লাগছে রবিনসন ক্রুসোর মতো। তবে তার বিখ্যাত ছাতাটা ছাড়া।’

র্যাচেলের মন্তব্যেও খানিক রসিকতা থাকল। বলল, ‘নিষিদ্ধ গন্ধম ছাড়াও ওই অ্যাডাম আরো কিছু অবশ্যই খায়। নইলে হরিণের পিছু নিত না। অবশ্য বাবা হয়তো বলত, লোকটার নিরামিষভোজী হওয়া দরকার। ওই যে, গুলি করল।’

প্রথমে লোকটার বন্দুকের ডগায় ধোঁয়ার মেঘ দেখা দিল। তার দুই তিন সেকেণ্ড পর ওদের কানে এল গুডুম করে বন্দুকের গুলি ফোটান আওয়াজ। অদূরেই মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল একটা হরিণ। বাকি হরিণের পাল এই আজব আওয়াজে দিল ছুট। কিন্তু মাথা তুলে বাতাসে গন্ধ গুঁকল গণ্ডারটা। তারপর ওটার ছোট্ট লেজটা একদম খাড়া করে ধাওয়া করে এল শিকারীর দিকে।

রেগে গেছে র্যাচেল। বলল, ‘আমাদের স্বর্গের সৌন্দর্য নষ্ট করেছে অ্যাডাম। তাই দোয়া করি, গণ্ডারটা যেন ওকে ধরতে পারে। ওই দেখো, ভয়ে ঘোড়ার দিকে ছুটছে।’

আসলেই অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটছে লোকটি। ঘোড়ায় সে যখন উঠল গণ্ডারটা আর মাত্র চল্লিশ গজ দূরে। ভৃত্য আর সে, দুজনে দুই ঘোড়ায় চেপেই দিল ছুট। গণ্ডারটা দাঁড়িয়ে গেল। সম্ভবত ভাবছে, বদমাশ দু’পেয়েগুলোকে চার্জ করবে কিনা।

তারপর মাথা দুলিয়ে আরেক দিকে চলে গেল। গণ্ডারটা চলে গেলে পরে আবার ফিরে এল দুজনে। শিকার করা হরিণটাকে নিয়ে রওনা হলো র্যাচেলদের ওয়াগনের দিকে।

‘পশুর চামড়া গায়ে একটা লোককে কীভাবে ক্যাম্পে স্বাগত জানাতে হয়, মা?’

আসলে এই কথার জন্য র্যাচেলকে দোষ দেয়া যায় না। লোকটার পোশাকই এমন যে লোকে তাকে দেখে বিভ্রান্ত হবেই। কারণ তার গায়ে সিংহের চামড়া আর কোমরে জেবরার চামড়ার ট্রাউজার পরা লোক তো আর গণ্ডা গণ্ডা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, একেও তেমনই অদ্ভুত দেখাচ্ছে। র্যাচেলের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। দূর থেকেই ও দেখতে পেল লোকটির বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশের মতো হবে। রোদে পোড়া তামাটে মুখটি এক কালে হয়তো সাদাই ছিল। লোকটির মাথার চুল আর দাড়ি দুটোই একদম কালো।

যা হোক, ওদের থেকে ষাট গজ মতো দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটি। তারপর তার ভৃত্যকে কিছু একটা বলল সে। কালো ভৃত্যটি তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল র্যাচেলদের কাছে।

জুলু ভাষাটা র্যাচেল খুব ভালভাবে রপ্ত করেছে। ওই ভাষায়ই ও জিজ্ঞেস করল, ‘কী চাই?’

‘ইনকোসিকাস (অর্থাৎ, মাই লেডি), আমার মালিক আছেন আপনারা বোধহয় ক্ষুধার্ত। তাই আপনাদের জন্য উপহার হিসেবে এই হরিণটি পাঠিয়েছেন তিনি,’ বলতে বলতে ঘোড়ার স্যাডলের সাথে বাঁধা রক্তাক্ত হরিণটির বাঁধন খুলে ফেলল সে। ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সেটি।

রক্তাক্ত দৃশ্যটি দৃষ্টি-সুখকর নয়। তাই চোখ সরিয়ে নিল র্যাচেল। বলল, ‘আমার বাবা আর মা আপনার মালিককে

ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু আপনার মালিকের নাম ক্রী?’

‘আমাদের কালোদের মাঝে তার নাম ইবুবেসি অর্থাৎ “সিংহ”। কিন্তু তার জ্ঞাতিভাই শ্বেতাঙ্গদের মাঝে সে হিশমেল নামে পরিচিত,’ বলল ভৃত্য লোকটি।

‘হিশমেল! হিশমেল? ওহ, বুঝেছি, ইসমাইল। দেখছ, মা, আমার অনুমানের সাথে খানিকটা হলেও মিল আছে। নবী ইসমাইলও তো বন্য পরিবেশে বাস করতেন,’ বলল র্যাচেল।

‘আহা, র্যাচেল, পবিত্র পুরুষদের নিয়ে হালকা কথা বলতে নেই। এভাবে কথা বলতে শুনলে তোমার বাবাও রাগ করবে,’ মৃদু বকুনি দিল র্যাচেলের মা।

‘আপনার মালিক ইসমাইল কোথায় থাকেন?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘সাধারণত বনেই ঘুরে বেড়ান। তবে কাছেই তার ক্রাল আছে। ওই জায়গার নাম মাফুটি।’ পাহাড়ের চূড়ার দিকে ইশারা করে বলল সে। ‘ঘোড়ায় চড়ে গেলে এখান থেকে দুই ঘণ্টার পথ। উনার পেশা শিকার আর জুলুদের সাথে ব্যবসা করা।’

কৌতূহলী র্যাচেল প্রশ্ন করল, ‘উনি কি ডাচ?’

‘না, ডাচ নয়। ডাচদের ঘৃণা করে সে। সে “জর্জের” লোক।’

‘জর্জের লোক? মানে রাজা জর্জের প্রজা? ইংলিশম্যান?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, লেডি, ইংলিশম্যান। আপনাদের মতো। মালিককে আপনাদের হয়ে কিছু বলব?’

‘হ্যাঁ, তোমার মালিক হিশমেল বা বনে ঘুরে বেড়ানো সিংহ, যে বাস করে পাহাড় চূড়ায়, যে ডাচদের ঘৃণা করে আর পরে থাকে জেবরার চামড়ার ট্রাউজার, তাকে বলবে, উপহার পাঠানোর জন্য আমার বাবা আর মা তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে, তারা প্রার্থনা করে তিনি যেন সুস্থ থাকেন। ঠিক

আছে?’

জুলুদের রসবোধ আছে। এই লোকটার হয়তো আরো বেশি। তাই র্যাচেলের কথাটাকে কৌতুক ভাবল সে। দাঁত বের করে হেসে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল লোকটি।

র্যাচেলের মা বলল, ‘তোমার বাবা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হতো।’

‘তাতে লাভটা হতো কী? বাবা এসে ধর্ম নিয়ে ওই লোকটাকে নিজের মতামত শোনাত। কিন্তু আমি ওই লোকটাকে আর কখনো দেখতে চাই না।’

‘কেন নয়, র্যাচেল?’

‘কারণ তাকে আমার পছন্দ হয়নি। যা-ই বলো লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। আর আমার পছন্দ হোক বা না হোক, ধারণা করছি ভবিষ্যতেও এর সাথে অনেকবার আমাদের দেখা হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের স্বর্গটাকে নষ্ট করেছে সে, নির্দোষ হরিণটাকে মেরেছে।’

কোন মন্তব্য করল না মিসেস ডাভ। ভেবে নিল বাপের মতো মেয়ের মাথায়ও স্বেচ্ছাচারিতার ভূত চেপেছে।

তবে আসলে বাবা মেয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মিলই নেই। অদূরদর্শী লোকটার থাকা উচিত ছিল কোন মনাস্ট্রিতে, যেখানে অত্যন্ত কঠোরভাবে ধর্মীয় নিয়ম কানুন পালন করা হয়। অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

র্যাচেল তার বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভীষণ বুদ্ধিমতী ও, পণ্ডিত সুলভ সহজাত প্রতিভাও আছে ওর ভেতর। আগেই বলেছি, গড়গড় করে পড়তে পারে গ্রিক টেক্সট। তবে সত্যি বলতে বাবার প্রিন্ট সুলভ নিয়ম কানুনের বেড়াজালে আটকে প্রতিভাগুলো বিকশিত না হয়ে সুপ্ত হয়ে গেছে। র্যাচেল নিজেও এক সময় বাবার মতো করেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। কিন্তু পরে

ভেবে দেখেছে অনেক সময়ই ঈশ্বরের কাজের ধারণা সহজবোধ্য নয়। তবে ওর ক্ষুদ্র চিন্তায় মনে হয়েছে মানুষের জন্য আসলে ঈশ্বর আর শয়তান দুজনেরই দরকার আছে। সেটা অনেকটা যেন দিন আর রাতের মতো। এক-কে ছাড়া অপরের মূল্য বোঝা দুষ্কর।

এসব চিন্তাধারা এবং আরো অনেক কিছুই র্যাচেল পেয়েছে ওর মায়ের কাছ থেকে। যেমন চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্পষ্ট কথা বলা ও সর্বোপরি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। তবে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যাপারটি ওর মাকে দুর্বল করে ফেললেও ওকে দুর্বল করতে পারেনি। বরং এটাকে নিজের মানসিক ক্ষমতার একটা অংশ বলে ধরে নিয়েছে ও। মেনে নিয়েছে যে বেশিরভাগ লোকই এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একদম অজ্ঞ। ইসমাইলকে দেখে এই ক্ষমতাবলেই র্যাচেল বুঝতে পেরেছে, ওদের ক্ষতি করবে ইসমাইল নামের লোকটি।

ইসমাইলকে নিয়ে মা-মেয়ের কথা শেষ হতে না হতেই হাজির হলো র্যাচেলের বাবা। কাঁটাওয়ালা ডালপালা আনতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল সে। সিংহ আর হায়েনার থাবা থেকে বাঁচতে ক্যাম্প ঘিরে কাঁটা গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া দাঁড় করাতে হবে। এই বেড়াকে স্থানীয় জুলুদের ভাষায় বলে বোমা।

অনেকটাই বুড়িয়ে গেছে মি. ডাভ। মাথা ভরা চুল আর নেই, চুল যা-ও বা আছে পেকে সাদা হয়ে গেছে সেগুলোও। লম্বা দাড়ি রেখেছে সে। চোখের দৃষ্টিও যেন আরেকটু উজ্জ্বল হয়েছে। অর্থাৎ পাগলামিটা আরো বেড়েছে। এবং আরো ঝুঁকিয়ে গেছে সে। তবে সব মিলিয়ে বলতেই হবে, সন্ন্যাসীশুলভ দ্যুতি ফুটে উঠেছে তার অবয়বে।

এসেই সে জিজ্ঞেস করল, ‘হরিণ এল কোথা থেকে?’

ঘটনা খুলে বলল র্যাচেল। ওর মা যা আশঙ্কা করেছিল তা-ই হলো। রেগে গেল সন্ন্যাসী। বলল যে, ক্যাম্প না ডেকে

এভাবে দূর থেকেই একজন উপকারী ব্যক্তিকে বিদায় করে দেয়াটা খুবই অমানবিক ও অসৌজন্যমূলক কাজ হয়েছে। এবং বলা বাহুল্য তা খ্রিস্টানসুলভ আচরণ নয়। আর পোশাকের ব্যাপারে বলল, শিকারের জন্য সিংহ ও জেবরা উভয়ের চামড়াই উপকারী। এতে সহজে লুকিয়ে থাকা যায়। আর আদি পিতা আদমও আদিতে এই ধরনের পোশাকই পরতেন। কাজেই এই পোশাক পরার কারণে একটা লোককে অবজ্ঞা করা মোটেও ঠিক না।

র্যাচেল বলল, ‘বাবা, আমার মনে আছে। যখন বেশি ঠাণ্ডা পড়ত লতা-পাতার পোশাক ছেড়ে আদম (আঃ) গায়ে পশুর চামড়া চড়াতেন। এখন আবার বকাবকি শুরু করো না, আমাকে রাঁধতে যেতে হবে। ওই লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। তাছাড়া সে চলে যাচ্ছিল। তাহলে ওকে আমি ডাকব কেন? অবশ্য তুমি চাইলে লোকটাকে ক্যাম্পে ডাকতে পার। তবে তাকে দাওয়াত দিতে আমি তোমার সাথে যাব না। এখন কষ্ট করে টমকে ডাকো, হরিণটার চামড়া ছাড়াতে হবে।’

কিন্তু মি. ডাভ বলল বেড়ার কাজ করছে টম। ওটা বেশি জরুরি। তাই আপাতত সে নিজেই হরিণের চামড়া ছাড়াবে। যদিও তাকে খুব দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে যে কাজটা সে পারবে কিনা।

ব্যাপারটা বুঝে সাথে সাথেই বাবাকে বাধা দিল র্যাচেল। কারণ ও জানে, কাঁচা মাংস নাড়াচাড়া করাটা ওর স্বভাব। তাই বাবাও পছন্দ করে না। র্যাচেল বলল, ‘টমের যখন সময় হবে তখনই ও মাংস কাটুক। আপাতত সাপারের জন্য ঠাণ্ডা মাংস আছে। আর সাপারের আগে খানিকটা মিলি সেদ্ধ করে নিতে পারব আমি। এখন যাও, বেড়া বানাতে টমকে সাহায্য করো গিয়ে।’

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়েছে। র্যাচেলও শুয়েছে। ওর বাবা-মা শুয়েছে একটা ওয়াগনে। "ওয়াগনের পাশে মাটিতে পাতা ছোট একটা তাঁবু হচ্ছে র্যাচেলের বেডরুম। সাধারণত মাথার নীচে কিছু একটা দিয়ে চোখ বন্ধ করতে পারলেই হলো, র্যাচেলের ঘুম ঠেকায় কে! বালিশটা একটা স্যাডল হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ হয় শুয়েছে ও, ঘুম আসছেই না। শুনতে পেল আগুনের পাশে বসে গল্প গুজব করে দ্রাক্ষা পাতা দিয়ে ধূমপান করল ওদের ভৃত্যরা। তারপর ওরাও ঘুমিয়ে কাঠ। কিন্তু র্যাচেলের চোখে ঘুম নেই। ভৃত্যদেরকে এই নেশা থেকে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করেছে মি. ডাভ। কিন্তু ফলাফল লবডংকা।

ইঠাৎ র্যাচেলের কানে এল হায়েনার হাসি (হায়েনার ডাক অনেকটাই মানুষের হাসির মতো)। ওদের বোমার ঠিক বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা হায়েনা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এগুলোকে লোকে বলে নেকড়ে! কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে হাজির হয়েছে ওরা। খাবারের ভাগ চায়। সুযোগ খুঁজছে, দেখছে, কাঁটা এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা যায় কিনা।

পাশে রাখা বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। গায়ে একটা ক্লোক চড়িয়ে চলে গেল বেড়ার কাছে। হায়েনার গায়ের গন্ধে ওদের গরুগুলোও অস্থির হয়ে উঠেছে। ভয় পাচ্ছে ওগুলো। কাঁটার বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা গেল ওর মাথা। ওকে ইঠাৎ উদয় হতে দেখে খানিক ঘাবড়ে গেল হিংস্র হায়েনাগুলো। ছুটে কিছুটা দূরে সরে গেল ওগুলো।

হায়েনারা ভীষণ হিংস্র প্রাণী। দল বেঁধে আক্রমণে নামলে সাহসীও হয়ে ওঠে। কিন্তু এক দুটো হায়েনা কখনোই বেশি সাহস দেখায় না।

র্যাচেল দেখতে পেল বোমার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধূসর

রঙের তিনটা হয়েনা। ও ইচ্ছা করলেই ওগুলোকে গুলি করতে পারে। কিন্তু গুলি করল না ও। অযথা পশুহত্যা পছন্দ করে না ও। তাছাড়া গুলির শব্দে ক্যাম্পের সবাই জেগে উঠবে। ঘুম নষ্ট হবে সবার। সেটাও চাইছে না র্যাচেল। কাজেই ক্যাম্পের কেন্দ্রে জ্বালানো আগুনের কাছে ফিরে এল ও। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকা কাফ্রি ভৃত্যদের গা বাঁচিয়ে বড় বড় কাঠের টুকরো আগুনে চড়িয়ে দিল। তারপর ওখানেই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ লম্বা সময় অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে চলে গেল হয়েনারা। এরপর বিছানায় ফিরে এল র্যাচেল।

বিছানায় শুতেই মাথায় এল ইসমাইলের চিন্তা। প্রথমেই মনে পড়ল তার জেবরার চামড়ার ট্রাউজারের কথা। ভাবছে, কোন কারণ ছাড়াই লোকটাকে কেন এত অপছন্দ করেছে ও? পঞ্চাশ গজ দূর থেকে দেখেই যদি একটা লোককে এত অপছন্দ করে তাহলে সামনা সামনি দেখলে কী অবস্থা হবে! কে জানে, হয়তো ভাগ্যান্বেষী একজন লোক সে। আর দশজন দুর্ভাগার মতো সে-ও সব হারিয়ে শেষে বনে-আশ্রয় নিয়েছে। বন্য পরিবেশে জংলীদের সাথে মিশে হয়ে উঠেছে ওদেরই মতো বন্য। সেই কারণেই হয়তো আর দশটা জংলীর মতোই তার বেশভূষা। অথবা হয়তো র্যাচেলের অবচেতন মনে ধরা পড়েছে লোকটার এক কালের ইংলিশম্যান সুলভ কুটিলতা। তাই তাকে এত অপছন্দ করেছে ও।

র্যাচেল চেষ্টা করল লোকটার চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিতে। পারলও। কিন্তু মন জিনিসটা বাতাসের মতো। শূন্যস্থান পছন্দ করে না সে। সুতরাং র্যাচেলের মনে চলে এল রিচার্ডের চিন্তা। এত বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু রিচার্ডের কথা একদমই ভোলেনি র্যাচেল। যদিও রিচার্ড চলে যাওয়ার পর আর কোথাও ওর সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায়নি। এমনকী রিচার্ড বেঁচে আছে না মরে

গেছে সে সম্বন্ধেও কিছু শোনেনি র্যাচেল। তবে ও বিশ্বাস করে রিচার্ড মারা গেলে তার আভাস ও অবশ্যই পেত। আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে রিচার্ডের ব্যাপারে আর কিছু শোনার সম্ভাবনাও র্যাচেলের নেই। তবে কথা হচ্ছে, রিচার্ড সেদিন চলে গেলেও র্যাচেলের মন থেকে কখনো মুছে যায়নি ও। এমনকী সেদিনের বিদায়ী চুম্বনের কথাও র্যাচেল ভোলেনি। এসব আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুমে স্বপ্ন দেখল একটা। তবে ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নটার কথা আর ভালভাবে মনে করতে পারেনি। কেবল মনে আছে, স্বপ্নে প্রচুর রক্তারক্তি, লড়াই আর মৃত্যু দেখেছে। স্বপ্নে ইসমাইলও ছিল। এবং লড়াই বাধার পেছনেও ছিল তার হাত। আর ছিল রিচার্ড। অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে ও। তারুণ্য ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠেছে। ইসমাইলের ব্যাপারে র্যাচেলকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছে রিচার্ড।

হঠাৎ র্যাচেলের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখল গুটি গুটি পায়ে ওর তাঁবুর ভেতর চলে আসছে ভোরের প্রথম আলো। স্বপ্নের কথা মনে হলো। তখনি মনে হলো এসব আবোল তাবোল মন থেকে সরানো দরকার। কিন্তু কীভাবে? এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি কেউ। তখনি মনে পড়ল ওদের ক্যাম্প থেকে মাত্র এক মাইল দূরে সাগর। সাগরের শীতল পানি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। সিদ্ধান্ত নিল সাগরেই যাবে। কেউ জেগে ওঠার আগেই গোসল সেরে ফিরে আসবে।

BanglaBook.org

পাঁচ

বন্য প্রাণী আর জংলীদের এলাকার ভেতর দিয়ে সাগরের দিকে যাবে ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল র্যাচেল। তবে উত্তেজনাটাই ওর সামনে এল। ভয়-টয় ওর ধারে কাছেও ঘেঁষল না। কারণ অনেক আগেই ও আবিষ্কার করেছে হাতে গোনা দুয়েকটা প্রাণী ছাড়া অন্যান্য বন্য প্রাণীদের বিরক্ত না করলে তারা কখনোই আগ বাড়িয়ে আক্রমণে আসে না। অবশ্য গণ্ডারের কথা ভিন্ন। ওই গৌয়ার গোবিন্দ সামনে যাকে দেখে তাকেই তাড়া করে। আবার গণ্ডার আকারে বড় বলে অনেকটা দূর থেকেই ওদের দেখা যায়। ফলে আগে-ভাগেই সাবধান হওয়া সম্ভব। এছাড়া হাতি বা মোষও কদাচিৎ নিজ থেকে আক্রমণ করে। তবে মানুষ দেখলে ওগুলোও সাধারণত দূরে সরে যায়। আর জংলীদের নিয়ে র্যাচেলের কোন ভয় নেই। কারণ র্যাচেল দেখেছে, ওকে না চেনা সত্ত্বেও কালোরা ওকে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, সম্মান জানায়। তারপরও দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই। যে কোন সময়ই তা ঘটতে পারে। সেজন্য নিজের ডাবল ব্যারেল বন্দুকটা লোড করে সাথে নিয়েছে ও। ওটার এক নলে লোড করেছে “বল” গুলি, অন্যটায় ভরেছে লুপারা বা ছররা।

ক্যাম্প থেকে বের হবার আগে টমকে ডেকে তুলল ও। ওকে জানিয়ে দিল কোথায় যাচ্ছে। ও ব্যাটা ঘুম ঘুম চোখে কী যেন

বলল। তবে সেদিকে বিন্দুমাত্রও নজর দিল না র‍্যাচেল। বোমার বেড়া থেকে একটু কাঁটা সরিয়ে সেদিক দিয়ে “নেই” হয়ে গেল ও।

সাগর পাড়ে পৌঁছুতে বিশ মিনিটের বেশি লাগল না। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল পাথর ঘেরা একটা প্রাকৃতিক পুল। এ ধরনের পুলে হাঙর ঢুকতে পারে না। জলপরীর মতো সাঁতার কেটে বেড়াল ও। গোসল শেষে ভেজা চুল মেলে দিয়ে পাথরের ওপর বসে রইল র‍্যাচেল। বাতাসে চুল শুকাতে শুকাতে সাগরে সূর্যোদয়ের অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যটি প্রাণভরে উপভোগ করছে ও। হঠাৎ শুনতে পেল কুয়াশার পেছন থেকে ভেসে আসছে দুটো ঘোড়ার পদশব্দ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল র‍্যাচেল। প্রথম প্রথম কিছুই দেখতে পেল না। তারপর সবার আগে নজরে এলো জেবরার ডোরা। হেসে ফেলল র‍্যাচেল। ভাবল জেবরাকে ঘোড়া ভেবে বসেছি। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি মিলিয়ে গেল। কারণ জেবরার ডোরাটা একটা ট্রাউজারের আকৃতি নিয়েছে। তার মানে ইসমাইল!

র‍্যাচেল খুব বেশি বইপত্র পড়েনি। তবে ওর জানা আছে অনেক মেয়েকেই এভাবে তুলে নিয়ে গেছে দুষ্ট লোকেরা। আঁতকে উঠে র‍্যাচেল ভাবল, কয়েক মুহূর্ত আগে এলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেত। কাপড় ছেড়ে গোসল করছিল ও। তবে এখন অসুবিধা নেই। ভাবতে ভাবতে, বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। মনে মনে বলল, ‘এসো, মি. ইসমাইল, দেখাচ্ছি মজা!’

কিন্তু যখন ইসমাইল পুরোপুরি দৃশ্যমান হলো দেখা গেল একটা ঘোড়ায় চেপে এসেছে সে। আর অপর হাতে ধরে আছে স্যাডল পরানো আরোহীশূন্য আরেকটা ঘোড়ার লাগাম। তার চেহারায় ভয়ের ছাপ। সকৌতুকে র‍্যাচেল ভাবল, গুণ্ডারটা আবার তাড়া করেছে নাকি?

র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’

র্যাচেলকে অবাক করে দিয়ে বিশুদ্ধ মার্জিত ইংরেজিতে লোকটি বলল, ‘ক্ষমা করবেন, একান্ত সময়ে বিরক্ত করায় ক্ষমা করবেন, লেডি। জুলুরা...’

‘হ্যাঁ, বলুন, কী করেছে জুলুরা?’

‘কিছু পলাতককে ধরতে এদিকেই আসছে একদল জুলু যোদ্ধা। ওই পলাতকরা সংখ্যায় পঞ্চাশ জনের মতো। এক ঘণ্টা আগে আমার ক্রালের পাশ দিয়ে চলে গেছে ওরা। তখনি দেখেছি, ওদের অনুসরণ করছে এক জুলু চর। তাই আপনাদের সতর্ক করতে রওনা হয়েছিলাম আমি। ক্যাম্পে পৌঁছে শুনলাম আপনি এদিকে এসেছেন। আপনার বাবা-মা খুব দুশ্চিন্তায় আছে। তাই আপনাকে নিতে এসেছি। কারণ ওদের হাতে ধরা পড়লে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।’

‘অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু জুলুদের নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। আমার মনে হয় না ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে,’ বলল র্যাচেল।

‘ক্ষতি করবে না! কিন্তু কেন? আপনি যেমন সুন্দর, আমার তো মনে হয় দেখা মাত্রই আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে জুলুরা। আর আপনি কিনা বলছেন ক্ষতি করবে না!’

হেসে র্যাচেল বলল, ‘কেন করবে না, তা সঠিক জানি না। তবে, ওরা আমাকে ডাকে ইনকোসাজানা-ই-জুলা নামে এই নামধারীকে ওরা স্পর্শও করবে না।’

‘হ্যাঁ? “ইনকোসাজানা-ই-জুলা”! কিন্তু আপনাকে কেন ওদের আত্মা বলবে? নামটা আপনি পেলেন কীভাবে!? যাক, ওসব পরে জানা যাবে। এখন জলদি ঘোড়ায় চাপুন। জুলুদের অভ্যাস হচ্ছে প্রথমে মারে পরে প্রশ্ন করে,’ বলল ইসমাইল।

ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো ওরা। সূর্য এখনও পুরোপুরি

ওঠেনি, দিগন্তে মাথা জাগাতে শুরু করেছে মাত্র। কুয়াশা আছে এটে, তবে সেটা আগের মতো ঘন নয়। এই ধোঁয়াশার ভেতরই র‍্যাচেলদের সামনে একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

ওরা দেখতে পেল ওদের দিকে ছুটে আসছে খুবই হালকা তামাটে গাত্রবর্ণের একটা তরুণী। মেয়েটার পরনে মুচা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই তার দীর্ঘ দেহবল্লুরী প্রায় পুরোটাই দৃশ্যমান। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেয়েটি। হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে ছুটছে সে। কিন্তু আর দম ধরে রাখতে পারল না। কয়েক কদম ছুটেই মাটিতে পড়ে গেল সে। মেয়েটার পেছনে ছুটে আসছে লম্বা ফলার বর্শাধারী এক জুলু যোদ্ধা।

‘চলে আসুন, একটা জুলু মেয়ের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না...’

কিন্তু র‍্যাচেল নড়ল না। ঘোড়ার রাশ টেনে আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। ওকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল কালো মেয়েটি। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে ছুটে এল র‍্যাচেলের দিকে। এসেই র‍্যাচেলের পা ধরে বসল। ‘লেডি, বাঁচান আমাকে, দয়া করুন, বাঁচান!’

ইসমাইল বলল, ‘পা না ছাড়লে গুলি করে মেরে চলে আসুন, লেডি।’

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল র‍্যাচেল। জুলু যোদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্ট কণ্ঠে বলল, ‘দাঁড়াও।’ লোকটি সত্যিই দাঁড়িয়ে গেল। ‘এই মেয়ের কাছে কী চাও?’

দম নিতে নিতে যোদ্ধা বলল, ‘হয় সাথে নিয়ে যাব, নয়তো মেরে রেখে যাব।’

‘কার হুকুমে ওকে মারবে?’

‘রাজা ডিনগানের হুকুমে।’

‘কী অপরাধ করেছে মেয়েটি?’

‘ও ডাইনি, কালো জাদুকরী। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার সাহস কোথায় পেলেন, সাদা নারী? কে আপনি?’

গর্বভরে র্যাচেল বলল, ‘আমি সে, যাকে মানতেই হবে। ফিরে যাও। মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছি আমি।’

র্যাচেলের কথা শুনে হা হা করে হিংস্রভাবে হেসে উঠল জুলুটি। তারপর এগুতে থাকল।

র্যাচেল আবার বলল, ‘ফিরে যাও।’ কিন্তু ওর কথায় পাত্তাই দিল না সে। এগুতেই থাকল।

এবার র্যাচেল বলল, ‘ফিরে যাও নয়তো মরবে।’

‘নিশ্চয়ই মরব। ওই মেয়েকে ছাড়া ডিনগানের কাছে ফিরলে মৃত্যু অবধারিত। নোয়ি, আমার সাথে জীবিত যাবি, না এখানেই তোকে মেরে রেখে যাব? জলদি বল, ডাইনি,’ বলতে বলতে অ্যাসেগাই তুলল জুলু সৈন্যটি।

‘মেরে ফেল্। আমি যাব না। রাজাকে কোন স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করিনি আমি। ওর বৌ আমি কোন দিনই হব না। দরকার হলে হব মৃত্যুর সঙ্গী। তারপর ভূত হয়ে ঢুকব রাজার ক্রালে।’

‘বেশ। তোর কথা রাজাকে হুবহু জানাব আমি। এবার উঠে দাঁড়া। আর, সাদা লেডি, আপনি একটু সরে দাঁড়ান। আপনাকে মারার হুকুম পাইনি আমি।’

র্যাচেল সরল তো না-ই, উল্টো জুলুর দিকে বন্দুক তাক করল।

এবার মুখ খুলল ইসমাইল। র্যাচেলকে বলল, ‘আপনি পাগল হলেন? ওর গায়ে টোকা পড়লেও আমাদের সবাইকে খুন করবে জুলুরা।’

জুলুটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ভর্ৎসনার সুরে ইসমাইলকে র্যাচেল বলল, ‘আপনি কি কাপুরুষ?’ তারপর জুলু

ভাষায় বলল, ‘শোনো, যোদ্ধা, টুগেলা নদীর এই পাড় ইংরেজদের দিয়েছে স্বয়ং রাজা ডিনগান। এটা আমাদের জায়গা। এপাড়ে এসে খুনোখনি করার অধিকার তোমাদের নেই। এই মেয়ে আমার। কাজেই, আর এক পা এগিয়েছ তো মরবে।’

‘দেখা যাবে কে বাঁচে আর কে মরে,’ বলেই লাফ দিল যোদ্ধাটা।

বন্দুক তাক করেই রেখেছিল র্যাচেল। স্রেফ ট্রিগার টেনে দিল ও। মাটিতে আছড়ে পড়ল জুলু যোদ্ধার প্রাণহীন দেহ।

ভয় পেয়ে গেল ইসমাইল, ভীষণ ভয়। ভীত, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ‘কী করলেন এটা?’

‘ন্যায় বিচার করেছি।’

প্রায় হাহাকার করে ইসমাইল বলল, ‘না, নিজের মৃত্যুর সমন জারী করেছেন। আমি এর মধ্যে নেই। এখানে থাকলে আমার গলাও কাটা পড়বে।’

‘যান, চলে যান। আমার দেখা-শোনার জন্য আপনার চেয়ে অনেক ভাল অভিভাবক আছে,’ বলল র্যাচেল।

কোন উত্তর খুঁজে পেল না ইসমাইল। নিজের ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওটার দেখাদেখি এগিয়ে গেল অপরটাও। রওনা হয়ে গেল ইসমাইল। পেছনে পড়ে রইল দুই নারী। র্যাচেলদের ওয়াগন যদিকে আছে সেদিক থেকে ভেসে আসছে মারিয়ারি আর আর্তনাদের আওয়াজ। কাফ্রি মেয়েটি বলল, ‘এখানে ওর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলেছে রাজার সৈন্যরা।’

এই মারকাটারি অবস্থা পেরিয়ে ক্যাম্পে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনকী ঘোড়া থাকলেও না। স্রেফ মারা পড়বে ওরা। তখনি একটা বুদ্ধি এল র্যাচেলের মাথায়। ওরা দাঁড়িয়ে আছে ঝোপে

ঘেরা একটা খাড়াইয়ের মাথার ওপর। ওটার পাশ থেকে নীচে নেমে গেছে একটা ঝর্ণা। ভরা বর্ষায় এটার পানি সাগর পর্যন্ত গড়ায়। তবে এখন ঝর্ণা থেকে সামান্য পানিই আসছে। এবং কাদায় ভরা ডোবায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে ঝর্ণার গতিপথ। ডোবাটায় কুমিরও আছে বেশ কিছু।

র্যাচেল বলল, ‘লোকটাকে ওটায় ফেলব। এসো, আমাকে সাহায্য করো।’

দুজনে মিলে টানাটানি করে ডোবায় নিয়ে ফেলল জুলু যোদ্ধার মৃতদেহটা। ‘কুমিরগুলোই লাশটার ব্যবস্থা করবে। এখন লোকটার বর্ষা আর ঢাল তুলে নাও। এগুতে হবে,’ বলল র্যাচেল।

এরপর ওরা দুজনে গিয়ে নামল নীচের কুফে। ডোবার পাড়ে আসতেই দেখল রীতিমতো বলকাচ্ছে ওটার কাদাপানি। মৃতদেহটার “সংকার” করছে কুমিররা। কাফ্রি মেয়েটাকে র্যাচেল বলল, ‘তোমার মুচাটা খুলে ওই পাথরের ওপর ফেলে রাখো। জুলুরা এটা খুঁজে পাবে। তারপর যা ইচ্ছা ওরা ভেবে নিক...’

র্যাচেলের কথামতো মুচাটা খুলে পানিতে ভিজিয়ে একটা পাথরের ওপর ফেলে রাখল ও। তারপর র্যাচেলের হাত ধরে পাথরের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল সাগর তীরের দিকে। পাথরে পাথরে পা ফেলে এগুলো ওরা যাতে কোথাও পানির ছাপ না পড়ে।

র্যাচেল যেই পূলে গোসল করেছে, খেয়াল করেছে, ওখানে একটা প্রাকৃতিক গুহা আছে। লম্বায় সেটা হচ্ছে আনুমানিক ষাট গজ। তবে ওতে থাকা পানির গভীরতা হচ্ছে বড়জোর তিন ফুট। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, ওখানে প্রচুর সামুদ্রিক ঘাস আর লতাপাতা রয়েছে। ওসবের তলায় লুকিয়ে পড়লে কার সাধ্য

খুঁজে বের করে। ওখানে পৌঁছে নোয়িকে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল,
'তুমি সাঁতার জানো?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নোয়ি। কাজেই দেরি না করে পানিতে
নেমে পড়ল দুজনে। সাঁতরে চলে গেল গুহার ভেতরে পকেট
মতো জায়গাটায়। জায়গামতো পৌঁছে সামুদ্রিক লতাপাতায়
নিজেদের ঢেকে ফেলল ওরা। কাজ সারার পাঁচ মিনিট হতে না
হতেই হাজির হয়ে গেল দুজন জুলু যোদ্ধা। গুহার ভেতর
পানিতে শরীর ডুবিয়ে এমনভাবে ওরা পড়ে রইল যে, পানির
ওপর ওদের নাকটাই কেবল ভেসে রইল। তা-ও লতাপাতার
ভেতর।

ফিসফিস করে নোয়ি বলল, 'জুলুরা চলে এসেছে।'

জবাবে নিচু গলায় র্যাচেল বলল, 'আমার বন্দুক ভিজে
গেছে। এটা দিয়ে গুলি করা যাবে না। কাজেই চুপ করে পড়ে
থাকো।'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠদুটো। তবুও সাবধানতা
হিসেবে আরো কিছুক্ষণ অনড় রইল দুজনেই। সাবধান থেকে
লাভই হয়েছে। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার শোনা গেল
সেই দুই যোদ্ধার কণ্ঠ। আশপাশে কাউকে না পেয়ে বিশ্রাম নিতে
এখানেই আবার ফিরে এসেছে দুজনে। র্যাচেলদের প্রায় মাথার
ওপর গুহাটার ছোট্ট একটা মুখ আছে। ওখানেই পা ঝুলিয়ে
বসল দুই জুলু।

জুলুদের দুজনের হাতেই রক্তে লাল হয়ে থাকা বর্শা। ওদের
একজন অপরজনকে বলল, 'গাধা কোথাকার, শুধু শুধু এতদূর
টেনে এনেছ আমাকে। নোয়িকে কুমিরে খেয়ে ফেলেছে। জাদু
বিদ্যা ওকে কুমিরের দাঁত থেকে বাঁচাতে পারেনি। মাটিতে যে
পায়ের ছাপ দেখেছ, গাধা, সেটাও নোয়ির নয়, বের্বুনের।'

অপরজন বলছে, 'মুচাটা আমরা ডোবার ধারে পেয়েছি,

সেজন্যই এই কথা মনে হচ্ছে তোমার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বোম্বা ওকে ধাওয়া করছিল। ও কোথায় গেল? আর ঘাসের ওপর রক্তের দাগই বা এল কোথা থেকে?’

‘নিঃসন্দেহে নোয়িকে বন্দি করেছিল বোম্বা। আহতও করেছে। রক্তটা নোয়ির গা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত। আর জানোই তো মেয়েরা কেমন হয়। নোয়িও একইরকম, ভীতুর ডিম। বোম্বার হাত থেকে ছুটে গিয়ে নির্ঘাত লাফিয়ে পড়েছে ওই কাদার ডোবায়। ওখানে যে কুমির আছে সেটা ওর জানার কথা না। আর জানলেই বা কী, কুমিরের ওপর জাদু চলে নাকি? এখন কুমিরের পেটেই বসে আছে জাদুকরী নোয়ি। আর বোম্বার কথা কী বলব, ও ব্যাটা হয়তো কোথাও বিশ্বাস নিতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়তো ফিরে গেছে জুলুল্যাঙে। আর, আরেকটা পায়ের ছাপ কোন শ্বেতঙ্গ নারীর। ওরা পায়ের ওপর “চামড়া” পরে (অর্থাৎ, জুতো)।

ওদিকের পাহাড়ের ওপর ওদের একটা ক্যাম্প আছে শুনেছি। তবে মনে রেখো, জর্জের লোকদের গায়ে ভুলেও হাত তোলা যাবে না। কাজেই ওই ক্যাম্পের লোকদেরও কিছু বলা যাবে না। জর্জকে রাগাতে চায় না ডিনগান।’

‘তাহলে তো, ভাই, আমাদের এখনি দেশের দিকে রওনা হওয়া উচিত। বেশি দেরি করলে সাদাদের সাথে ক্যাচাল বেঁধে যেতে পারে। নোয়ির মুচাটা ডিনগানকে দেখালেই শান্ত হবে সে। আরাম করে ঘুমাতে পারবে তখন। কিন্তু আমি ভাবছি নোয়ির কথা। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই অদ্ভুত কিছু একটা আছে। নইলে সারা জুলুল্যাঙ যেখানে ডিনগানের হাতি, সেখানে এই বেটির প্রেমে রাজা পড়বে কেন? আর পড়ল তো পড়ল, তুই বেটি কোন সাহসে রাজাকে ফিরিয়ে দিস? লাভটা কী হলো? বুড়ো বাপ সহ তোর পুরো বংশ শেষ। জাদুকর বাপ, নিজের মা,

তিনটা সৎ মা, বারোজন ভাই-বোন 'সব শেষ, কেবল তোর জেদের কারণে।'

'কিন্তু, ভাই, আমার এখনও বিশ্বাস হয় না ও মরেছে। আমার মনে হয় নিজের ওপর জাদু করে পাখি বা সাপ হয়ে পালিয়ে গেছে নোয়ি।'

ওদিকে এত দুঃসংবাদ একসাথে শুনে পানির নীচে কেঁপে উঠল নোয়ি। ঢেউ উঠল পানিতে। তখন ওপরে বসে থাকা এক জুলু বলল, 'পানিতে একটা মাছ আছে মনে হচ্ছে। পানিও কম, চেষ্টা করব নাকি মাছটা ধরতে?'

'না, ভাই। ক্ষুধা আমারও লেগেছে। কিন্তু পানির মাছ খায় উপকূলের লোকেরা। আমরা মাটির মানুষ। তাই প্রকৃত মানুষের মতোই খাবার খাব,' বলে ধাঁ করে পানিতে ছুঁড়ে মারল ছোট একটা পাথর। আরেকটু হলে র্যাচেলের মাথায় লাগত পাথরটা। এরপর উঠে পড়ল দুজন। হাতে হাত ধরে ভদ্রলোকের মতো হেঁটে যেতে লাগল। অবশ্য, নিজেদের মতো করে ওরা অবশ্যই ভদ্রলোক।

জুলুরা চলে যাবার পরও লম্বা সময় পানিতেই রইল ওরা। ভয় পেল, ওরা আবার ফিরে না আসে। একসময় ঠাণ্ডা সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেল। ওদিকে জোয়ারও আসছে। এখানে থাকলে স্নেফ ডুবে মরতে হবে। কাজেই ওপরে উঠতে বাধ্য হলো ওরা। তবে ওপরে ওঠাটাও একটা বিরাট ঝক্কির কাজ। কারণ এক হাতে ভারী বন্দুক বইছে র্যাচেল। ফলে সাঁতার কাটা ওর জন্য কঠিন হয়ে গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত উঠল ওরা।

একে তো ঠাণ্ডায় পর্যুদস্ত তার ওপর পুরো পরিবার হারানোর বেদনা। ভেঙে পড়ল নোয়ি। কাঁদতে শুরু করল। কাঁদাটাই স্বাভাবিক। ওর নিজের কারণে মারা গেছে ওর পরিবারের সবাই। বিলাপ করতে শুরু করল নোয়ি, 'লেডি, আপনি দয়ালু।

কিন্তু আমার প্রতি দয়া না করে বোম্বার বর্ষায় আমাকে মরতে দিলেই ভাল করতেন। এক মুহূর্ত কষ্ট পেতাম কেবল, কিন্তু এখন থাকতাম আমার পরিবারের সঙ্গে। কেন বাঁচালেন, লেডি?’

এই কথার কোন জবাব হয় না। ওর হাতটা ধরল র্যাচেল। সহানুভূতি জানিয়ে সামান্য একটু চাপ দিল হাতে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। র্যাচেল ওকে বাধা দিল না। ও নিজেও শুয়ে পড়ল নোয়ির পাশে। তীব্র রোদ থেকে বাঁচাতে ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার গায়ে টেনে দিল সামুদ্রিক আগাহার পর্দা। রোদের তাপে ওরাও উত্তপ্ত হয়ে গেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। কাজেই নোয়িকে ডেকে তুলল র্যাচেল।

‘ওঠো, নোয়ি। জুলুরা চলে গেছে। ক্যাম্পের দিকে রওনা হই, চলো।’

‘আপনার বাবার ক্যাম্প আমার জন্য কি একটু জায়গা হবে, লেডি?’

‘একটা জায়গা আমি বের করে নেব’খন। কারণ তোমার জীবন এখন আমার। চলো।’

‘ঠিক বলেছেন, লেডি, আমার প্রাণ এখন শুধুই আপনার,’ বলে নিজের কপালে ঘষে দিল র্যাচেলের হাত।

একসময় সেই ডোবাটার পাশে এসে পৌঁছল ওরা। দেখল ভরপেট খেয়ে রোদ পোহাচ্ছে দুটো কুমির। সন্দেহ নেই এদের পেটেই গেছে বোম্বার মরদেহ। ডোবাটাকে পাশ কাটিয়ে ক্রিফের মাথায় পৌঁছল ওরা।

র্যাচেল ওকে বলল, ‘বুকের সামনে ঢাল ধরে অপর হাতে নাও বর্ষাটা। দৃঢ় পায়ে হাঁটো। দেখে যেন মনে হয় কোন জুলু যোদ্ধা যাচ্ছে।’

যা হোক, খুব সাবধানে এগুল ওরা। একটু এগুতেই দেখল গাছের নীচে বসে আছে একটা হরিণ। পাশেই ঘাস খাচ্ছে

আরেকটা। ভাল লক্ষণ। এর অর্থ জুলুরা ওখানে নেই। তারপর আরেকটু এগিয়ে একটা ছোট টিলার মাথায় চড়তেই দেখল নীচে শুয়ে আছে কতগুলো কালো লোক। সাথে সাথে র্যাচেল নিচু হলো। বলল, ‘জুলুরা ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছে!’

নোয়ি তখন বলল, ‘না, লেডি, জুলুরা নয়। আমার পরিবার। জুলুরা ওদের মেরে ওভাবে ফেলে রেখে গেছে। শকুন উড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না?’

আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল দুজনে। প্রতিটা মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের নাম জানাল নোয়ি। লম্বা ও জুলুদের তুলনায় বেশ ফর্সা, উজ্জ্বল তাম্র বর্ণের এক মহিলার মৃতদেহ দেখিয়ে নোয়ি বলল ও-ই আমার স্তন্যদাত্রী মা। ওর পাশে ওই তিনজন আমার সৎ মা। আরেকটু সামনে এগুতেই পেল বর্শাবিদ্ধ দুটো জুলু যোদ্ধার মৃতদেহ। পিঁপড়ার টিবির পাশে সামনা সামনি মুখ করে বসিয়ে রাখা হয়েছে দুজনকে। যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। দু’কদম এগুতেই আরেকজনকে দেখা গেল। কিন্তু এর গায়ে আঘাতের কোন নমুনা নেই। দেখে মনে হচ্ছে এ-ও বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

শীতল কণ্ঠে নোয়ি বলল, ‘ওই যে বসে আছে আমার বাবা।’

র্যাচেল জোর কদমে এগিয়ে গেল। বলল, ‘এর গায়ে কোন আঘাত নেই, সম্ভবত বেঁচে আছে।’

‘না, লেডি, মারা গেছে। তার জাতির রীতি অনুযায়ী সাদা মৃত্যু হয়েছে তার।’

এবার র্যাচেল বোকা হয়ে গেল। সাদা মৃত্যু! সেটা কী জিনিস? মৃত্যুর কি রং হয়?

নোয়ির বাবা জুলু নয়। জুলুদের থেকে বেশ খাটো সে। আজ পর্যন্ত যত কাফ্রি বা আদিবাসী র্যাচেল দেখেছে তাদের কারো সাথেই এর মিল নেই। খুব কৌতূহল হলো র্যাচেলের, যে

কোন জাতির লোক সে। তবে তখনি নোয়িকে কিছু জিজ্ঞেস করল না ও। কারণ সময়টা উপযুক্ত নয়।

নোয়ি এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। বাবার মৃতদেহের গলা জড়িয়ে ধরে এক মিনিটের মতো সময় নিয়ে তার কানে কানে কী যেন বলল ও। দৃশ্যটা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। মৃতের কানে কেউ কিছু বলবে কেন? কিন্তু র্যাচেলের বিভ্রান্তি আরো বাড়ল যখন দেখল নোয়িও ওর বাবার মৃতদেহের ঠোঁটের সামনে কান নিয়ে বসে রইল প্রায় এক মিনিট ধরে। মাঝে মাঝে সম্মতিসূচকভাবে মাথাও নাড়ল! শুধু অদ্ভুত নয়, ভীষণ অদ্ভুত একটা দৃশ্য। জীবিত একজন মানুষ কীভাবে মৃত কারো সাথে কথোপকথন করে!

একসময় উঠে দাঁড়াল নোয়ি। স্বগতোক্তির মতো করে বলল, ‘আমার আত্মাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ সময় থাকতেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে সে। আমি সংবাদটা পেয়েছি।’

খাবি খেয়ে উঠল র্যাচেল, ‘সংবাদ মানে! কীসের সংবাদ?’

কেমন অদ্ভুত হয়ে গেছে নোয়ির চেহারা। ও বলল, ‘সংবাদটা আমার জন্য। তবে এটুকু বলতে পারি, তাতে বারবার আপনার কথাই বলা হয়েছে, ইনকোসাজানা-ই-জুলা।’

‘আমার এই নাম তুমি জানলে কী করে?’ আশ্চর্য হয়ে গেছে র্যাচেল।

‘সংবাদে নামটা শুনেছি। জেনে রাখুন, জুলু রাজাও আপনার সামনে মাথা নোয়াবে।’

‘বাজে কথা, বলো আমার লোকদের কারো কাছ থেকেই এই নাম শুনেছ তুমি।’

উদাস কণ্ঠে নোয়ি বলল, ‘ধরে নিন তা-ই। আপনার লোকদের থেকেই শুনেছি, যাদের আমি কখনোই দেখিনি। এখন

চলুন, আপনার বাবা আপনার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে আছেন।’

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল র্যাচেল। ওদিকে নোয়ি বলে চলেছে, ‘লেডি, আজ থেকে আপনার ভৃত্য আমি। আর আমি কখনো হালকাভাবে সেবা করি না। আমাকে এখানে যা-ই করতে দেখেছেন, কাউকে কখনো বলবেন না। এটা আপনার আর আমার একান্ত গোপন ব্যাপার। লোককে বলবেন সাধারণ একটা কাফ্রি মেয়ে আমি।’

‘কেন কিছু বলব না?’

জবাব দিল না নোয়ি। কেবল বলল, ‘এটুকুই আমার বলার ছিল।’

ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল দুজনে। র্যাচেলের মুখে দ্বিধার ছাপ আর পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে নোয়ির চেহারা।

ছয়

র্যাচেলদের ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেল দুজনে। বোমার ঘেরের ভেতর ক্যাম্প একদম সুনসান, নীরব। এতই নীরব যে, ক্যাম্পের মাত্র একশ’ গজের মধ্যেই যে একটা ম্যাসাকার ঘটে গেছে তা মনেই হয় না। কাঁটার বেড়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে গরু ঘোড়া সব। ওদের উপস্থিতি টের পেয়েই হুলস্থূল পড়ে গেল ক্যাম্পের ভেতর। স্বভাবতই ওরা ভেবেছে জুলুদের হাতে বন্দি

অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে এসেছে র্যাচেল ।

নোয়িকে ঢাল আর বর্শা নিচু করতে বলল র্যাচেল । তখনই বোমার দেয়ালে একটু ফাঁক তৈরি হলো, বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল র্যাচেলের বাবা । কাছে এসে সে বলল, ‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি । তোমার জন্য ভীষণ উদ্বেগে ছিলাম আমরা । বারবার প্রার্থনা করছিলাম ওই ইস্রাইল না ইসমাইল লোকটা যেন তোমাকে উদ্ধার করতে পারে ।’ তারপর ব্যাখ্যা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘ভোরে হঠাৎ ওই লোক ক্যাম্পে এসে হাজির । তোমাকে খুঁজছিল সে । এখানে না পেয়ে তার ভৃত্যের ঘোড়াটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল । ওই ভৃত্য লোকটা এখনও এখানেই আছে । কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়, বলো তো?’ বলতে বলতেই হঠাৎ নোয়ির উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলো সে । ওর অবস্থা দেখে যারপরনাই বিস্মিত । উপরন্তু মেয়েটার হাতে ঢাল আর বর্শা । এতক্ষণে প্রশ্ন করল মি. ডাভ, ‘এই মেয়ে কে?’

‘স্থানীয় একটা মেয়ে ও । ম্যাসাকারের সময় জুলুদের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছি আমি । লম্বা গল্প সংক্ষেপে বলছি, এক জুলু সৈন্য এই মেয়েটাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল । তখন ওই জুলুটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি আমি । মৃতদেহটা ফেলে দিয়েছি পাশের একটা ডোবায় । কিন্তু তোমাদের খবর কী? মা ঠিক আছে?’

‘গুলি করে মানুষ মেরেছ! মৃতদেহটা আবার ডোবায় ফেলেও দিয়েছ! বলছ কী এসব? আর অত ভোরে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে গেলেই বা কেন?’ বিস্মিত মি. ডাভের অতিরিক্ত বিস্মিত প্রশ্ন ।

‘জানি না কেন গেছি, বাবা । হয়তো এই মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে বলে ঈশ্বরই আমাকে ওখানে পাঠিয়েছে । সঠিক জানি না ।’

র‍্যাচেলের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নোয়ির জন্য কম্বল আনতে চলে গেল মি. ডাভ।

ওদিকে ভৃত্যদের কাঁধে ভর দিয়ে নীচে নেমে এসেছে মিসেস ডাভ। এসে সে বলল, ‘আমি জানতাম, র‍্যাচেল, নিরাপদেই থাকবে তুমি। তবে এভাবে হঠাৎ গায়েব হয়ে গিয়ে তোমার বাবাকে ভীষণ উদ্ভিগ্ন করে দিয়েছিলে। কিন্তু এই মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে?’

একটা কম্বল নিয়ে এসেছে মি. ডাভ। নোয়িকে ওটা দিল সে। কম্বলটা গায়ে পেঁচিয়ে নিল নোয়ি। তারপর ওকে সহ সবাই রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। ভেজা পোশাক ছেড়ে খেতে বসল র‍্যাচেল। নোয়িকেও জোর করে খাইয়ে দিল ও। মেয়েটার চোখে পানি এসে গেছে। কারণ ওর বাবা ছাড়া আর কেউ এভাবে ওকে জোর করে খাইয়ে দিত না। যা হোক, তখন ওকে বাঁচানোর গল্প শোনাল নোয়ি।

সব শুনে সাথে সাথেই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল মি. ডাভ। র‍্যাচেলকে ফিরিয়ে দেয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল ঈশ্বরকে। আর মানব হত্যা করায় র‍্যাচেলের হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে। এবং প্রার্থনা করল যেন র‍্যাচেলের মনের ওপর ওই ঘটনার কোন কু-প্রভাব না পড়ে।

প্রার্থনা শেষ হলে বাবাকে র‍্যাচেল বলল, ‘বাবা, আমি জানি, ওই সময় আমার জায়গায় যদি তুমি নিজে থাকতে পারতাম, আমি যা করেছি তুমিও তা-ই করতে। এমনকী বন্দীক তুলতে পারলে মা-ও একই কাজ করত। তাহলে এটাকে পাপ হিসেবে দেখছ কেন? আর, এক ইসমাইল ছাড়া অন্য কেউ ঘটনাটা ঘটতে দেখেনি। কাজেই এটা নিয়ে যত কম কথা বলা হবে আমরা ততই নিরাপদ থাকব।’

‘আমিও মানি, অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমার কাজটা ভুল ছিল

না। কিন্তু আমার ভয় হয়, কোন না কোনভাবে সত্যিটা প্রকাশ পাবেই। কারণ রক্তই রক্ত ডেকে আনে। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে? ওকে খুঁজতে জুলুরা অবশ্যই আবার বের হবে। তখন ওকে এখানে পেলে ওকে তো মারবেই, আমাদের সবাইকেও খুন করবে।’

‘না, বাবা, জুলুরা জানে মারা গেছে নোয়ি। অবশ্য ইসমাইল যদি আসল ঘটনা ফাঁস করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু আমার মনে হয় না ইসমাইলও কিছু বলবে। কারণ, ও কিছু বলতে গেলে জুলুরা ভাববে ও-ই সৈন্যটাকে গুলি করেছে, আমি নই। কিন্তু, বাবা, তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেয়েটাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে ঈশ্বর। তাই আমাদের দায়িত্ব ওকে আশ্রয় দেয়া।’

‘আহা, বেচারী! আসলেই মনে হয় ঈশ্বর ওকে পাঠিয়েছে। পরিবার-স্বজনদের সবাইকে হারিয়ে একা বেঁচে আছে ও।’

‘ভাবো একবার, তোমরা সবাই মারা পড়লে, আর একা আমি বেঁচে রইলাম। তখন কী অবস্থা হতো আমার। যাক, ওসব নিয়ে কথা বলে কাজ নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। আমি খুব ক্লান্ত। শুতে যাচ্ছি। আর, ডারবানের দিকে ফিরে না গেলে এখান থেকে আমাদের নড়ার খুব একটা সুযোগও নেই।’

ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া নোয়িও শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। একটানা ঘুমিয়ে পরদিন পড়ন্ত বিকেলে ঘুম ভাঙল র্যাচেলের। সূর্য ততক্ষণে দিগন্তে রওনা হয়েছে। নোয়ি তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। ক্যাম্পে এখন ওরা দুজন, র্যাচেলের মা আর ইসমাইলের সেই কালো ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই। ভৃত্যদের নিয়ে নোয়ির মৃত আত্মীয়দের কবর দিতে গেছে মি. ডাভ। নইলে রাত নামতে নামতেই শেয়াল হায়েনারা মৃতদেহগুলো

ছিঁড়ে খাবে।

রাতের খাবার রাঁধতে মাকে সাহায্য করতে বসেছে র্যাচেল। আগুন ধরিয়েছে। ঠিক তখনই ওর কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। মাথা তুলে দেখল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ইসমাইলের ঘোড়া দুটো। একটায় সে নিজে বসা, অপরটার স্যাডল খালি। দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করছে ক্যাম্পের বাসিন্দারা এখনও বেঁচে আছে নাকি কল্যাণ কাটা গেছে ওদের। মাকে বলল যে ইসমাইলের সাথে একা কথা বলবে ও। বলে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল র্যাচেল।

লোকটার সামনে এসে র্যাচেল দেখল, নিজের কাপুরুষোচিত আচরণ নিয়ে খুবই লজ্জিত সে। র্যাচেল বলল, ‘বলেছিলাম না, আমি নিরাপদ থাকব? তা-ই আছি। আপনিও আস্ত আছেন দেখে খুশি হয়েছি।’

লজ্জিত দৃষ্টি নামিয়ে নিল ইসমাইল। বলল, ‘আপনি খুবই অদ্ভুত। যেমন অদ্ভুত তেমন সুন্দর।’

‘অযথা অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না।’

‘আচ্ছা। কিন্তু আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে যে, জুলুরা কি ওই মেয়েটিকে মেরে ফেলে তারপর আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে?’

‘না, জুলুরা ওকে মারতে পারেনি। মেয়েটিকে নিয়ে আমি লুকিয়ে ছিলাম। ও এখন আমাদের ক্যাম্পেই আছে।’

‘ভীষণ বিপজ্জনক একটা কাজ করেছেন। এই মেয়েটির পেছনেই লেগেছে জুলুরা রাজা। যখনই সে শুনবে ওকে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনাদের মারতে লোক পাঠাবে সে। তাই বলছি, সময় থাকতে থাকতেই ওকে সরিয়ে ফেলুন। ওই মেয়ের উপস্থিতি আপনাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক।’

‘হতে পারে। কিন্তু আমি নিজে কখনোই ওকে চলে যেতে

বলব না। বাবাও বলবে না। অবশ্য মেয়েটা যদি নিজ থেকে চলে যায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এখন আমার কথা শুনুন। জুলুদের কানে খবরটা যাওয়া উচিত হবে না। আর যাবেই বা কেন? কুমিরে খেয়েছে লোকটাকে। জুলুরা এখানে এলেও সেই প্রমাণই পাবে। তবে তারপরও যদি সন্দেহ করে, তাহলে ওরা কী ভাববে বলুন দেখি? একটা অবলা নারী কি একজন শক্তিশালী জুলু যোদ্ধাকে মারতে পারে? না, পারে না। তবে অবলা নারীর সাথে যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি ছিল, সে অবশ্যই গুলি করতে পারে। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, মুখ খুলবেন না বন্ধ রাখবেন।’

‘বুঝেছি। আমি মুখ সামলে রাখব, আপনার খাতিরে।’

‘না, মি. ইসমাইল, আমার খাতিরে না আপনার নিজের খাতিরে। আর, আমাকে ফেলে চলে আসার বিষয়েও যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে বলব। অবশ্য “ওভাবে” আপনার চলে যাওয়াটা নিয়ে আমি কিছু মনে করিনি। তবে অন্যরা ঘটনাটা জানলে হয়তো আপনার সম্বন্ধে “অন্যরকম” কিছু ভাবতে পারে,’ বলল র্যাচেল।

‘জানি। লোকে আমাকে কাপুরুষ ভাববে। সকালের আচরণের জন্য আমি আসলেই লজ্জিত। তবে, জুলুদেরকে আমি আপনার চেয়ে ভাল করে চিনি। তাই তখন ভেবেছিলাম, এই বুঝি দল বেঁধে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। তাছাড়া আপনার ওপরও রেগে গিয়েছিলাম আমি। নার্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। আমি খুব দুঃখিত।’

‘না, না, ক্ষমা চাইবেন না। তবে যা হয়েছে, ভুলিই হয়েছে। ওই সময় আপনার সাথে গেলে নির্ঘাত জুলুদের হাতে ধরা পড়তাম। ওই যে, বাবা আসছে। মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু রাজি হয়েছি যে, মেয়েটার ব্যাপারে আমি বা আপনি জুলুদের বা আর কারো কাছে মুখ খুলব না। ঠিক আছে?’

‘আচ্ছা।’

ঘোড়া থেকে নেমে র‍্যাচেলের সাথে বোমার“দিকে এগিয়ে গেল ইসমাইল। বিমর্ষ বদনে দাঁড়িয়ে আছে মি. ডাভ। খুব সম্ভব, এতগুলো মৃতদেহ সমাহিত করার ফল। ওরা কাছে গেলে পরে গুড ইভনিং বলে ইসমাইলকে স্বাগত জানাল মি. ডাভ। এবং বলল, ‘এত কিছু ঘটে গেল অথচ এত কাছে থেকেও আমি কিছুই টের পেলাম না। তবে আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের খবর জানিয়ে সাবধান করতে এসেছিলেন আপনি। বেচারিদের যতটুকু পেয়েছি একটা ক্লিফের নীচে সমাহিত করেছি। আমরা যাওয়ার আগেই শকুন চলে এসেছিল। বোঝেনই তো...’

‘স্যর, আপনার মেয়েকে আমি বাঁচাইনি। কারণ, ওই কাফ্রি মেয়েটাকে সে ছাড়ছিল না।’

‘মানে? বলতে চাইছেন আপনি ওই অসহায় মেয়েটাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে চলে গিয়েছিলেন? তাহলে তো স্বয়ং ঈশ্বরই বাঁচিয়েছেন ওদের। যা হোক, ক্যাম্পে চলুন। আমাদের সাথে সাপারে বসবেন। আমি কিন্তু আপনার বাকি নামটুকু এখনও জানি না...’

‘আমার নাম ইসমাইল। ব্যস, আর কিছু জানার দরকার নেই। দেখুন, এই দেশটা খুব রুক্ষ। যারা এখানে আসে তারাও সাধারণত রুক্ষই হয়। নয়তো হয় কোন অঘটনের শিকার। হয়তো আমার সাথেও তেমন কিছুই হয়েছে। তাই চলে এসেছি তথাকথিত সভ্যতার আওতার বাইরে। এমনও হতে পারে, অন্য কারো নাম আঁকড়ে ধরে চলছি আমি। কাজেই আগে কে বা কী ছিলাম সেটা এখন আর জরুরি বিষয় নয়। এখন আমি যেমন সেভাবেই আমাকে দেখবেন আশা করি। আমি এখন স্রেফ একজন শিকারী। জুলুদের সাথে ব্যবসা করে পেট চালাই।

আমার খ্রিস্টান নাম যা-ই হোক, এখানে আমি ইসমাইল। কাফ্রিদের কাছে আমি ইবুবেসি। এরপরও যদি আপনার অন্য নাম দরকার হয়, ধরে নিন আমি কোন এক স্থিথ বা জন।’

মুচকি একটু হাসল মি. ডাভ। আফ্রিকায় এ ধরনের আরো কিছু লোকের দেখা সে পেয়েছে। তাই বলল, ‘নামে কী আসে যায়? ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, মি. ইসমাইল।’ মুখে ওই কথা বললেও মনে মনে মি. ডাভ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যে করেই হোক, এই লোকটিকে আবার খ্রিস্টান বানাতে হবে। দেখাতে হবে সত্যের আলো ও শান্তির পথ।

অনাড়ম্বর আয়োজনের সংক্ষিপ্ত সাপার। তাই খাওয়া শেষ হতেও বেশি সময় লাগল না। খাওয়া শেষ হবার পর মি. ডাভের ওয়াগনে চড়ে বসল ইসমাইল। পাইপ ধরিয়ে সুখটান দিল তাতে। ইসমাইলকে দেখতে দেখতে র্যাচেল ভাবল, লোকটা হয়তো আসলেই কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ। তার আচরণ আর কথাতেও তার ছাপ ফুটে ওঠে। যদিও কথাবার্তায় প্রায়ই জুলু শব্দ ব্যবহার করছে সে। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক না। কারণ বছরের পর বছর ধরে জুলুদের সাথে মিশেছে সে। হয়তো ওই ভাষাতে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটা।

মি. ডাভের কাছে জুলুদের সামাজিক আর গোষ্ঠীগত মর্যাদার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছে ইসমাইল। ওদের অতি আত্মমর্যাদা বোধের কারণে বংশের পর বংশ, গোষ্ঠির পর গোষ্ঠি নিজেরা নিজেরা লড়াই করে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। অথচ অত্যন্ত কঠোর ও কুটিল আইনের শাসন মেনে চলতে বাধ্য জুলুদের পক্ষে এ নিয়ে ভাবারও কোন সুযোগই নেই। অমনই কোমি একটা ঘটনার কারণে নোয়ির পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে মি. ডাভকে জানাল ইসমাইল।

ডারবানে অনেক দিন ধরেই আছে মি. ডাভ। তাই সে-ও

জানে, অসভ্যদের মধ্যে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক না। যদিও অমন কিছুর সাক্ষী তাকে কখনো হতে হয়নি। তাই এসবের ভয়াবহ বীভৎসতা এখনও তার চোখে সেভাবে ধরা পড়েনি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, ‘মনে হচ্ছে যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও অনেক কঠিন হবে আমার কাজ।’

‘কী কাজ?’ কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইসমাইল।

‘জুলুদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা। এই জন্যেই রাজার ক্রালের দিকে রওনা হয়েছি আমি,’ জবাব দিল প্যাস্টর।

কিছু বলার আগে পাইপ ঠুকে পোড়া তামাক ফেলে দিল ইসমাইল। তারপর নতুন করে আবার তামাক ভরল ওটায়। কী বলবে বুঝে পাচ্ছে না ইসমাইল। কিন্তু যখন মুখ খুলল, কঠিন কিছু কথা বের হলো ওর মুখ থেকে। বলল, ‘তার চেয়ে জাহান্নামের পথে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ওটা বরং অনেক সোজা। মানে, মাফু করবেন, বোঝাতে চেয়েছি জান্নাতের কথা। কিন্তু ভাবছি, দেখে তো মনে হয় না আপনি নির্দয় মানুষ। স্ত্রী-কন্যার জানের পরোয়া করেন না নাকি?’

‘অবশ্যই করি,’ শীতল কণ্ঠে বলল মি. ডাভ।

‘তাহলে, আপনার চোখের সামনে তাদের গলা কাটা যাক, তা নিশ্চয়ই চান না?’ এক মুহূর্ত থেমে র‍্যাচেলের দিকে একবার তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে বলল, ‘বা আরো খারাপ কিছু?’

‘অর্থহীন প্রশ্ন। আমি খুব ভাল করেই জানি, জংলীদের মাঝে গেলে বিপদের ঝুঁকি থাকবেই। কিন্তু সেই জন্যেই তো পিছপা হওয়া যায় না। নিরাপত্তার জন্য আমি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।’

জুলুতে শুরু করেও আবার ইংরেজিতে ফিরে গেল ইসমাইল। বলল, ‘বিকেলে যাদের কবরে শুইয়ে এলেন সেই সেয়াপি আর তার লোকজনের কথা বলছি। ওরাও ঈশ্বরের

আশ্রয় নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। এখন কেবল ওই নোয়ি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন আপনি। জুলুল্যাণ্ডে পা রাখলে, কেবল ওকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধেই আপনাদের সবাইকে কবরে পাঠাবে ডিনগান বা জীবন্ত অবস্থায় শকুন দিয়েও খাওয়াতে পারে। ভাববেন না যে, “উমফুনদুসি” হয়েছেন, মানে ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় শিক্ষক হয়েছেন বলে রেহাই পেয়ে যাবেন। ঈশ্বর অবশ্যই সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি নিজে নিশ্চয়ই নীচে এসে আপনাকে বাঁচাতে যাবেন না? আরেকটা ব্যাপার, আপনার ভৃত্যদের যতই বিশ্বাস করেন না কেন, বাস্তবতা ওরাও জানে। তাই এক রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করবেন, গায়েব হয়ে গেছে ওরা। তখন এই ওয়াগনগুলো আপনাকেই চালিয়ে নিতে হবে। অ্যাসেগাইকে কোন বাইবেলই, বদলাতে পারবে না।’

‘অনুগ্রহ করে এমন কিছু বলবেন না যা ধর্মদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, সম্ভবত আপনি বুঝতে পারছেন না যে, একটা মিশন নিয়ে বের হয়েছি আমি। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মিশন। তাতে মৃত্যু এলে সেটা হবে শহীদের মৃত্যু...’ বিরক্তভাবে কথাগুলো বললেও মি. ডাভের কণ্ঠের নার্ভাসভাব চাপা রইল না।

‘বুঝেছি, আপনার মাথায় শহীদ হওয়ার ভূত চেপেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু দেখতে চান আপনি?’

‘না, কখনোই না!’

‘তাহলে বলব, টেগুলা নদী পার হবেন না। ডারবান ফিরে যান। তা না হলে অন্তত আর আগে বাড়বেন না, এখানেই থাকুন। সাধারণত টেগুলার এপাড়ে একে সাদাদের ব্যাপারে ডিনগান নাক গলায় না,’ বলল ইসমাইল।

‘কিন্তু তার অর্থ হবে আমার এতদিনের লালিত স্বপ্নের

চাড়াগাছটা উপড়ে ফেলা। যাক, ওসব আপনি বুঝবেন না, তাই আপনাকে ওসব বলে বিরক্ত করব না,’ বলল মি. ডাভ।

‘আসলেই হয়তো আমি বুঝব না।’ কারণ, নিজের গলাটা মুচড়ে ছিঁড়ে নেয়া হচ্ছে, এটা কল্পনা করা আমার কাছে কোন আনন্দের ব্যাপার নয়। আমি আসলে বলতে চাইছি, জুলুল্যাও যেতে চাইলে আপনি অবশ্যই যাবেন। তবে একা যাবেন। কারণ, জুলুল্যাও কোন শ্বেতাঙ্গ নারীর জন্যই উপযুক্ত স্থান নয়।’

জবাবে মি. ডাভ বলল, ‘এই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ওদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এতে ঈশ্বরের ওপর ওদের ভক্তি-ভরসা কতটুকু তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে,’ বলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস ডাভের দিকে।

তবে এই একটিবার স্বামীকে নিরাশ করল মিসেস ডাভ। বলল, ‘আমার মত যদি চাও তো বলব, এই ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছে। নিজেকে নিয়ে আমার পরোয়া নেই। কিন্তু তারপরও বলতেই হয়, ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রাণটা যেনতেনভাবে ছুঁড়ে ফেলাও কোন কাজের কথা নয়। সবসময়ই আমি তোমার কথা শুনে এসেছি, যেখানেই’ গেছ, অন্ধভাবে অনুসরণ করেছি তোমাকে। অথচ ঘরে না হলেও সভ্য কোন শহরে আমরা নিরাপদ জীবন কাটাতে পারতাম। আর এখন র্যাচেল আছে আমাদের সাথে। ওর নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আমাদের। তাই আমি বলব, জুলুল্যাও আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।’

মাঝখানে ফোড়ন কাটল র্যাচেল, ‘আমাকে নিয়ে ভাবো না, মা। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি আমি। যেমনটা আজকেও করেছি, নিরাপদে বেঁচেও ফিরেছি।’

‘কিন্তু তারপরও তোমাকে নিয়ে আমার ভাবতে হয়। যদিও অনেকবারই বলেছি, আমার বিশ্বাস কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তারপরও তোমাকে নিয়ে আমার ভাবতেই

হয়। জন,' পরের কথাগুলো করুণ কণ্ঠে বলল মিসেস ডাভ, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমারও বয়স বাড়ছে? মানছি স্বর্গের প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে। কিন্তু দায়িত্ব কি শুধুই স্বর্গের প্রতি? আমাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব নেই? আমাদের জন্য তোমার দায়িত্ব আছে বলে যদি মনে করো, তাহলে অন্তত এখানেই থামো। এখানেই বাড়ি বানাও, মরার আগের কটা দিন অন্তত শান্তিতে কাটাতে দাও আমাদের। মন বলছে আমাদের মৃত্যু আসন্ন। এবং সেটা ভয়াবহ রূপ নিয়েই আসবে, আমি নিশ্চিত,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল র্যাচেলের মা।

'আহা, হা, বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছ তুমি। র্যাচেলকে নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ তুমি। আমার মনে হয় ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাও বিছানায় ওঠো। র্যাচেল, তুমিও শুয়ে পড়ো গিয়ে। এই ভদ্রলোকের সাথে আরো খানিক কথা বলব আমি। মনে হচ্ছে আমাকে গাইড করতেই পাঠানো হয়েছে একে। আর আমাকে তোমরা যতটা যুক্তিবর্জিত উন্মাদ মনে করো, আসলে ততটা পাগল এখনও হইনি। এই ভদ্রলোক যদি আমাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারে তাহলে টুগেলা নদীর ওপাড়ে যাব না। এখনি যদি জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কয়েক বছরের জন্য হলেও এখানে অফিস খুলব,' বলল মি. ডাভ।

চলে গেল র্যাচেল আর ওর মা। ওরা শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তারপরও আরো ঘণ্টা দুয়েক বাবা আর মি. ইসমাইলের কথোপকথন শুনতে পেল র্যাচেল। তবে ওরা কী সিদ্ধান্তে পৌঁছল তা শুনতে পায়নি ও। ঘুম ঘুম চোখে র্যাচেল ভাবছে, টেগুলার কোন্ পাড়ে থাকা হলো তা নিয়ে ওর বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু যেহেতু ওর মা চায় এপাড়ে থাকতে তাই সম্ভব হলে এখানেই বসতি গড়বে ওরা।

পরদিন সকাল। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে র্যাচেল দেখল, ওর তাঁবুর ভেতর এক কোণে বসে আছে নোয়ি। হাতের তালুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে ও। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে র্যাচেলের দিকে। প্রথমে র্যাচেল ভাবল মেয়েটা ঘুমের ঘোরে আছে কিনা। একই সাথে এই প্রথমবারের মতো বুঝতে পারল, আসলেই কতটা সুন্দর এই নোয়ি। অন্যান্য কাফ্রি মেয়েদের তুলনায় খানিকটা খাটো সে। কিন্তু সেটা পুষিয়ে গেছে সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অত্যন্ত সুন্দর শারীরিক গঠনের মধ্য দিয়ে। ওর লম্বা কালো চুলগুলো প্রাকৃতিকভাবেই কৌকড়ানো। গায়ের রঙ এতই হালকা যে, শ্বেতাঙ্গদের সাথেই তুলনা করা চলে। চোখের মণির রঙ বাদামী, টানা চোখ। আর সেই চোখে যেন হরিণের চপল দৃষ্টি। নেটিভদের তুলনায় ভীষণ সুন্দরী এই মেয়ে। র্যাচেলের দেখা কোন বাণ্টুর সাথেই ওর মিল নেই। তবে বাবার সাথে যথেষ্ট মিল আছে নোয়ির। ওই লোকটিও ছিল জুলুদের চেয়ে খাটো। তারপরও দুজন জুলু সৈন্য মেরে তারপর মরেছে সে। তারমানে যথেষ্ট সাহসী ছিল সে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, লোকটার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখেনি র্যাচেল।

পর্যবেক্ষণ শেষ হলে মৃদু স্বরে নাম ধরে নোয়িকে ডাকল র্যাচেল। সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠল সে। এসে বসল র্যাচেলের পাশে। বলল, ‘এই তো আমি এখানে, ইনকোসাজানা।’

‘দাড়িওয়ালা সাদা লোকটা ঘুমিয়ে আছে?’

‘না, চলে গেছে সে। তারও আগেই রওনা গেছে তার ভৃত্যটি। সূর্য ওঠারও অনেক আগের ঘটনা এটা। যেন ওরা ভয় পাচ্ছিল যে, বর্শা হাতে জুলুরা বুঝি ওদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে,’ শেষ কথাটা খানিক উপহাসের স্বরে বলল নোয়ি।

‘ওই লোকটার ব্যাপারে কিছু জানো, নোয়ি?’

‘হ্যাঁ, লেডি, জানি। জুলুল্যাণ্ডে ওকে দেখেছি আমি। খারাপ

লোক ও। জুলুরা ওকে সিংহ বলে ডাকে। কেন জানেন? কারণ ভীতু সিংহের মতো রাতের বেলা গোপনে শিকার করতে বের হয় সে। কাপুরুষের মতো সবসময় পেছন থেকে আঘাত করে। তাই উপহাস করে তাকে এই নামটা দিয়েছে জুলুরা।’

‘আমিও তা-ই ভেবেছি,’ বলল র্যাচেল। ‘গত সকালেই দেখেছি, মোটেও সাহসী নয় সে। যাক, সিংহের চামড়া পরা শেয়ালের কথা বাদ দাও। তোমার গল্প শোনাও, নোয়ি। তবে খুব নিচু গলায় বলবে। কারণ তাঁবুর দেয়াল খুব পাতলা।’

‘আমি আধা জুলু, লেডি। গতকাল মাঠে বসে থাকতে দেখেছেন আমার বাবাকে। ভূতের দেশে চলে গেছে সে। তার নাম ছিল সেয়্যাপি। সে জুলু নয়। তার গোত্রের বাস এখান থেকে অনেক অনেক দূর উত্তরের এক এলাকায়। ওই গোত্রের লোকসংখ্যা খুবই কম, কিন্তু খুবই জ্ঞানী ও শক্তিশালী তারা। তারা গাছের নীচে বাস করে, গাছকেই পূজা করে। গাছের সাথেই বাঁধা থাকে তাদের আত্মা। তাই তাদের কারো গাছ মারা গেলে মারা যায় সেই লোকটিও। তারা স্বপ্নে নানা দৃশ্য দেখে ভূত-ভবিষ্যতের অনেক কিছু জানতে পারে। তাদের সঙ্গীও ভূত। সে কারণে ওই জাতির অনেক নামের একটা হচ্ছে “ভূত জাতি”। ওদের সামনে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সবাই, কাঁপতে থাকে ভয়ে। এই জাতির লোকেরা সূর্যের আলো খুব অপছন্দ করে। তারা বাস করে বনের গভীরতম অংশে। ওদেরকে আমিও কখনো দেখিনি। তবে ওদের কথা শুনেছি। আমাকে ওদের কথা শুনিয়েছে আমার বাবা। আরো অনেক কিছুই বাবা বলেছে, কিন্তু সেগুলো বলা যাচ্ছে না। তরুণ বয়সে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল আমার বাবা।’

‘পালিয়েছিল! কেন?’

‘সঠিক জানি না, লেডি। সম্ভবত বাবা ছিল তাদের একজন

পুরোহিত বা পুরোহিত হবার কথা ছিল তার। কিন্তু এক দাসীকে
 দেখে তাকে পছন্দ করে ফেলে বাবা। সম্ভবত সেই দাসী ছিল
 আমার মা। পরে হয়তো তাকে নিয়ে বাবা পালিয়ে এসেছিল।
 এবং তারও পরে জুলুদের দেশে এসে বসবাস শুরু করে তারা।
 জুলু রাজা চাকার আমলে রাজার মদদপুষ্ট মহান এক ওঝা ছিল
 আমার বাবা। কিন্তু জুলুল্যাণ্ডে সাধারণত যেমনটা দেখা যায়,
 অর্থাৎ “গন্ধ শুঁকে ডাইনি খুঁজে বের করা জাদুকর”, “মৃত্যু
 আনয়নকারী ওঝা” বা এ ধরনের কিছু সে ছিল না। বাবা তার
 জাতির লোকদের মতোই রক্তপাত ঘৃণা করত। বাবা ছিল
 সত্যিকারের ওষুধের জাদুকর, জ্ঞানের রাজা, নিখুঁত স্বপ্ন
 ব্যাখ্যাকারী। বাবার পরামর্শেই বিরাট রাজা হয়ে ওঠে চাকা।
 কিন্তু চাকার ক্রুরতা, কুটিলতা দেখে তাকে পরামর্শ দেয়া থামিয়ে
 দেয় বাবা। তার কয়েকদিনের মধ্যেই চাকা মারা পড়ে। চাকার
 পরে জুলুল্যাণ্ড শাসন করছে ডিনগান। কিন্তু ডিনগানও বাবাকে
 ভয় করত। তাই অনেক দিন আমরা নিরাপদেই ছিলাম। আমার
 মায়ের পরেও জুলু রেওয়াজ অনুসারে আরো তিনটা বিয়ে
 করেছিল বাবা। এমন নয় যে, বাবা তাদের খুব বেশি
 ভালবাসত। আসলে বাবা চেয়েছিল তাকে যেন জুলুদের চেয়ে
 আলাদা চোখে দেখা না হয়। আমার বাবা আর আমি দুজনেই
 জানতাম, একদিন না একদিন রাজার বদ-নজরে আমাদের
 পড়তেই হবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। বাবা আর আমি
 দুজনেই চেয়েছিলাম জুলুল্যাণ্ড ছেড়ে পালাতে। কিন্তু কোঁদার অন্য
 স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের কারণে তা সম্ভব ছিল না। যা হোক,
 জুলু রেওয়াজ অনুযায়ী সবাইকেই বছরে একদিন রাজার সামনে
 উপস্থিত হতে হয়। তেমন একদিনে আমাদের মতো আমরাও
 গিয়েছিলাম রাজার সামনে। তখনই অঘটন ঘটে। আপনি
 দেখেছেন, জুলু নারীদের চেয়ে আমার গায়ের রঙ অনেকটাই

ফর্সা। এই উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের কারণেই রাজার নজর পড়ে আমার ওপর। আমাকে তার বউ বানাতে চায়। রাজার স্ত্রী আর ইন্দুনাদের (ইন্দুনা মানে মন্ত্রণাদাতা) ধন্যবাদ যে, তারা তখন বলেছিল আমি অনেক গোপন জ্ঞানের অধিকারী। কখন কী থেকে কী করে বসি কেউ বলতে পারবে না। রাজাকে মেরেও ফেলতে পারি। তখন সর্বময় শাসন ক্ষমতা চলে আসবে আমার হাতে। আর রাজার স্ত্রীরা বলেছিল যে, আমাকে তার ঘরে নেয়া ঠিক হবে না, কারণ আমি নানা রকম ওষুধ আর বিষ সম্বন্ধে জানি। তাই রাজাকে যদি বিষ খাওয়াই তখন তারা সব হারাবে। তাই আমাকে রাজার ক্রালে না নেয়াই সর্বোত্তম। বাধ্য হয়ে তাতে সম্মত হলো রাজা। কিন্তু তারপর থেকে শয়নে স্বপনে সে কেবল আমাকেই ভাবতে লাগল। এক পর্যায়ে বাবার কাছ থেকে উপহার হিসেবে আমাকে চেয়ে বসল সে। অথচ কোন বন্ধনের নিশ্চয়তা দিল না। বাবাকে অনুরোধ করলাম যে, আমাকে যেন সে রাজার হাতে তুলে না দেয়। কারণ ডিনগানকে ঘৃণা করি আমি। বাবাকে আরো বললাম, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি রাজার কাছে আমাকে পাঠানো হয় তাহলে রাজার ওপর বিষ প্রয়োগ করব আমি। কাজেই রাজার আবদার ফিরিয়ে দিল আমার বাবা। ভীষণ খেপে গেল ডিনগান। নিজের অনুগত গুণিনদের পরামর্শ চাইল সে। কিন্তু তারা রাজাকে কোন কু-পরামর্শ দিল না। কারণ সত্যি বলতে বাবাকে তারাও ভয় পেরেছে। তখন দৃশ্যপটে এল ওই সাদা লোক, যাকে জুলুরা উপহাস করে বলে সিংহ, আর আপনারা বলেন ইসমাইল। রাজার ক্রাল উমগুনগুনলোভু-তে তার অবাধ যাতায়াত। তার কাছেই পরামর্শ চাইল রাজা।

এ কথা শুনে র্যাচেল বলল, ‘ও, এবার বুঝেছি, কেন তোমার মৃত্যু চাইছিল ইসমাইল!’

‘সাদা লোকটির উপযুক্ত নাম দিয়েছেন, লেডি, “সিংহের চামড়া পরা শেয়াল”। যা হোক, রাজার সমস্যা ঠুনে হেসে উঠল সে। রাজাকে বলল যে, সেয়্যাপিকে আপনি ভয় পেতেই পারেন, কারণ জাদু জানে সে। কিন্তু মেয়েটা তো আর জাদু জানে না। তাহলে আপনার সমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে মেয়েটাকে ছাড়া ওর পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা। তাহলেই তো ওই মেয়েটা আপনার হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওকে নিয়ে সুখী হতে আর আপনাকে বাধা দেবে কে?’

‘এই পরামর্শে রাজা খুব খুশি হলো। এতই খুশি যে, অনেকগুলো আইভরি দিয়ে দিল তাকে। আর দিল ইসমাইলের কাক্ষিত এক মহিলাকে।

‘এদিকে বাবা আর আমি দুজনেই ভিন্ন দুটো স্বপ্নের মাধ্যমে এসব অঘটনের ইস্তিত পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রাজার লোকেরা আমাদের দুয়ার পর্যন্ত চলে আসার আগে আমরা পালাইনি। কারণ বাবা তার জুলু স্ত্রী আর সন্তানদের ত্যাগ করতে পারত না। আমিও আমার ভাই-বোন আর মা’দের ছেড়ে আসতে পারতাম না। তবে শেষ পর্যন্ত সবাইকে চিরতরে যেতেই হলো। আমার সব মা আর সব ভাই-বোনদের। মাঠে বাবাকেও আপনি বসে থাকতে দেখেছেন। সাদা মৃত্যু হয়েছে তার।’

‘সাদা মৃত্যু?’

‘হ্যাঁ, লেডি, সাদা মৃত্যু। কিন্তু তার আগে, জুলুল্যাও থেকে আমরা পালাতে পারি। সরার আগে পালিয়েছি আমি। নদীর এপাড়ে চলে এসেছিলাম। ভেবেছি এপাড়ে এলে সাদা লোকদের কাছে অন্তত আশ্রয় পাওয়া যাবে। সে কারণেই আমার বাবা, মা ভাইদের সাথে আমি একত্রে ছিলাম না। তারপর দেখা হলো আপনার সাথে। বাকিটা তো নিজেই দেখেছেন। আরেকটা ব্যাপার, আমার মনে কোন সন্দেহই নেই যে, আপনাকে এদিকে

আসতে দেখেছে ইসমাইল। ও ভেবেছে, রাজার লোকেরা পথে আপনাকে পেলে ছেড়ে কথা কইবে না। সম্ভবত সে কারণেই আপনাকে আনতে গিয়েছিল সে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমার গল্প।’

র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘বাবার মৃতদেহের সামনে বসে তখন কী সংবাদ পেলে তুমি?’ এই ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে আছে র্যাচেল।

নোয়ির চেহারায় নির্বিকার একটা ভাব ফুটে উঠল। ও শুধু বলল, ‘আমি তো আগেই বলেছি, ইনকোসাজানা-ই-জুলা, যে ওই কথা কেবল আমার জন্য। আর কাউকে তা বলতে পারব না আমি। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার ভাগ্য আর আমার ভাগ্য পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। আপনার, আমার আর আরেকজনের। জেনে রাখুন, লেডি, অতীত জীবনে আপনার আর আমার আত্মা ছিল বোন।’

অনেক দিন ধরে নেটিভদের সাথে মেলামেশার ফলে ওদের এই সব রহস্যময়তা সম্বন্ধে র্যাচেলের খানিকটা জানাশোনা আছে। কখনো কখনো এসব গল্প খুবই অদ্ভুতভাবে বাস্তব রূপ নেয়। তবে র্যাচেল জানে বেশিরভাগ সময়ই এসব কথাবার্তা স্রেফ আষাড়ে গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

যা হোক, র্যাচেল বলল, ‘আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, নোয়ি, যদিও জানি না কেন। সম্ভবত তুমি এত দুর্ভাগ্য সহ্য করেছ সেজন্য। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সত্যিই যদি আমাকে বোনের মতো ভালবাসো তাহলে আপাতত আমার কাছ থেকে সরে থাকো। কারণ তোমার গল্প অনুযায়ী ওই শেয়ালটা তোমার অতীত-বর্তমান, দুই গল্পই জানে। যে কোন সময় তোমার ওপর অ্যাসেগাইয়ের ফলা নামিয়ে আনবে ও।’

‘ঠিকই বলেছেন, লেডি। ঝড় আসছে। তবে সত্যি কথা

হচ্ছে, আমি যেখানেই যাই না কেন, তাতে ঝড় থেমে থাকবে না। কাজেই এবার আপনিই বলুন, লেডি, আমি থাকব না চলো যাব, নাকি এখানেই আপনার সামনে জান দিয়ে দেব?’

‘যা-ই করো, জীবনটা তোমার। ঝুঁকি নাও আর যা-ই নাও...’

‘না, না, লেডি, ভুলে যাচ্ছেন, আপনার আর আমার ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা। অর্থাৎ আমি এখানে থাকার মানে আপনার পরিবারের ওপর গজব ডেকে আনা। এরপরও কি আমার জন্য আপনার কোন হুকুম নেই?’

‘একটা জবাব তো আমি দিয়েছি, নোয়ি। এখন সিদ্ধান্ত তোমার।’

‘না, আমি সিদ্ধান্ত নেব না। না, সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের হাতেই থাকুক। লেডি, আপনার মাথার একটা চুল দিন আমায়।’

মাথা থেকে একটা সোনালী চুল তুলে নোয়ির হাতে দিল র্যাচেল। নোয়িও নিজের মাথা থেকে একটা চুল তুলে নিল। পাশাপাশি দুটো চুল মাটিতে রেখে বলল, ‘দেখেছেন, দুটো চুলই এক সমান। এখন বাতাস বইছে না। তবুও চুল দুটোকে এক সাথে উড়িয়ে দেব। তারপর যদি কালো চুলটা আগে মাটি ছোঁয় তাহলে এখানেই থাকব আমি। আর যদি সোনালীটা আগে মাটিতে পড়ে তাহলে চলে যাব। ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে।’

উঠে দাঁড়িয়ে চুল দুটো দ্রুত হাতে ওপরে ছুঁড়ল নোয়ি। আর ঠিক তখনই কোথেকে যেন উদয় হলো বাতাসের ছোট্ট একটা ঘূর্ণাবর্ত। সেই হাওয়ায় চড়ে চুল দুটো প্রায় খাড়া হয়ে ওপরে উঠতে থাকল। চল্লিশ ফুট মতো ওপরে উঠে গেল দুটো চুলই। তারপরই বাতাস পড়ে গেল। নামতে শুরু করল চুল দুটো। ঠিক তখনই আবার আরেকটা বায়ুস্রোত র্যাচেলের মাথার সোনালী

চুলটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল আরো ওপরে। অপর দিকে বাতাস না পেয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল নোয়ির মাথার কালো চুল।

নোয়ি বলল, ‘দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর চান, এখানেই থাকি আমি!’

‘তুমি থাকলে আমিও খুশি হব,’ বলছে র্যাচেল। ‘এখন কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটেই যায় তবুও বলতে পারব দোষ আমাদের নয়, দোষ ছিল বাতাসের!’

‘বাতাসের, লেডি? কিন্তু বলতে পারেন বাতাস বানায় কে?’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিতে ওর অপারগতার কথা জানাল। এবং প্রশ্ন করল, ‘আমার চুলটা কোথায় গেল বলতে পারবে, নোয়ি?’

‘জানি না, লেডি। হয়তো আমার বাবার আত্মা ওটাকে তার গন্তব্যে নিয়ে গেছে। অবশ্য এটা স্রেফ আমার ধারণা। মনে হলো বাতাসের টানে যেন উত্তর দিকে গেল চুলটা। দেখলেন না, আমারটা যখন পড়তে শুরু করল, তখন মনে হলো থাবা দিয়ে আপনার চুলটাকে ছিনিয়ে নিল কেউ। অথচ দুটোই একসাথে উড়ছিল। আমার মনে হয়, একদিন ওই চুলের মতো আপনিও আপনার গন্তব্যে পৌঁছুবেন। পৌঁছে যাবেন সেই বিচিত্র দেশে যেখানে নৈঃশব্দের মাঝে আঁধারের কানে ফিসফিসিয়ে গোপন কথা বলে যায় বিশাল সুব মহীরুহ।’

BanglaBook.org

সাত

সুতরাং ডাভ পরিবারের সদস্য হয়ে গেল নোয়ি। পালটে ফেলল নামটাও। নোয়ি থেকে হয়ে গেল নোনহা। মি. ডাভও জুলুল্যাণ্ডে ঢোকান পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে। তার বদলে এখানে, এই সুন্দর জায়গাটায় বসতি গড়েছে সে। জায়গাটার নাম দিয়েছে রামাহ, অর্থাৎ কান্নার জায়গা। কারণ ওদের বসতির পাশেই জুলুদের অ্যাসেগাইয়ে খুন হয়ে গেছে নোয়ির পরিবারের সবাই।

রামাহ নামটা মিসেস ডাভের মোটেও পছন্দ হয়নি। তবে বরাবরের মতোই স্বামীর মতের বিরোধিতা করল না সে। তবে এটা বলতে ভুলল না যে, ‘আমি নিশ্চিত, সব শেষ হওয়ার আগে এখানে আরো অনেক অশ্রু ঝরবে।’

যা হোক কাঠ আর পাথর দিয়ে চমৎকার এক বাড়ি গড়ল মি. ডাভ। কোথা থেকে যেন ভাগ্যান্বেষী এক পাথরের মিস্ত্রীকে ধরে আনল সে। সেই সাথে নিয়ে এল দুজন কাঠ মিস্ত্রী। আর তার নিজের কালো ভৃত্যরা তো আছেই। আশপাশে কাঠ বা পাথর কোনটারই অভাব নেই। সুতরাং ওই মিস্ত্রী আর নিজের ভৃত্যদের নিয়েই বাড়ির কাজে হাত দিল সে।

যে টিলার ওপর তারা প্রথমবার ক্যাম্প করেছিল সেখানেই বানানো হলো তাদের বাড়ি। এবং যেখানে ইসমাইল প্রথমবার উদয় হয়েছিল সেখানে বানানো হলো চার্চ। দুই মিলিয়ে এক

বছরের বেশি লেগে গেল। তবে কাজ যখন শেষ হলো অত্যন্ত গর্বিত বোধ করল প্যাস্টর মি. ডাভ।

ডাভ পরিবার দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রাখার পর থেকে আজ পর্যন্ত লম্বা সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখানকার মতো সুখী আর কখনো হয়নি মি. ডাভ। কারণ, প্রথমত তার পরিবারের মুখে হাসি ফুটেছে। এবং দ্বিতীয়ত ও প্রধানত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বড় একটা পদক্ষেপ নিতে পেরেছে সে। সেটা হচ্ছে চার্চ প্রতিষ্ঠা।

কিছুদিনের মধ্যেই চার্চ ও তার বাড়ি ঘিরে বসতি গড়ল বেশ কিছু সংখ্যক নেটিভ পরিবার। এদের বেশির ভাগ পরিবারই সাবেক জুলু রাজা চাকার অত্যাচারের জাঁতাকলে ভীষণভাবে পিষ্ট। তবে এখন সাদা মানুষের এলাকায় আশ্রয় নিতে পেরে তারা খুশি। বিশেষভাবে ওরা যখন বুঝতে পেরেছে, এই সাদা পরিবারটির সবাই খুবই সজ্জন প্রকৃতির মানুষ, যারপরনাই খুশি হয়েছে তারা।

তাদেরকে দিনের পর দিন মহা উৎসাহে ডকট্রিন থেকে ভার্শ শোনায় মি. ডাভ। তবে সত্যি বলতে, এসবের কতটুকু তাদের মগজে ঢোকে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে এটুকু “অত্যাচার” নেটিভরা মেনে নিয়েছে। ওরা ধরে নিয়েছে, এটা এই সাদা লোকের ছায়ায় থাকার মূল্য। তবে মি. ডাভ যখন ওদের বোঝাতে গেল যে একজন রেখে বাকি সব স্ত্রী তাদের ত্যাগ করা উচিত, সাফ মানা করে দিল কালোরা। রেগে গিয়ে ওদেরকে এই এলাকা থেকে চলে যেতে বলল মি. ডাভ। কিন্তু কালোরা এর প্রতিবাদ করল। বলল তার মতো ওদেরও এই ভ্যালিতে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। তারা বলল, ‘আমাদেরকে আপনার পবিত্র বই থেকে পড়ে শোনান, ও, চিৎকারকারী, আমরা শুনব। হয়তো বছর খানেকের মধ্যে আপনার মতো করে চিন্তা করতে শিখেও

যাব। তবে তার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ দিন।’

বাধ্য হয়ে ওদের কথা মেনে নিল প্যাস্টর। আশায় রইল যে, একদিন হয়ত ওদের কঠোর হৃদয় নরম হবে। খ্রিস্টধর্মের ঐশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত হবে তারা। সুতরাং ওদেরকে উপদেশ দেয়া চালিয়ে গেল প্যাস্টর। সেই সাথে ছোট শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও নতুন করে যারা আর স্ত্রী নেবে না, তাদেরকে ব্যাপ্টাইজড করতে লাগল সে।

সত্যি বলতে, সুখেই কাটতে লাগল ভ্যালিবাসীদের দিন। ইতিমধ্যে ট্রাষ্টর আমদানি করেছে প্যাস্টর। কালোদের শিখিয়েছে সেটার ব্যবহার। ফলে ওদেরকে ফল-ফসলে ভরা মৌসুম উপহার দিল ভ্যালির অকর্ষিত উর্বরা জমি। নেটিভদের সামান্য কিছু গবাদি পশু ছিল। সেগুলোও সংখ্যায় ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। একইভাবে বাড়তে থাকল তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা। যেন জুলু অত্যাচার শুরু হবার আগের সেই প্রাচুর্যময় দিন ফিরে পেল তারা। কারণ “ট্যাক্স” হিসেবে কারো কাছ থেকে গবাদি পশু তো দূরের কথা এক মুঠো শস্যও নেয় না “চিৎকারকারী”। তবে জুলুদের অ্যাসেগাইয়ের ভয় ওদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। কারণ অত্যাচারী রাজা চাকা মারা গেলেও জুলুল্যাও শাসন করে তার আপন ভাই ডিনগান। আর, কে না জানে—একই রক্ত একই ঐতিহ্য বহন করে।

এদিকে টেগুলার এই পাড়ে বসতি গড়ে উঠেছে। দিনে দিনে তা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে, আর অদ্ভুত সব জিনিসপত্র আছে এখানে—এই খবর ডিনগানের কানেও পৌঁছেছে। তাই খবরের সত্যতা যাচাই করতে গুপ্তচর পাঠাল সে। গুপ্তচরেরা ফিরে রাজাকে জানাল ওখানে কেবল মাত্র এক ঘর সাদা লোক আছে। লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকে ওখানে। আর বাকিরা

নাটাল থেকে বা অন্যত্র থেকে গিয়ে বসতি গড়া কালো কাফ্রি। এসব খবরের সাথে সাদা লোকের কন্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প নিয়ে ফিরল দূতরা। এসব শুনে প্যাস্টরের কাছে দূত পাঠাল রাজা ডিনগান।

দূত বার্তা নিয়ে এল, “আমি জুলু রাজা ডিনগান। আমি আপনার কথা শুনেছি, ও, চিৎকারকারী। জেনেছি, আমার দেশের সীমানায় নগর পত্তন করেছেন আপনি। আর এর বাসিন্দা হয়েছে রাজা চাকার শিকার করা শেয়ালের সন্তানরা। তবে এই দূত মারফত আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যতদিন পর্যন্ত আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া কাউকে আপনি আশ্রয় না দিচ্ছেন ততদিন আপনার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। এবং অমন কাউকে আপনার আশ্রয়ে না পাওয়া পর্যন্ত আপনার নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি। কিন্তু আমার কাছ থেকে পালানো একজনও যদি আপনার কাছে দেখা যায় তাহলে আমার সৈন্য যাবে আপনার ক্রালে। সবাইকে শেষ করে তবেই সে ফিরবে।

আমি আরো জেনেছি আপনার মেয়ের কথা। শুনেছি সারা দেশই নাকি তাকে জানে ইনকোসাজানা-ই-জুলা নামে। কিন্তু ওই নাম তো আমাদের দেবীর আত্মার! আমাদের ওঝারা বলে সেই দেবীও নাকি শ্বেতাস্বিনী। আমাদের কিছু পুরোহিত বলছে দেবীর মানব রূপ হচ্ছে আপনার কন্যা। কথাটা এখন আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলতে। কিন্তু তারপরও, আপনার মেয়েকে জুলুল্যাণ্ডে আমার ক্রালে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যাতে তাকে দেখে, বুঝে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারি।

আমার পূর্বপুরুষদের আত্মার নামে আপনার ও আপনার মেয়ের কাছে শপথ করে আমি ডিনগান বলছি, জুলুল্যাণ্ডের কেউ

কখনোই তার কোনরকম ক্ষতি করবে না। কেউ আপনার মেয়ের গায়ে একটা আঙুল ছোঁয়ালেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে মরবে সে। তার পবিত্র নামের কল্যাণে সমগ্র জুলুল্যাও তার ঘর। আর জুলুল্যাওর সমস্ত জুলু তার দাস। তার মর্যাদাপূর্ণ উপাধির দৌলতে, যে সীমা পর্যন্ত জুলু শাসন চলে, সে পর্যন্ত সকলের প্রাণ দান ও প্রাণ হরণের অধিকার তাকে আমি দিলাম। আর উপহার হিসেবে আমার রাজকীয় পশুশালা থেকে পাঠলাম বারোটা গাই গরু ও একটি ষাঁড়। সেই সাথে দিলাম আরোহী বহনে প্রশিক্ষিত একটি সাদা ষাঁড়। উনি যখন জুলুল্যাও আসবেন, এই ষাড়ের পিঠে চড়েই যেন আসেন। তাহলে সবাই বুঝতে পারবে কে আসছে। তবে তার সাথে যেন কোন পুরুষ মানুষ না আসে। কারণ জুলুদের দেবীর আত্মা জুলুদের মধ্যেই পরীক্ষিত হবে। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আমার ইচ্ছা, আমার লোকের হাত থেকে স্বয়ং জুলা যেন উপহারগুলো বুঝে নেন। যাতে আমার লোকেরা ফিরে এসে তার কথা আমাদের কাছে বলতে পারে।”

কথাগুলো শুনে ঘরে গিয়ে ঢুকল প্যাস্টর। এসবের মাথামুণ্ড কিছুই যেমন সে বুঝতে পারছে না, তেমন রাজাকে কী জবাব দেবে তা-ও মাথায় খেলছে না।

তখন নোয়ির সাথে পরামর্শ করল র্যাচেল। নোয়ি অবশ্য রাজার সৈন্যদের দেখে আগেই লুকিয়ে পড়েছিল। কারণ রাজার সৈন্যদের বা দূতের চোখে পড়ে গেলে ওর তো বউটাই, ডাভ পরিবারের সবারও কল্লা কাটা পড়বে।

যা হোক, নোয়ি পরামর্শ দিল, ‘জুলু চিন্তাধারা মোতাবেক ক্ষমতা হাতে পেলে তা ধরে রাখতে হয়। তাই রাজার দূতের সাথে কথা বলুন। নরম সুরে তাকে বলবেন কোঁন একদিন জুলুল্যাও যাবেন আপনি।’

কথাগুলো বাবাকে বুঝিয়ে বলল র্যাচেল। তারপর জুলুদের সাথে কথা বলার অনুমতি পেল ও। ঘর থেকে বের হবার আগে গায়ে একটা সাদা শাল জড়িয়ে নিল ও। এটা অবশ্য নোয়ির পরামর্শ মতো করেছে। সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। হাতে নিল হালকা একটা বর্শা। র্যাচেলদের ঘরের উঠানের সামনে একটা বড় পাথরের খানিক দূরে অতিথিদের বসার জায়গা। ওখানেই বসে আছে রাজার দূতেরা। সংখ্যায় তারা ছয় জন। সেই সাথে আছে রাজার উপহার হিসেবে আনা গবাদি পশুগুলো সামলে রাখা রাখালেরা। উঠানে খোলা জায়গায় বসে কথা বলতে বলতে নসি় নিচ্ছে তারা। জুলুদের অজান্তে ওই পাথরটার ওপর উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিল রূপালী চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রূপালী বর্ণ ধারণ করল র্যাচেলের সাদা শাল। চন্দ্রালোকের কল্যাণে ঐন্দ্রজালিক রূপে জুলুদের চোখে ধরা পড়ল র্যাচেল।

র্যাচেল এখন আর সাধারণ কোন মানুষ নয়। রহস্যময়ী এক অতিমানবী সে। ওকে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জুলুরা। এমন আচমকা ওকে “উদয় হতে” দেখে রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই উঠে গেল ওদের বর্শা ধরা ডান হাত। “বায়াতে, বায়াতে” বলে র্যাচেলকে রাজকীয় স্যালুট করল জুলুরা। যা আজকের আগে আর কোন নারীর কপালে কখনো জোটেনি।

জুলু ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণে র্যাচেল বলল, ‘আমি তোমাদের কথা শুনেছি। শুনেছি, আমাকে দেখতে চাও তোমরা। রাজার দূতগণ, খুশি মনে তোমাদের সামনে এসেছি আমি। বলো, কী জানতে চাও?’

তখন দূতদের সারি থেকে বেরিয়ে এল একজন বয়স্ক

লোক। সাজ পোশাক দেখেই বোঝা যায় উচ্চ পদধারী মর্যাদাবান লোক সে। র্যাচেলকে এক মুহূর্ত জরিপ করল তার চোখদুটো। তারপর আবার স্যাঁলুট করে ভদ্র সুরে সে জিজ্ঞেস করল, ‘লেডি, আপনি লেডি বা দেবী যা-ই হোন, আমরা জানতে চাই জুলুদের মহান আত্মার নাম কী করে আপনি অর্জন করেছেন?’

‘আজ থেকে অনেক বছর আগে, এই জায়গা থেকে অনেক অনেক দূরে একবার ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ি আমি। তখন সেই ঝড়ের বজ্রবিদ্যুৎ আমাকে পাশ কাটিয়ে যায়, পাহাড়ী ঢলের পানিও আমাকে ছোঁয়নি। সেই রাতে আমার পাশেই ঘুমিয়েছে দুটো সিংহ। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমার কোন ক্ষতি করেনি তারা। স্বর্গ নির্ধারিত নিয়তি বলেই এসব ঘটেছে। সেই থেকে লোকে এই নামে আমাকে ডাকতে শুরু করে।’

‘গল্পটা আমরাও শুনেছি, বিশ্বাসও করেছি। আমাদের বিশ্বাস স্বর্গ থেকেই আপনার জন্য এই নাম নির্ধারিত হয়েছে। আমি নিজে স্বপ্নে যে পবিত্র আত্মাকে দেখেছি, তিনি দেখতে ছিলেন ঠিক আপনারই মতো,’ বলল বয়স্ক লোকটি।

‘হয়তো তা-ই। কিন্তু আমি একজন সাধারণ নারী, কোন পবিত্র আত্মা নই,’ জবাব দিল র্যাচেল।

‘তারপরও, আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক নারীর ভেতরই বাস করে বিশেষ এক আত্মা। আমাদের বিশ্বাস আপনার মতোই অমন একজন আছেন। এবং তিনি আমাদের মুঠান পবিত্র আত্মার ছায়া। এখন, রাজার কথাগুলো আরও আপনাকে শোনাচ্ছি। যদিও আপনার বাবাকেও রাজার কথাগুলো আমরা জানিয়েছি। আপনার জন্য জুলুল্যাণ্ডের দুয়ার সব সময়ই খোলা। এখানকার সব পশু আপনার, সমস্ত জুলুল্যাণ্ডই আপনার ক্রাল। আর এরা আপনার জন্য আনা বলি। যেহেতু এখন থেকে আপনি

জুলুদের জীবন মৃত্যুর নির্ধারক, তাই এদের থেকে যে কাউকে বলি হিসেবে বেছে নিন। খুশি মনে সে মরবে আর বাকিরা হবে তার মৃত্যুর সাক্ষী।’

‘তোমার বক্তব্য শুনেছি। উপহারগুলোর জন্য রাজাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি। জীবন মৃত্যুর ক্ষমতা রইল আমার হাতে। কিন্তু কোন ভাল মানুষের প্রাণ নিতে চাই না আমি। আমার হয়ে এই কথাগুলো রাজাকে জানিয়ে দিযো।’

‘আপনি যেভাবে বললেন, ঠিক সেভাবেই রাজাকে সব জানাব। কিন্তু, লেডি, রাজা যেমন বলেছিলেন, আমাদের সাথে কি আপনি যাবেন না? নদীর অপর পাড়ে আপনার জন্য এক রেজিমেন্ট সৈন্য অপেক্ষা করছে। তারাই আপনাকে পৌঁছে দেবে রাজার ঘরে। যেভাবে যাবেন, সেভাবেই ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে। আর যা চাইবেন দেয়া হবে তা-ই।’

‘একদিন অবশ্যই যাব আমি। তবে আজই নয়। যাও, নিরাপদে যাও। শান্তির বার্তা নিয়ে দেশে ফিরে যাও, রাজার দূত।’

বলতে বলতেই এক খণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদটাকে। আবার যখন চাঁদের সামনে থেকে মেঘ সরল ততক্ষণে পাথরের ওপর থেকে গায়েব হয়ে গেছে র্যাচেল। ওকে হারিয়ে যেতে দেখে মাদুর গুছিয়ে নিল জুলুরা। দ্রুত পায়ে ফিরে গেল জুলুল্যাণ্ডের দিকে।

ঘরে ফিরে হাসতে হাসতে বাবা-মায়ের কাছে কথোপকথনের কথা খুলে বলল র্যাচেল।

শুনে ওর বাবা মন্তব্য করল, ‘কাজটা ঠিক হলো না। কারণ ওই অশিক্ষিত লোকগুলো বিশ্বাস করে কসে থাকবে আসলেই তুমি মাটির মানুষ নও বরং স্বর্গীয় কেউ একজন।’

‘করুক, তাতে তো কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। জীবন

দেয়া ও নেয়ার ক্ষমতা নিয়ে অবশ্যই ওরা কথা বলবে। মনে হচ্ছে একদিন আমার ভীষণ কাজে লাগবে এই ক্ষমতাটা।' পরে নোয়িকে র্যাচেল জিজ্ঞেস করেছিল, হাত পোড়া লোকটি, যে রাজার মুখ হয়ে কথা বলল সে কে?

জবাবে নোয়ি বলে, 'তার নাম মোপো, মোপো বা উমবোপো। সে-ই ছুরি মেরে হত্যা করেছে রাজা চাকাকে। লোকে বলে জীবিত মানুষদের মধ্যে কেবল এই একজন মানুষই জুলুদের আত্মার দেখা পেয়েছে। তিন তিনবার তাঁর দেখা পেয়েছে সে। অন্তত তেমনটাই বাবা বলে গেছে। সে কারণে তাকেই ডিনগার্ন পাঠিয়েছে, যেন রাজাকে সত্য কথা জানাতে পারে সে।' তারপর মোপো, নাডা, বুলালিয়ো আর কালো-আত্মা চাকার জীবনাবসানের গল্প শোনাল নোয়ি (নাডা দ্য লিলি দ্রষ্টব্য)।

সেদিনই প্রথম জুলুদের দেখেছে র্যাচেল। নাটকীয়ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করাটা সেদিন ওর উপকারেই এসেছে। তবে সত্যি বলতে একটা অঘটন না ঘটলে সময়ের সাথে সাথে এই ঘটনা ভুলে যেত সবাই। তবে সেটা যথা সময়েই বলা হবে।

প্রথম প্রথম র্যাচেল ভেবেছে জুলুদের আত্মা নামটা ওর উপকারেই আসবে। হয়তো আসলেই ওকে মহান "আত্মা" বলে ভেবে নেবে জুলুরা। কিন্তু পরে বুঝেছে এসব হয়েছে ইসমাইলের কারণে। র্যাচেল এমন একটা নাম কেন পাবে তা ইসমাইলের বোধগম্য নয়। তার ওপর ওর সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিপদ মোকাবেলা করার মানসিকতা ইত্যাদিও ওকে ভীষণ প্রভাবিত করেছে। ফলে জুলুদের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে সে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন জুলুদের সাথে অনেকদিন ধরে মেশার ফলে ওদের ওপর ইসমাইলের একটা প্রভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

যার ফলে র্যাচেলের অদ্ভুত নাম শোনার পর ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত চায় ইন্দুনারা। ফলে তাদের চাপে বাধ্য হয়ে তদন্ত করতে লোক পাঠায় রাজা। এবং তদন্তকারী হিসেবে পাঠায় সেই লোককে, যার সম্বন্ধে বলা হয়, কেবল মাত্র সে-ই জীবিতাবস্থায় ও সচেতনভাবে জুলুদের আত্মাকে দেখেছে। তাও একবার নয়, তিন তিনবার। নিঃসন্দেহে রাজাকে সত্য কথাই জানাবে সে।

এদিকে শিকার বা ব্যবসার কাজ না থাকলে প্রায়ই রামাহ-তে আসতে শুরু করেছে ইসমাইল। র্যাচেল স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে লোকটা ওর প্রেমে পড়ে গেছে। চামড়ার ট্রাউজার বাদ দিয়ে ইউরোপিয়ান কেতার পোশাক গায়ে চড়িয়ে আসা শুরু করল ইসমাইল। সেই সাথে পশুর চামড়ার তৈরি ক্যারোস (পশম সমৃদ্ধ চামড়ার ভারী কম্বল সদৃশ বস্তু), শিকার করা পশু ইত্যাদি পাঠাতে শুরু করল। এবং বলে দিত, র্যাচেল নিজেই যেন ওসব বুঝে নেয়। এরপর আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। ওর মা-ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। তার পক্ষে যতভাবে সম্ভব মেয়েকে রক্ষার প্রয়াস চালান সে। কিন্তু মি. ডাভের মোটা মাথায় এর কিছুই ঢোকেনি। সে ভেবে নিয়েছে, ইসমাইল এখানে আসে তার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায়। ইসমাইলও মহা ধুরন্ধর, সে-ও মি. ডাভের সামনে অমনভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করে। মিসেস ডাভ দুয়েকবার চেষ্টা করেছে স্বামীর ভুল ভাঙাতে। কিন্তু এসব শুনতে নারাজ মি. ডাভ। তার কথা একটাই, পাপীকে আলোর পথ দেখানোই তার কাজ। এবং তা-ই সে করবে। কাজেই ইসমাইলের জন্য খোঁলাই থাকল রামাহ-এর দরজা।

প্রথম দিকে র্যাচেল চেষ্টা করত যতভাবে সম্ভব লোকটাকে এড়িয়ে যেতে। নোয়ি আর কাফ্রিদের বলে রাখত ইসমাইলকে রামাহ-এর ত্রিসীমানায় দেখা গেলেই যেন ওকে সতর্ক করা হয়।

সাথে সাথেই পালাত ও । হয় আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকত, নয়তো চলে যেত সাগর পাড়ে । ইসমাইল চলে গেলে তবেই বাড়ি ফিরত । কিন্তু যদি সেটা সম্ভব না হতো তখন নোয়িকে অবশ্যই পাশে রাখত ও । এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই ঘরে চলে যেত । কিন্তু এর ফল হলো খারাপ । নোয়িকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শুরু করল ইসমাইল । অনুমান করে নিল নোয়ির পরিবারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ডিনগানের সাথে তার ষড়যন্ত্রের কথাটা নোয়ি জানে । হয়তো র্যাচেলকে সব কিছু বলেও দিয়েছে ও । র্যাচেলের সাথে যে একদণ্ড একা কথা বলবে, নোয়ির জন্যই তা সে পারে না । সুতরাং ইসমাইল সিদ্ধান্ত নিল, প্রথম সুযোগেই নোয়ির ওপর কঠিন বদলা নেবে ।

কিন্তু বললেই তো হলো না । নোয়িকে ডাভ পরিবারের সবাই খুব পছন্দ করে । নিজেদের একজনের মতো দেখে রাখে ওকে । সুতরাং জুলুদের দ্বারা ওকে উঠিয়ে নেয়া বা মেরে ফেলা সম্ভব না । তাহলে ডাভ পরিবারে ওর গমনাগমনের অবসান হয়ে যাবে । এসব চিন্তা করে মনের রাগ মনেই পুষে রাখল সে । অপেক্ষায় রইল মোক্ষম সুযোগের জন্য ।

ওদিকে র্যাচেলের একটা বদ স্বভাবের কথা জেনে গেছে ইসমাইল । সেটা হচ্ছে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় র্যাচেল । যদিকে মন চায় চলতে থাকে । সুতরাং সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ইসমাইল একদিন সত্যিই সুযোগ পেয়ে গেল ।

ঘটনাটা এমন:

যথারীতি ঘর থেকে বের হয়ে চার্চ স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছে র্যাচেল । কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওকে অনুসরণ করছে ইসমাইল । এতদিনের অপেক্ষার ফল ফলল । অর্ধেক পথে গিয়ে হঠাৎ চার্চ স্টেশনের দিক থেকে ঘুরে

অন্য পথ ধরল র্যাচেল। সেই কুমির ভরা ডোবার পাশ দিয়ে সাগর পাড়ের সেই সামুদ্রিক পুলের দিকে চলতে শুরু করল ও। কিন্তু কেউ যে ওকে অনুসরণ করছে তা ঘূণাক্ষরেও সন্দেহ করল না র্যাচেল। পুলের কাছে চলে গেল। শেষে মাটিতে ইসমাইলের ছায়া দেখে হুঁশ ফিরল র্যাচেলের। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ওর মন চাইছিল ছুটে পালাতে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। মুখে বন্ধুসুলভ হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘গুড ডে, মি. ইসমাইল। শিকারে এসেছেন বুঝি?’

‘হ্যাঁ, অনেকটা তা-ই। আপনার সঙ্গে শিকার করার চেষ্টা করছিলাম।’

‘কিন্তু আমি তো কোন বন্য জন্তু নই, মি. ইসমাইল, যে আমাকে শিকার করতে হবে,’ নির্বিকারভাবে বলল র্যাচেল।

‘না, অবশ্যই তা নন। তবে যে কোন জন্তুর চেয়ে অনেক সুন্দর ও অনেক বেশি বিপজ্জনক আপনি।’

র্যাচেল এবার ভাব দেখাল ওর ব্যস্ততা আছে। মুখে বলল বাড়ি যাবে। কিন্তু পুল এলাকা থেকে বের হবার একমাত্র পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসমাইল। দু’হাতে পথ আগলে রেখে বলল, ‘না, আগে আমার কথা শুনতে হবে। অনেক দিন অপেক্ষার পর আজ সুযোগ পেয়েছি। আমার কথা আজ বলবই। আমি আপনাকে ভালবাসি, মিস র্যাচেল। বিয়ে করতে চাই আপনাকে।’

‘কিন্তু আমি তো জানি আপনি বিয়ে করেছেন। তা’ও একটা না, একাধিক বিয়ে করেছেন,’ বলল র্যাচেল।

‘কে বলেছে? ওহু, বুঝেছি, বদমাশ ডাইনি নোয়ি বলেছে।’

‘নোয়িকে নিয়ে কোন বাজে কথা বলবেন না। ও আমার বন্ধু।’

‘তাহলে বলব, বন্ধু হিসেবে একটা মিথ্যুককে বেছেছেন

আপনি। যাদের কথা বললেন, তারা আমার স্ত্রী নয়, ভৃত্য।’

‘হতে পারে, না-ও হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। এই কথোপকথনও আর লম্বা করতে চাই না।’

তবু গোঁয়ারের মতো ইসমাইল বলল, ‘না, আমি বলেছি, আপনাকে ভালবাসি আমি, বিয়ে করতে চাই। সেটা আপনার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। তবে আমি চাই, র্যাচেল, স্বেচ্ছায় আপনি এতে সায় দিন। আমি খুব ভাল স্বামী হব। খুব বড় একটা ঘরে আমার জন্ম। অনেক উঁচু আমার বংশ। আপনার কল্পনার চেয়েও অনেক উঁচু। সম্পদশালী মানুষ আমি। হাজারের ওপর গবাদি পশু আছে আমার। আর আছে আইভরি বিক্রি করে পাওয়া সোনা, প্রচুর সোনা। আপনি চাইলে আপনাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যাব। এই বন্য পরিবেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে বিলাসী জীবন কাটাতে পারবেন।’

‘প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ, মি. ইসমাইল। তবে শহুরে জীবনের চেয়ে এই বন্য পরিবেশই আমার বেশি পছন্দ। না না, আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার বিপদ হতে পারে। জানেনই তো নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সাথে নিয়েই পথ চলি আমি,’ সাথের পিস্তলটা দেখিয়ে বলল র্যাচেল, ‘আমি আপনাকে ভয় পাই না, মি. ইসমাইল। বরং আমি জানি আপনিই আমাকে ভয় পান।’

‘হয়তো তা-ই। জুলুরা ঠিকই বলে, আপনি “টাগাটি” (বিশেষ কেউ)। সাদা বা কালো, কোন সাধারণ শরীর মতোই আপনি নন। তা না হলে, কোনমতেই আপনার জন্য আমি পাগল হতাম না। আপনাকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার নাওয়া খাওয়া সব শিকেয় উঠেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ঘুম। ওহ, র্যাচেল, আমার ওপর রাগ করবেন না, করুণা করুন, একটু

আশা দিন। জানি, অতীতে খারাপ একটা জীবন কাটিয়েছি আমি। কিন্তু কথা দিতে পারি, আপনাকে পেলে ভাল হয়ে যাব, ভাল খ্রিস্টান হয়ে উঠব। কিন্তু যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন... বুঝতে পারবেন কতটা নীচে আমি নামতে পারি।’

‘আমি খুব ভাল করেই জানি, মি. ইসমাইল, আপনি কী। এর বেশি জানার আমার আর দরকার নেই। আমি কঠিন কথা বলে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। তবে অনুরোধ করছি, চলে যান। এভাবে আর কখনো আমার সাথে কথা বলতে আসবেন না। আর, জেনে রাখুন, কখনোই আপনাকে আমি বিয়ে করব না।’

‘আপনি কি কাউকে ভালবাসেন?’ রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল ইসমাইল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটার জবাব দিল র্যাচেল, ‘এই বিরান দেশে স্বপ্ন ছাড়া কাকে ভালবাসব?’

‘বলতে চাইছেন, একটা লোককে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন আপনি? বেশ, কিন্তু আমার পথে যেন সে না আসে। তাহলে ওই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে সময় লাগবে না। আমার সামনে পড়লে ওকে খুন করে ফেলব। আমি যদি আপনাকে না পাই, তাহলে কাউকে পেতে দেব না। বুঝেছেন?’

‘আজীবাজে কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। পথ ছাড়ুন, আমাকে বাড়ি যেতে দিন।’

‘বাড়ি? আমাকে মেনে না নিলে খুব শীঘ্রই আমার বাড়ি ছাড়া আপনার জন্য আর কোন বাড়ি থাকবে না। আমি এখানে খুবই ক্ষমতাবান মানুষ, খুবই ক্ষমতাবান।’

লোকটার হিংস্র চেহারা দেখে ভয়ই পেয়ে গেল র্যাচেল। খানিকটা কেঁপে উঠল ও। তারপর বলল, ‘আমার ওপর আপনার কোন ক্ষমতাই নেই। সত্যিকারের ক্ষমতা আছে আমার হাতে।’

‘মানি, কারণ আপনি “টাগাটি”। কিন্তু তারপরও আরো কিছু আছে...’

বলতে বলতেই পায়ের শব্দ শুনে পিছু ফিরে চাইল সে। দেখা গেল সাদা রোব গায়ে ধীর কিন্তু দৃষ্ট পায়ে হেঁটে আসছে নোয়ি। ইসমাইলকে পাশ কাটিয়ে এমনভাবে সে র্যাচেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল যেন জলজ্যান্ত মানুষটাকে দেখতেই পায়নি ও। র্যাচেলকে বলল, ‘ইনকোসাজানা, আমি কাজ করছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম আমাকে ডাকছেন আপনি। তাই এখানে এসেছি। এখন আপনি বললে আপনাকে নিয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে পারি।’

আগের কথার খেই ধরল ইসমাইল, ‘উদাহরণ হিসেবে বলাই যায় এই বদমাশ কালো ডাইনিটার কথা। ওর ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে আমার। সেয়্যাপির মেয়ে, তুই ভাল করেই জানিস, জুলুল্যাও থেকে পালিয়ে আসাদের শাস্তি কী। তোর সমস্ত শয়তানির মূল্য কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব আমি।’

নরম দৃষ্টিতে লোকটার আপাদমস্তক দেখল নোয়ি। তারপর বলল, ‘তোমার তা-ই মনে হয়, নিশাচর? তোমার ধারণা, বাবার সাথে যা করেছ মেয়ের সাথেও তা-ই করতে পারবে? গতরাতে মোরগ ডাকার আগে বাবার কবরের পাশে বসে ছিলাম আমি। তখন আমার সাথে কথা বলেছে বাবার আত্মা। সে গোপন কথা বলে গেছে আমাকে। তোমাকেও বলছি, শোন...’

র্যাচেল দেখল, নোয়ির কথা শুনতে শুনতে ব্যাকাসে হয়ে গেল ইসমাইলের চেহারা। এক পর্যায়ে সে হাত তুলল যেন নোয়িকে আঘাত করবে। কিন্তু পরমুহুতেই বুলে পড়ল তার হাত। সরে দাঁড়াল ইসমাইল। জুলু আর ইংরেজিতে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল।

‘ওকে কী বললে, নোয়ি?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘ও কিছু না, জুলা। হয়তো সত্যি কথা, হয়তো ওকে ভয় দেখাতে আমার মনে যা এসেছে বলে দিয়েছি। তবে শেষ কথা হচ্ছে আপাতত চলে গেছে ও। বদমাশ হয়েনা, নির্ঘাত প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল সে? অনেক দিন ধরেই চাইছিল কথাগুলো আপনাকে বলবে। নিশ্চয়ই আপনাকে হুমকি ধমকি দিয়েছে, তাই না? আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন। ওর ক্ষমতা নেই আপনাকে কিছু করবে। আর আমাকেও খুব সামান্যই আঘাত করার শক্তি আছে ওর। তবে এটাও সত্যি যে ওর অনেক ক্ষমতা আছে। অন্যান্যদের অনায়াসে ক্ষতি করতে পারবে ও। আপনার বাবা জ্ঞানী হলে তার উচিত এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও সরে যাওয়া।’

‘আমারও তা-ই মনে হয়। চলো বাড়ি যাই। বাবার সাথে কথা বলতে হবে,’ বলল র্যাচেল।

আট

এসেই ওরা বাড়িতে ঢুকল না। কারণ র্যাচেলের সন্দেহ, ওদের ঘরে ঢুকেছে ইসমাইল। তাই একটু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল দু’জনে। সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ পর বের হলো ইসমাইল।

র্যাচেলকে নোয়ি বলল, ‘আপনার বাবার কানে বিষ ঢালতে এসেছিল ইসমাইল, সাবধান।’

বাস্তবেও তা-ই দেখা গেল। বারান্দায় চিন্তিত, বিচলিত মুখে পায়চারি করছে মি. ডাভ। তার সামনে পৌঁছে র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে, বাবা? মি. স্মিথকে তুমি কিছু বলেছ?’

এখানে একটু বলে রাখি। ইসমাইল মি. ডাভের সামনে বলেছিল যে, “ধরে নিন আমার নাম স্মিথ।” তাই মি. ডাভের কাছে ইসমাইলের চেয়ে স্মিথ নামটাই অনেক “স্বাভাবিক” বলে মনে হয়েছে। তাই এই নামেই ইসমাইলকে ডাকে সে।

মি. ডাভ বলল, ‘মি. স্মিথ এসেছিল। বলল, নোনাহ নাকি তাকে নিয়ে খুব খারাপ খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। আর তুমিও নাকি তার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে!’

‘শুনতে চাইলে পুরো ঘটনা বলতে পারি, বাবা। ইসমাইল বা স্মিথ যা-ই বলো, আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। বলেছে, আমাকে বিয়ে করতে চায়। ভদ্র ভাষায় আমি মানা করে দিয়েছি। তখন সে-ই আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে। হুমকি ধমকিও দিয়েছে। আর এখানে এসে উল্টো আমার নামেই বিচার দিয়ে গেছে।’

‘লোকটার কথাতেই আমি সেটা আঁচ করেছি। তবে তার অভিযোগ ছিল যে, তুমিই তার সাথে খারাপ আচরণ করেছ। যদিও অতীত ঝেড়ে ফেলে নতুন মানুষ হওয়ার বেশ ভাল সুযোগ রয়েছে তার। কিন্তু তবুও, আমি চাই না একে তুমি বিয়ে করো। আসলে আমি বলতে চাইছি, একজন সৎ লোককে ফিরিয়ে দিতে হলেও সম্ভাবেই কথা বলা উচিত।’

এতক্ষণ নীরবে তার কথা শুনছিল র‍্যাচেল। কিন্তু “সৎ লোক” শুনে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনা ও। রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘সৎ লোক? বাবা, তুমি কি অন্ধ না কালা? নাকি এতই ভাল যে অন্যদের খারাপ দিকটা মোটেও দেখতে

পাও না? তুমি কি জানো, তোমার এই সৎ লোকই নোয়ির পরিবারের সবাইকে খুন করিয়েছে? কেন করিয়েছে জানো? যেন জুলু রাজার গুড লিস্টে থাকে সে।’

ঘুরে নোয়িকে জিজ্ঞেস করল মি. ডাভ, ‘সত্যিই কি এমনটি ঘটেছে, নোনাহ?’

নরম স্বরে নোয়ি বলল, ‘সত্যি, আগে যদিও আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলিনি, তবে আপনি চাইলে পুরো ঘটনা আপনাকে শোনাতে পারি।’

র্যাচেল সাথে যোগ করল, ‘তুমি কি জানো, বাবা, লোকটা কখনো তোমাকে তার ক্রালে যেতে বলে না কেন? কারণ, তোমার “সৎ লোক” ওখানে তার এক হালি কাফ্রি স্ত্রী আর তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাস করে। তাই তোমাকে ডাকে না।’

‘আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, র্যাচেল। উপরন্তু তুমি কেবলই নেটিভ স্ক্যাণ্ডালের কথা বলছ।’

‘আমার কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কী দরকার? নিজেই যাচাই করো। একজন গাইড সাথে নিয়ে আগামীকাল ভোরে সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা আগে ইসমাইলের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাও। নিজ চোখে দেখে এসো কোন্টা সত্য আর কোন্টা মিথ্যা,’ বলল র্যাচেল।

‘তা-ই যাব,’ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মি. ডাভ। কারণ এই বহুগামিতা নিয়েই নেটালের বাসিন্দাদের সাথে তার তিক্ত ঝগড়া শুরু হয়েছিল। ‘কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, র্যাচেল। তবে কথা দিচ্ছি, তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে, ওই লোক আর কোনদিন আমার বাড়িতে পা ফেলতে পারবে না।’

‘বাঁচলাম তাহলে,’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল র্যাচেল।

‘তবে, বাবা, খুব সাবধানে থেকো। কারণ এ ধরনের লোক নিজের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়া পছন্দ করে না,’ বলে মায়ের কাছে চলে গেল আজকের ঘটনা জানাতে।

সব শুনে মি. ডাভকে ইসমাইলের ক্রালে যেতে নিষেধ করল মিসেস ডাভ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্যাস্টরের কথা একটাই, নেটিভদের অভিযোগ শুনে কারো সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচারী করা যাবে না। আর সে যদি আসলেই ওসব খারাপ কাজ করে থাকে, তাহলে প্যাস্টর হিসেবে তার দায়িত্ব লোকটাকে সঠিক পথের হৃদিস দেয়া। সুতরাং তর্ক করা থামিয়ে দিল মিসেস ডাভ।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা আগে দুজন গাইড নিয়ে সত্যি সত্যি রওনা হয়ে গেল র্যাচেলের বাবা। সমতলের ওপর দিয়ে বারো মাইল পথ গেল ওরা। ভোর নাগাদ যখন সূর্য উঠি উঠি করছে তখন ওরা পৌঁছে গেল দুই পাহাড়ের মাঝের একটা জায়গায়। গাইডেরা মি. ডাভকে জানাল এর পরেই একটা লোকালয় আছে। সেটাই মাফুটি টাউন।

জায়গাটা পার হয়ে সামনে বিশাল একটা বেসিন মতো জায়গার দেখা পেল মি. ডাভ। ওটার কেন্দ্রে আছে বেশ খনিকটা উঁচু জমি। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোটখাট একটা জনবসতি। সেটাকে গ্রামও বলা চলে। ওটাই কাফ্রিদের ভাষায় টাউন। ওই ঘেরের ভেতর আছে আরো উঁচু পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা গবাদি পশুর বিশাল এক খোয়াড়। সেটা গরু-ছাগলে ভরা। এমন জায়গায় বসতি গড়ার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ওই পাথুরে দেয়ালের আড়াল থেকে খুব সহজেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব।

যা হোক ওরা এগুতে এগুতে চোখে পড়ল ভোরেই কাজে যাচ্ছে চার-পাঁচজন সুদর্শন নেটিভ মহিলা। তাদের একজনের

সাথে একটা বাচ্চা ছেলেও আছে। মি. ডাভকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল ওরা। দূর থেকেই ওদের অভয় দিল মি. ডাভ। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ওরা কারা।

জবাবে বাচ্চা কোলে মহিলাটি বলল, ‘আমরা ইবুবেসির চার স্ত্রী।’

‘ইবুবেসি! মানে উমলুঙ্গু (সাদা মানুষ বা শ্বেতাঙ্গ) ইসমাইলের কথা বলছ?’

‘হ্যাঁ, আর কার কথা বলব? আমি তার বড় বৌ। এই বাচ্চাটা তার সন্তান। আরেকটু আলো হলে দেখতে পেতেন, বাচ্চাটা দেখতে প্রায় শ্বেতাঙ্গদের মতোই,’ গর্বিত স্বরে বলল মহিলাটি।

কী বলবে বুঝতে পারছে না মি. ডাভ, তাই নীরবেই ঘোড়ার পিঠে বসে রইল। মহিলাগুলোও মিলি ক্ষেতের দিকে রওনা হলো। কিন্তু কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফাস করল তারা। তারপর সেই মহিলাটিই আবার ফিরে এল। বলল, ‘একটা প্রশ্ন করতে চাই, শিক্ষক।’ স্পষ্টতই মি. ডাভের পরিচয় ওরা জানে। ‘এই কথা কি সত্য যে, আমরা আরেকটা নতুন বোন পেতে যাচ্ছি?’ প্যাস্টর কী উত্তর দেয় তা শোনার জন্য বাকিরা ওই মহিলার পিছে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

‘নতুন বোন! মানে? কী বলতে চাইছ?’

‘মানে, শিক্ষক, আমরা শুনেছি, আপনার মেয়ে জুলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে ইবুবেসি। তাই আমরা ভাবলাম আপনি বোধহয় পণ হিসেবে কত গরু নেবেন সেটা ঠিক করতে এসেছেন। যেমনটা শুনেছি, জুলা যদি সত্যিই তেমন সুন্দরী হয়, তাহলে বোধহয় গরুর পুরো পালই চাইবেন আপনি।’

ঘটনা এবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এমনকী দারুণ

সহিষ্ণু মি. ডাভের পক্ষেও। 'সে বলল, 'বিধর্মী বেহায়া মেয়ে, সাহস কত তোমার, আমার সাথে এভাবে কথা বলো? সাদা লোকটা কোথায়?'

দুই কদম এগিয়ে এল মহিলাটি। ঘৃণামিশ্রিত রাগের সাথে বলল, 'খারাপ নামে আমাদের ডাকছেন কেন, শিক্ষক? আমরা সবাই একজনের স্ত্রী, সম্মানিত নারী। আপনারও তো স্ত্রী আছে, অবশ্য ইবুবেসি বলেছে একজনই মাত্র স্ত্রী আপনার। কিন্তু তাকে কি আপনি উপযুক্ত সম্মান দেন না? আর ইবুবেসিকে খুঁজছেন তো, সে ওই বড় ঘরে আমাদের সবচেয়ে ছোট বোনকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। গত মাসেই ওকে বিয়ে করেছে ইবুবেসি। আমাদের স্বামীর জমি চাষ করতে যাচ্ছি আমরা। যেতে যেতে আপনাকে শুভদিন জানিয়ে যাচ্ছি। আর, আশা করি, আপনার মেয়ে ইনকোসাজানার জিভটা আপনার মতো এমন রুক্ষ নয়। রুক্ষ হলে নতুন বোন হিসেবে তাকে আমরা ভালবাসব কী করে?' বলে নিজের কম্বলটা ভাঁজ করে দেমাগি ভাব দেখিয়ে "বোনদের" নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

জীবনে প্রথমবারের মতো ভয়াবহ রেগে গেছে মি. ডাভ। রাগের চোটে হাতের জলহস্তির চামড়ার চাবুক দিয়ে কষে আঘাত করল ঘোড়ার গায়ে। যন্ত্রণায় হেঁষা করে উঠে বড় ঘরের দিকে তীরের মতো ছুট লাগাল ঘোড়াটা।

ওদিকে ঘোড়াটার যন্ত্রণাকাতর ডাক ইসমাইলের কানেও গেছে। তাই মৌমাছির চাক আকৃতির ক্রালের তত্পর ছোট দরজাটা দিয়ে নেটিভদের মতোই হাঁটু আর হাতের ওপর ভর দিয়ে বেরিয়ে এল ইসমাইল। পেছন পেছন হেঁচকি হলো ওর নতুন তরুণী বৌ।

বাইরে এসে বড় করে হাই তুলল মেয়েটা। মাত্রই ঘুম ভেঙেছে ওর। তবে প্যাস্টরের দৃষ্টি কাড়ল মূলত ইসমাইল। ওর

গায়ের রঙটাই কেবল সাদা। কিন্তু বাকি সব কালোদের মতোই। কোমরে ঝুলছে স্থানীয় কায়দায় বানানো ও পরিহিত মুচা। আর কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে ফেলা আছে পশমি ক্যারোস।

হামাগুড়ি থেকে উঠে সোজা হয়ে তাকানোর পর ইসমাইল দেখতে পেল তার অতিথিকে। সাথে সাথেই চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। নিচু কর্তে গাল বকল ইসমাইল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল মি. ডাভের সামনে, নীরবে। মি. ডাভেরও মুখ বন্ধ। সত্যি বলতে রাগের চোটেই কথা বলতে পারছে না সে।

‘আহ, কেমন আছেন, স্যর?’ শেষ পর্যন্ত নিজেকে ফিরে পেয়েছে ইসমাইল। বলে চলেছে, ‘খুব ভোরে চলে এসেছেন তো, তাই খানিক অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। আপনি আসবেন জানলে...’ এ পর্যন্ত বলে ইসমাইলের খেয়াল হলো যে তার নতুন বৌ তারই কাঁধের ওপর ভর দিয়ে প্যাস্টরকে দেখছে। ক্যারোস টানাটানি করতে করতে পিছন দিকে কষে একটা লাথি হাঁকাল সে। জুলু ভাষায় ধমক দিয়ে বলল ভেতরে যেতে। তারপর নিজের পোশাক নিয়ে তাড়াছড়ো করে সাফাই দিল, ‘এই পোশাকের সাথে আপনি নিশ্চয়ই খুব একটা পরিচিত নন। আসলে হয়েছে কী, এগুলো হচ্ছে কাফ্রিদের পোশাক। ওদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখতেই এসব পরে থাকি। বাদ দিন ওসব। ঘরে আসবেন না? আপনাকে “টাইওয়াল্লা” (কালোদের মধ্যে প্রচলিত বিয়ার) দিতে বলছি, না মানে “আমাসি” (মিঠা) দিতে বলছি। আর নাস্তার জন্য এখনি একটা বাছুর জুখাই করতে বলছি।’

আর শুনতে পারল না মি. ডাভ। বলল, ‘ইসমাইল, স্মিথ বা ইবুবেসি যা-ই হোন, আপনার “ভৃত্যদের” সম্পর্কে আমার কাছে মিথ্যা বলার দরকার নেই। আমার মেয়ে আর নোনাহ-ও বলেছিল কিন্তু আমি ওদের কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন

দেখছি, ওরাই ঠিক বলেছে। আপনিই কালো মূনের মানুষ। গতকালই আমার বাড়িতে গেছেন আপনি, আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছেন। আর আজ নিজ চোখে এসব কী দেখছি আমি? হিহ! নিজের জাতের ওপরই ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে আমার। খুব ভাল করে শুনে রাখুন, যদি কখনো ভুলেও আমার বাড়ি রামাহ-তে পা রাখেন, আমার স্ত্রী বা মেয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন তো বলে রাখছি, কাফ্রিরা চাবকে আপনাকে এলাকা ছাড়া করবে,’ হাতের জামবক (জলহস্তির চামড়ার চাবুক) ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছে মি. ডাভ, ‘যদিও এটা আমারই দায়িত্ব, কিন্তু আমি বয়স্ক হয়ে গেছি তাই ওদের দিয়েই এটা করাব।’

প্রথমে ইসমাইল একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্যাস্টরের হুমকি শুনে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল সে। বলল, ‘এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই ভাল করবেন, বুড়ো ভাম কোথাকার। আর নয়তো আপনাকে দিয়ে অন্য সুরে গান গাওয়াব আমি। সি-কাউ-এর চামড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে এমন হাল করব যে আপনার পরিবারও চিনবে না আপনি কে। আরেকটা ব্যাপার, আপনার মেয়েকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, বলেছিও যে, ওকে পেলে অতীত ঝেড়ে ফেলব আমি। ছেড়ে দেব এই কালো “বস্তাগুলোকেও”। ও-ই হবে আমার একমাত্র স্ত্রী। আর চামড়া আমাদের সাদা হোক বা কালো, রক্ত মাংস তো একই সবই লাল। এমনকী আপনাকেও একই কথা অনেকবার বলতে শুনেছি। তাহলে আর আপনার মেয়ের অভিযোগের থাকছে কী? শুধু এদের মাঝে নিজের জায়গা করে নেবে ঝাঁচেল।’ তারপর একবার হাঁচি দিয়ে বলল, ‘ওদের সাথে মিলি ক্ষেতে গিয়ে কাজও করবে ওদের মতো।’

ইসমাইলের “বক্তব্য” শুনে প্রচণ্ড রাগে যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে

ফেলেছে মি. ডাভ। কারণ প্রথমত একজন ইংলিশ ভদ্রলোক সে। দ্বিতীয়ত একজন ধর্মপ্রচারক। তৃতীয়ত ও প্রধানত, নিজের মেয়েকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে। ওই মেয়ের সম্বন্ধেই এমন সব কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না মি. ডাভ। হাতের জামবক দিয়ে ইসমাইলের মুখে আঘাত করে বসল সে। এতটাই জোরে মেরেছে যে, মুখ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। সাথে সাথেই সংবিৎ ফিরল প্যাস্টরের। বুঝল, নির্ঘাত নিজের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করে ফেলেছে। সেই অপেক্ষায়ই রইল সে। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। কারণ দুনিয়ার আর সব হিংস্র মানুষের যা স্বভাব ইসমাইলেরও তা-ই। হিংস্র কিন্তু ভীরা-কাপুরুষ সে। এবং এই ব্যাপারটাও র্যাচেল অনেক আগেই বুঝে গিয়েছে।

যা হোক, সামলে উঠে প্রচণ্ড রাগে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ইসমাইল। কিন্তু যখন দেখল, মি. ডাভের সাথের দুই গাইড তাদের হাতের অ্যাসেগাই প্রস্তুত করে রেখেছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। নয়তো ওগুলো নির্ঘাত তার বুকেই ঢুকবে। দাড়ি থেকে রক্ত মুছে ইসমাইল বলল, ‘আজ আমাকে আপনার শত্রু বানিয়ে নিলেন। এতদিন আপনার মেয়ের খাতিরে আপনাদের রক্ষা করেছি, কিন্তু আর না। যখন পরিণতি আসবে এই কথাটা মনে রাখবেন।’

‘যখন ঈশ্বরের হুকুম হবে তখনি আমার সময় শেষ হবে। তোমার বা অন্য কারো ইচ্ছায় নয়। তবে তোমাকে আঘাত করে পাপ করেছি আমি। সেজন্য আমি দুঃখিত। তুমিও কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইবে আশা করি,’ বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ইসমাইলের ক্রাল মাফুটি ছেড়ে বেরিয়ে এল মি. ডাভ।

বাড়ি ফিরে এসে র্যাচেলের সাথে কথা বলল মি. ডাভ। তবে ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা না দিয়ে কেবল বলল যে, র্যাচেল যা

জেনেছে, ঠিকই জেনেছে। ইসমাইলকে বলে এসেছে যে, সে যেন ভুলেও আর কখনো এই বাড়ির দরজা অতিক্রম না করে। এর বেশি আর কিছু বলল না। তবে ঘটনা জানতে কারো বাকি রইল না। কারণ দুই কাফ্রি গাইডের কাছে জিজ্ঞেস করে ঘটনা জেনে নিয়েছে নোয়ি।

ওদিকে মিসেস ডাভের কাছে ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছে মি. ডাভ। শুনে খুবই আপসেট হয়েছে সে। বলল যে, কোন না কোনভাবে এই ঘটনার প্রতিশোধ ইসমাইল নেবেই। স্বামীকে অনুরোধ করল যে, র্যাচেলকে এভাবে বিপদের মুখে পড়তে দেয়া ঠিক হবে না।

জবাবে মি. ডাভ বলল, ‘তুমিই না বল যে, র্যাচেলের কোন ক্ষতি হবে না? আমিও সেটাই বিশ্বাস করি।’

‘হ্যাঁ, বলি। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। ওকে এখানে রাখা আমার উচিত মনে হচ্ছে না,’ বলল র্যাচেলের মা। নিঃস্বার্থ মহিলাটি বলল না যে, নিজের স্ত্রীর নিরাপত্তার কথাও মি. ডাভের মনে রাখা উচিত।

‘কিন্তু এখন কীভাবে চলে যাই? আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফসল মাত্রই ফলতে শুরু করেছে। এখন চলে গেলে এই লোকগুলো সবাই আবার বর্বর জীবনে ফিরে যাবে। ইসমাইল বা অন্য কেউ আমার শরীরের কী ক্ষতি করতে পারবে তা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। কিন্তু এখন এখান থেকে চলে গেলে ঈশ্বরের সামনে যেদিন দাঁড়াব সেদিন এই কাপুরুষতার কী জবাব দেব আমি? চাইলে র্যাচেলকে নিয়ে ফিরে যেতে পারো তুমি। কিন্তু কাজ শেষ করার জন্য আমাকে এখানে থাকতেই হবে।’

মিসেস ডাভ আগেও স্বামীকে ছেড়ে যায়নি, এখনও গেল না। আর র্যাচেলকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ও বলল, কোথায়

আছে তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। কারণ কাউকেই ভয় করে না ও। তবে মা যেখানে যাবে সেখানে ও-ও যাবে। কিন্তু আফ্রিকার বাইরে যাবে না। এই দেশের মাটিতে হেসে খেলে বড় হয়েছে ও। আফ্রিকাই ওর দেশ। তবে যে কথাটা র‍্যাচেল উহ্য রাখল সেটা মিসেস ডাভ ছাড়া আর কেউ ধরতে পারল না। তা হচ্ছে রিচার্ডের জন্য এখনও অপেক্ষা করছে র‍্যাচেল। এবং ওকে এই আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবে না সে।

দিন গড়িয়ে সপ্তাহ এল, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস। এভাবে একে একে কেটে গেল আটটি মাস। ইসমাইলের কোন খবর এল না। তবে কান্ট্রিদের কাছ থেকে উড়ো খবর পাওয়া গেল যে ব্যবসার কাজে উত্তর দিকে গেছে ইসমাইল। বছরখানেক লাগবে তার ফিরে আসতে। খবর শুনে সবাই খুব খুশি। অসম্ভবষ্ট কেবল নোয়ি। তবে কাউকে কিছু বলল না ও। সবাই ধারণা করল, লোকটা হয়তো মারাই গেছে। সুখে শান্তিতে কাটতে থাকল রামাহ-এর বাসিন্দাদের দিন। তবে নোয়ি ছাড়া আর কেউ সন্দেহও করল না যে এটা আসলে ঝড়ের আগের থমথমে নীরবতা।

হঠাৎ একদিন ডিনগানের বার্তা নিয়ে হাজির হলো জুলু দূত। আগের বারের মতো এবারও ওরা রাজার উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে সাদা গরুর পাল। আগেরবারের মতোই রাতে ওদের সাথে কথা বলল র‍্যাচেল। কারণ অন্য কারো উপস্থিতিতে র‍্যাচেলের সাথে কথা বলবে না তারা। আগের মতোই আবদার নিয়ে এসেছে যে, একটা জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। রাজা ও তার মন্ত্রণাদাতারা ইনকোসাজানার পরামর্শ চায়।

র‍্যাচেল জানতে চাইল, কী সেই গুরুতর ব্যাপার।

দূতেরা তা বলতে পারল না। অথবা না জানার ভাব ধরে বলল, বিষয়টি তাদের সামনে খোলাসা করা হয়নি। র‍্যাচেল

তখন বলল যে, রাজা যদি দূত মারফত সেই সমস্যাটা বলে পাঠায় তাহলে বিচার বিবেচনা করে একটা মত দিতে পারবে ও । কিন্তু রাজার ক্রালে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয় ।

জুলুদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠল, কেন সম্ভব নয়, যেখানে পুরো দেশ তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে?

জবাবে র্যাচেল বলল, 'আমার ঘরের লোকদের কাছে আমি এখনও ছোট । তারা এমনকী একদিনের জন্যও আমাকে বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি দেবে না ।' জুলুদের মধ্যে বাবা-মাকে সম্মান করা ও তাদের প্রতি নিখাদ আনুগত্য বজায় রাখার রীতি প্রচলিত । সেটা মনে করে কথাটা বলল র্যাচেল । ভাবল ওর অসুবিধাটা জুলুরা বুঝবে ।

'কিন্তু তা কী করে হয়?' কথা বলছে রাজার মুখ (পড়ুন দূত) । তবে এই লোক মোপো নয় । অন্য একজন । সে বলল, 'ইনকোসাজানা-ই-জুলা কী করে একজন সাধারণ "আকাশের ওঝা"র সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত থাকতে পারে? স্বর্গ কি কখনো মেঘের হুকুম চলে? মেঘই বরং চলে স্বর্গের হুকুমে ।'

এবার র্যাচেল বলল, 'যদি সেই মেঘ থেকে স্বর্গের জন্ম হয় তবে মেঘের হুকুম মানতে স্বর্গ বাধ্য ।'

'স্বর্গ থেকে মেঘ আসে, লেডি, মেঘ থেকে স্বর্গ নয়,' বলল সেই ইন্দুনাটি ।

পুরো একটা জাতির 'ওপর ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারটা র্যাচেলের কাছে প্রথমে ছিল একটা কৌতূকের মতো । আর ক্ষমতা জিনিসটার প্রতিও সবার মোহ আছে । র্যাচেলও এর ব্যতিক্রম নয় । কিন্তু যখন ও দেখল, জুলুরা অধিষ্টিত ওর ক্ষমতা এমনকী ওর বাবা-মা'র অবাধ্য হবারও অধিকার দেয়, ব্যাপারটা আর কৌতূকের পর্যায়ে রইল না, গম্ভীর বিষয়ে পরিণত হলো । তাই র্যাচেল এবার চাইল এসবের ইতি টানতে । বলল,

‘কী বোঝাতে চাইছ, রাজার দূত? আমার বাবা-মা’র কাছে আমি এখনও ছোট। আর বলা বাহুল্য, সন্তানের চেয়ে বাবা-মা অবশ্যই বড়। এবং অভিভাবকদের মেনে চলাই সন্তানের কর্তব্য।’

‘ইনকোসাজানা, আপনি যদি বলেন “মরে যাও”, মরে যেতে আমরা বাধ্য। ঠিক তেমনই বাধ্য আপনার বলা গল্প শুনতেও। তবে “আসল” সত্য তাতে ঢাকা থাকছে না। সত্যিটা আমরাও শুনেছি। জেনেছি, কীভাবে বজ্রবিদ্যুতের সাথে শিশুর আকৃতিতে মাটিতে নেমে এসেছেন আপনি। আর এই সাদা পরিবারটি তাদের সন্তানকে কবরে শায়িত করে ফেরার সময় আপনাকে কুড়িয়ে পেয়ে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছে।’

অবাক হয়ে গেল র্যাচেল। বলল, ‘এই গল্প আবার কোথা থেকে গজাল!’

‘আমাদের ওঝাদেরকে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে, লেডি।’

‘ওঝাদের সামনে মিথ্যা দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। আমিও আর দশটা মেয়ের মতোই সাধারণ। এই সাদা পরিবারে জন্ম হয়েছে আমার। আর আমাকে “স্বর্গের আত্মা” নামটি দেয়া হয়েছে কাকতালীয়ভাবে। এবং কাকতালীয়ভাবেই সেটা মিলে গেছে তোমাদের জাতির স্বর্গীয় আত্মার সাথে।’

নম্রভাবেই দূত বলল, ‘শুনলাম। সাধারণভাবেই আপনার জন্ম, কাকতালীয়ভাবেই আপনি এই মহান নাম পেয়েছেন, কাকতালীয়ভাবেই আপনি আমাদের জাতির আত্মার মতো শ্বেতাঙ্গ ও তাঁর মতোই সোনালী চুলের অধিকারিণী। আপনার বক্তব্য আমরা শুনেছি।’

র্যাচেল এরপর শুধু বলল, ‘আমার বক্তব্যটুকু রাজার কানে পৌঁছে দিয়ে।’

এরপরে র্যাচেলকে জুলুদের রাজকীয় সালাম বায়েতে দিয়ে

বিদায় নিল লোকগুলো।

ফিরে এসে সাপারে যোগ দিল র্যাচেল। সবাইকে জানাল জুলুদের সাথে কী কথোপকথন হয়েছে। র্যাচেল ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্ব দিলেও বিষয়টাকে একদমই পান্ডা দিল না মি. ডাভ। বলল কীভাবে ওর জন্ম হয়েছে। র্যাচেল হাসতে শুরু করল। তবে এক পর্যায়ে মি. ডাভকে দেখা গেল বেশ ইতস্তত করেছে। যদিও সেটা কেউ খেয়াল করল না। তারপর জুলুদের কুসংস্কার নিয়ে কথা বলতে লাগল সে। এ কথাও সে বলল যে, পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ একটা আজগুবি কাহিনি। এবং খানিকটা রাজনৈতিক ব্যাপারও বটে। ওকে সাথে রাখতে পারলে রাজা বা জুলুদের বিশেষ কিছু লোক হয়তো বিরাট কোন ফায়দা অর্জন করতে পারবে। সেই জন্যই ওকে জুলুল্যাওয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তারা।

ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে র্যাচেলের মা। বলল যে, খুব কঠিন আর ত্রুট একটা শক্তি নিয়ে অবিবেচকের মতো খেলছে ওরা। হাজার লোকের প্রাণ একটা সামান্য মেয়ের হাতে সঁপে দেয়া মোটেই কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। তারপর বলল, ‘হয়তো আমাদের নিজেদের প্রাণও ওর হাতেই রয়েছে, হয়তো।’

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, নোয়িকে কেউ দেখেছে কিনা। জবাবে মি. ডাভ বলল দুই ঘণ্টা আগে নোয়িকে ঝর্ণার দিকে যেতে দেখেছে সে। হয়তো প্রতিদিনকার মতো ফুল তুলতে যাচ্ছিল ও। সেই সাথে বলল, ‘নোয়ি মেয়েটা খুব অদ্ভুত। খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা সে অনায়াসে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আজও ব্যাপ্টাইজড হতে সম্মত হয়নি।’

হঠাৎ র্যাচেল খেয়াল করল কেমন যেন হয়ে গেছে ওর মায়ের মুখটা। দেখতে দেখতেই খাবার টেবিলের ওপর মুখ

থুবড়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু লাফিয়ে উঠে র্যাচেল তার কাছে যেতে যেতেই আবার চেতনা ফিরল তার। তবে ভীষণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা।

ছুটে গিয়ে মাকে ধরে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে, মা?’

‘ভয়াবহ একটা দৃশ্য হঠাৎ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। দেখলাম একটা এলাকা রক্তে একদম লাল হয়ে আছে। আগুন লেগেছে চারদিকে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যাচ্ছে সব কিছু। দৃশ্যটা খুব তাড়াতাড়ি মুছে গেল। বাদ দাও। ওসব কিছু না,’ বলল র্যাচেলের মা।

নয়

নিজেকে একটু ফিরে পেয়ে বিছানায় চলে গেল মিসেস ডাভ। তার রুমের দরজা বন্ধ হওয়ার পর বাবাকে র্যাচেল বলল, ‘আমার কিছু ভাল ঠেকছে না, বাবা। আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, মা আসলেই ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।’

‘আজীবাজে কথা বোলো না। এসব তার স্কটিশ কুসংস্কার, আর কিছু নয়। আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এমন রূপকথা অনেক শুনেছি। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই বন্য পরিবেশে আমরা বছরের পর বছর ধরে আছি। অনেক কিছুই তো হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কই, কিছুই তো হয়নি। সবসময়ই

আমাদেরকে নিজ কৃপায় রক্ষা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর,’ বলল র্যাচেলের বাবা।

‘সেটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু, বাবা, কখনো কখনো আমার নিজেরও মনে হয়, কিছু জিনিস দেখতে পাই আমি। সেভাবেই আমি জানি, মা আমার সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলেন। আসলেই আমার বড় কোন ক্ষতি কখনোই হবে না।’

‘আর কী কী অনুভব করো?’

‘রিচার্ড ড্যারিয়েন নামের ছেলেটার কথা তোমার মনে আছে, বাবা?’ প্রশ্নটা করতে করতে র্যাচেলের গালে একটু রঙের আভাস ফুটে উঠল।

‘যে ছেলেটা তোমার সাথে দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল তার কথা বলছ? হ্যাঁ, মনে আছে। বহু বছর হয় ওর কথা আমি ভাবিনি। ওকে নিয়ে কী হয়েছে?’ বলল মি. ডাভ।

‘আমার মনে হয়, ওকে আবার আমরা দেখব।’

শ্মিত একটু হাসল ওর বাবা। বলল, ‘তা-ই তোমার মনে হয়? ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে আর আফ্রিকায় থাকে, দেখা তো হতেই পারে। কিন্তু সেটা কি আদৌ ভাল হবে? দেখো, র্যাচেল, এসব ভবিষ্যৎ দেখা জাতীয় ব্যাপার স্যাপার ছাড়াও আমাদের জীবনে বহু যন্ত্রণা আছে। আর কালোদের ভেতর থেকে উঠে আসা এসব রাবিশ গ্রহণযোগ্যও নয়। আমার এখন মনে হচ্ছে, সব ছেড়ে-ছুড়ে আমাদের বোধ হয় ফিরে যেতেই হবে। তবে এতে আমার মনটা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। কারণ আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফসল মাত্র ফলতে শুরু করেছে।’

র্যাচেল বলল, ‘বাবা, আগেও আমি বলেছি, আমি আফ্রিকা ছেড়ে যেতে চাই না। তবে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য বিবেচনা করা উচিত। দিন দিন ভেঙে পড়ছে তার শরীর।’

অধৈর্য কণ্ঠে মি. ডাভ বলল, ‘ঠিক আছে, এসব নিয়ে আমি

চিন্তা করব, তোমার মায়ের সাথেও কথা বলব। আশা করি ঈশ্বর আমাকে পথের দিশা দেবেন। আমাদের সবাইকেই কখনো না কখনো মরতেই হবে। আমি প্রার্থনা করি, আমার প্রিয় কাজ ধর্ম প্রচারে থাকাকালীন যেন আমার মরণ আসে। ঈশ্বর বলেছেন, আগামী কাল নিয়ে চিন্তা করো না। আজকে শয়তান তোমার ওপর যত পাপ চাপিয়ে দিয়েছে সেগুলো থেকে আগে মুক্তি প্রার্থনা করো। আর এটাই আমার পথ চলার মূলমন্ত্র। ঈশ্বরের এই বাণী মেনে চলতেই পছন্দ করি আমি।’

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে বাবাকে শুভ রাত্রি জানাল র্যাচেল। তারপর নোয়িকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে বিছানায় চলে গেল। ভাবল মেয়েটা বোধহয় জুলুদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে গ্রামে তার কোন বান্ধবীর কাছে লুকিয়ে আছে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল র্যাচেল। সকালে উঠে নোয়িকে খুঁজল কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। অবাক কাণ্ড। গ্রামের কেউ কোথাও দেখেনি ওকে। আনমনে চিন্তা করতে করতে ফিরে আসছিল ও। তখন হঠাৎ এক নিঃসঙ্গ জুলুর দেখা পেল। একটা কেরি (মুগুর সদৃশ হাতিয়ার) ছাড়া লোকটার হাতে আর কোন অস্ত্র নেই। র্যাচেলকে দেখেই এক হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল সে। তারপর হামাগুড়ি দেয়ার মতো এগিয়ে এল। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাউকে সম্মান জানানোর প্রচলিত জুলুদের রীতি এটা।

লোকটাকে র্যাচেলের চেনা চেনা লাগল। মনে হলো গত রাতে একে দেখেছে। কিন্তু সেটা ছিল রাতের আধো আলো আধো আঁধারে। তাই নিশ্চিত হতে পারছে না ও। তখনই সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ওকে বায়াতে দিল লোকটা।

‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল র্যাচেল।

‘আমি টাম্বুসা, ইনকোসাজানা। রাজার ইন্দুনা। গতরাতে

আমাকে দেখেছেন আপনি ।’

‘হ্যাঁ, মনে আছে আমার ।’

‘এখানে আপনার সাথে নোয়ি নামে এক মেয়ে থাকত, ইনকোসাজানা । জাদুকর ও ওঝা সেয়াপির মেয়ে সে । রাজার হুকুমে তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে । ও-ও মরত । কিন্তু আমরা জেনেছি, যে সৈন্য ওকে ধাওয়া করছিল, স্বর্গ থেকে বজ্রপাত ডেকে এনে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন আপনি । এবং সেই অধিকারও আপনার আছে । তারপর আপনার স্বর্গীয় অধিকারবলে সেই মেয়েটিকে আপনার দাসী করে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন ।’

‘বলে যাও ।’

‘আমরা জানি, ইনকোসাজানা, মেয়েটাকে আপনি খুব ভালবাসেন । সেই জন্য গতকাল আপনার সাথে কথা বলার আগেই মেয়েটাকে ধরে আমরা লুকিয়ে রেখেছি । আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল যে আপনি আমাদের সাথে গেলে আমরা যেন ওকে ছেড়ে দিই । কিন্তু আপনি না গেলে ওকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়ার হুকুম ছিল আমাদের কাছে ।’

‘খুব খারাপ কাজ করেছে, টাম্বুসা । আর কী বলার আছে?’

‘রাজা বলে পাঠিয়েছে, এই মুহূর্তে আপনি আমার সাথে গেলে ওকে ছেড়ে দেবে রাজা । কিন্তু না গেলে এখনই মৃত্যু ঘটবে ওর ।’

‘তোমার কথা যে সত্য তা কীভাবে বুঝব, টাম্বুসা? লোকটা বিশ গজের মতো পিছিয়ে গেল । তারপর চিৎকার করে ডাকল, ‘বেরোও সবাই ।’

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এক তের-চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে । র্যাচেল জানে প্রায়ই এই মেয়েটাকে নিয়ে বের হয় নোয়ি । মেয়েটা নোয়ির ঝুড়ি বহন করে ।

ইন্দুনা বলল, ‘কীভাবে তোরা ধরা পড়েছিস আর নোয়ি তোকে কী বার্তা দিয়েছে বল।’

জুলু রীতি অনুসারে ঘটনার কোন সূক্ষ্ম বিবরণও না এড়িয়ে মেয়েটা বলে গেল কীভাবে ফুল তুলতে গিয়ে জুলুদের হাতে ধরা পড়েছে ওরা। রাতে ওদের লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এখান থেকে চার মাইল দূরের একটা ঝোপের ভেতর। রাতে রাজার দূতেরা রামাহ থেকে ফিরে গেলে পরে এই মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়েছে টাম্বুসা। তবে মেয়েটির হাতে একটা বার্তা দিয়েছে নোয়ি। সেটা হচ্ছে:

“ইনকোসাজানা, জুলুরা আমাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। রাজা ঘোষণা দিয়েছে, ইনকোসাজানা এই মুহূর্তে জুলুল্যাণ্ডে গেলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর না গেলে আমাকে মেরে ফেলা হবে। লেডি, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আপনি আসবেন না। আমি বিশ্বাস করি জুলুল্যাণ্ডে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তবুও বলছি, জুলুল্যাণ্ডে না এলেই আপনার জন্য মঙ্গল।”

তারপর মেয়েটা বলল, ওকে টাম্বুসার অধীনে রেখে বাকিরা জুলুল্যাণ্ডে চলে গেছে। আর টাম্বুসা ওকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে র্যাচেলের সাথে দেখা করার জন্য। র্যাচেলের মনে কোন সন্দেহ নেই যে, মেয়েটির কথা সত্য। তবে প্রশ্ন হচ্ছে করণীয় কী।

জুলু লোকটিকে ওর সাথে রামাহ-এ যেতে বলল। গিয়ে দেখল খোলা বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছে ওর বাবা আর মা। র্যাচেলের সাথে জুলু লোকটিকে দেখেই উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠল তারা।

মি. ডাভ প্রশ্ন করল, ‘কী ব্যাপার, কী হয়েছে?’

র্যাচেল লোকটিকে আবার তার গল্প শোনাতে বলল।

লোকটি শোনাল। তবে ওর বাবা-মাকে গোণায়ই ধরল না জুলু।
র্যাচেলের দিকে ফিরে বলল যা বলার। মেয়েটিও তার গল্প
শোনাল। গল্প শেষ হতেই লোকটিকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলল
র্যাচেল।

টামুসা তখন বলল, ‘আমি একটু দূরে সরে আপনার
অপেক্ষায় থাকলাম, ইনকোসাজানা। আপনার দাসীকে বাঁচাতে
চাইলে তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। কারণ সূর্যাস্তের মধ্যে
টেঙুলা নদীর ওপাড়ে আপনাকে দেখা না গেলে রাজার কাছে
সংবাদ চলে যাবে। সাথে সাথেই মারা পড়বে নোয়ি। আরেকটা
ব্যাপার। কেবল্ মাত্র আমি ছাড়া আর কোন সাদা বা কালো
মানুষ যদি আপনার সাথে যায় তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।’

জুলু লোকটা ও বাকিরা চলে যেতেই বাবাকে প্রশ্ন করল
র্যাচেল, যে, কী করা যায়? অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল
র্যাচেলের মা। ততক্ষণে জুলুদের অসভ্যতা, কুসংস্কার ইত্যাদি
নিয়ে হাজারটা কথা বলে ফেলেছে মি. ডাভ। শেষে বলল যে,
ওই পাগলের দেশে র্যাচেলের যাওয়া কোনমতেই উচিত হবে
না।

র্যাচেল বলল, ‘কিন্তু, বাবা, তার অর্থ হবে নোয়ির মৃত্যু
পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা। আমার জায়গায় তুমি হলে যেতে না,
বাবা?’

‘অবশ্যই যেতাম। আসলে আমি বলছি, তোমার জায়গায়
আমি নিজে যেতে চাই। ডিনগান বিচক্ষণ লোক। নিশ্চয়ই
আমার কথা শুনবে,’ বলল মি. ডাভ।

‘শুনবে না। স্রেফ তোমাকে জবাই করে ফেলবে। শোননি,
জুলু লোকটি কী বলে গেল? বলেছে, আমার সাথে সাদা বা
কালো যে-ই যাক তাকে খুন করা হবে। সুতরাং তোমার যাওয়ার
কোন উপায় নেই, বাবা।’

মিসেস ডাভ তখন বলল, ‘র্যাচেল ঠিকই বলেছে। তোমার যাওয়ার উপায় নেই। গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। তাছাড়া এখানে আমাকে একা রেখে যাওয়ার কথা ভাবছ কী করে?’

‘তাহলে বেচারী নোয়িকে ওর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই,’ বলল মি. ডাভ।

‘কিন্তু তা কী করে হয়, বাবা? মেয়েটাকে বাঁচানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি যদি ওকে মরতে দিই, সারা জীবন নিজের বিবেকের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব?’

‘কিন্তু, র্যাচেল, জুলুরা যদি তোমাকেই মেরে ফেলে?’

‘না, তা ওরা করবে না। মা-ও জানে সেই কথা। আমিও জানি, মানি। কিন্তু সেটা কথা না। কথা হচ্ছে, ওদের মোটা মাথার ভেতর ইনকোসাজানার আইডিয়া ঢুকেছে। আমি যদি এখন না যাই তাহলে দেখা যাবে সৈন্য পাঠাবে রাজা। তোমাদের সবাইকে মেরে হলেও আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। নোয়িকে তুলে নেয়া তারই প্রথম পদক্ষেপ। এখন, আমার মতে দুটো করণীয় আছে। এক, আমি জুলুল্যাওয়ে যেতে পারি। তারপর নোয়িকে উদ্ধার করে ওখানে “আমার” চরিত্রে যতটা সম্ভব ভাল অভিনয় করে বের হয়ে আসতে পারি। দুই, তল্লিতল্লা গুটিয়ে কাল সকালেই এই এলাকা ছেড়ে আমরা চলে যেতে পারি। সেক্ষেত্রে নোয়ি তো মরবেই, আমিও বিবেকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না।’

সঙ্গীন অবস্থার কথা ভেবে যুক্তির খোলস ছেড়ে বের হতে শুরু করল মি. ডাভ। বলল, ‘ঠিকই বলেছ। আমরা আমাদেরকে এখানে রক্ষা করতে পারলে জুলুল্যাওয়েও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন।’

‘অবশ্যই, বাবা। কিন্তু আমি জুলুল্যাওয়ে ঢুকলে, আমি চাই,

মা আর তুমি ডারবানে চলে যাবে। এবং আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।’

‘কেন? এটা তো যুক্তিহীন, অর্থহীন দাবি,’ বলল মি. ডাভ।

‘না, বাবা, যুক্তিহীন না। এখানে তোমরা মোটেও নিরাপদ নও। জুলুরা বিশ্বাস করে, আমি “কোনভাবে” তোমাদের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। স্বর্গ আর মেঘ নিয়ে ওদের কথোপকথনের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? হয়তো কিছুই হবে না। কিন্তু তারপরও, কিছুদিন ডারবানে থাকলে তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।’

কিন্তু ওসব শোনার বান্দা মি. ডাভ নন। এখান থেকে না যাওয়ার পক্ষে একের পর এক যুক্তি দিতে লাগলেন তিনি। শেষে রফা হলো এভাবে যে, জুলুল্যাণ্ডে যাবে র্যাচেল। আশা করা যায়, দিন আটকের মধ্যেই ফিরতে পারবে ও। ততদিন এখানেই থাকবে মি. ডাভ ও তার পরিবার। র্যাচেল ফিরে এলে পরে ওর অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, ওরা থাকবে না চলে যাবে।

এই সিদ্ধান্তে সবাই খুশি। সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল র্যাচেল। একটা ব্যাগে নিল কয়েকটা পোশাক, কিছু কফি, চিনি, কিছু ওষুধ ও ব্যক্তিগত কিছু টুকিটাকি জিনিস। আর সিদ্ধান্ত নিল রাজার পাঠানো ঘাঁড়ের পিঠে ও চড়বে না। ওটা নেবে অতিরিক্ত হিসেবে। চড়বে ওর পুরানো ও নির্ভরশীল ঘোড়াটার পিঠে।

প্রস্তুত হয়ে জুলু ইন্দুনা টাম্বুসাকে ডাকল র্যাচেল। ঘাঁড়টাকে দেখিয়ে বলল, ‘চলো পথ দেখাও। রাজা ডিনগানের সাথে দেখা করে আমার দাসীকে আনতে যাব আমি।’

সাথে সাথে র্যাচেলের প্রশংসা কীর্তন শুরু করল সে। জুলুরা এই “অতিপ্রশংসা” করাকে বলে বোঙ্গা। তবে র্যাচেল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল পথ দেখাতে। র্যাচেলের বাবা ওকে টেগুলার

পাড় পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। তাই সে গেল ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে। বিদায় নিতে মায়ের কাছে এল র্যাচেল। সিটিং রুমের খোলা জানালার পাশে বসে আছে সে। উদাস মনে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে।

র্যাচেল গিয়ে বলল, ‘মা, আমি তৈরি! তুমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি কোরো না। দেখো, এক সপ্তাহের মধ্যেই নোয়িকে নিয়ে ফিরে আসব।’

‘হ্যাঁ, আমারও মনে হয় নোয়িকে নিয়েই ফিরবে তুমি। কিন্তু...’

‘কিন্তু, কী, মা?’

‘জানি না। তোমাকে দেখতে পাব না ভাবতেই পারছি না আমি। মনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। জন্মানোর পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই তোমাকে কাছ ছাড়া করিনি।’

র্যাচেলের মুখেও দুঃখের ছাপ ফুটল। বলল, ‘মা, নোয়িকে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি না। তুমি বললে সব বাদ দিয়ে দেব। যাব না কোথাও। নোয়িও ব্যাপারটা বুঝবে,’ নোয়ির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে র্যাচেলের চোখে পানি চলে এল।

‘না, র্যাচেল, শুধু নোয়ি নয়, তোমার নিজের ভালর জন্যও তোমার যাওয়া দরকার। যদি তোমার বাবা তোমার কথা মানত, তাহলে সব কিছুই অন্যরকম হতো। কিন্তু তা হবার নয়। সুস্থিরাং যাও। ভাল কিছুই প্রত্যাশায় বুক বেঁধে সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে তোমার ফেরার অপেক্ষায় থাকব,’ বলল র্যাচেলের মা।

‘তুমি যা বলো, মা।’

‘নাও, আমাকে একটা চুমু দাও। ওই যে, তোমার বাবা ডাকছে। যাও, রওনা হয়ে যাও। আর মনে রেখো, আমাদের

যদি আর দেখা না-ও হয়, আমি জানি আমাকে তুমি ভুলবে না।
যাক, বাদ দাও ওসব। আমার দুঃস্বপ্ন শুনিয়ে তোমার মন খারাপ
করব না। বিদায়, মা আমার, বিদায়। সুখী হও, চিরকাল সুখী
থাকো,' বলে মেয়েকে বিদায় দিল মিসেস ডাভ।

কিছু বলতে গেলে কেঁদে ফেলবে, তাই নীরবে মাকে চুমু
খেয়ে চলে এল র্যাচেল। বাবার সাথে এগিয়ে চলল টেণ্ডলার
দিকে।

ওদের আগে আগে সাদা ষাঁড়ের লাগাম ধরে এগিয়ে চলল
টাম্বুসা। টাম্বুসা তখন একবার পিছন ফিরে বলল,
'ইনকোসাজানা, রাজার হুকুম, কেউ আপনাদের সাথে জুলুল্যাণ্ডে
যাবে না।'

'মনে আছে। বাবা আমার সাথে টেণ্ডলার তীর পর্যন্ত যাবে,'
বলল র্যাচেল।

র্যাচেল আবিষ্কার করল ওকে চলে যেতে দিয়ে ওর মায়ের
মন খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু বাবার মন মোটেও খারাপ নয়।
উল্টো উৎফুল্ল হয়ে আছে সে। বেমালুম ভুলে বসে আছে যে,
এই যাত্রায় র্যাচেলের কোন বিপদ ঘটতে পারে।

নদীর তীরে পৌঁছুতেই ওরা দেখল অপর পাড়ে ওদের
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু কাফ্রি। র্যাচেলদের দেখেই
ছুটে কয়েকজন লোক পানিতে নেমে পড়ল। নেমে হাতের চ্যাপ্টা
লাঠি দিয়ে পানিতে চটাশ চটাশ বাড়ি মারতে থাকল তারা।
উদ্দেশ্য আশপাশে কোন কুমির থাকলে ওগুলোকে ভয় দেখিয়ে
তাড়ানো।

ওদিকে বিদায়ের সময় হয়ে আসতেই আগুন্তি হয়ে গেল মি.
ডাভ। টাম্বুসাকে বলল, মেয়ের সাথে সঙ্গে ডিনগানের কাছে
যেতে চায়।

বিষণ্ন কণ্ঠে ইন্দুনা বলল, 'প্রার্থনাকারী, ওই যে বর্শাধারীদের

দেখছেন? নদীর অপর পাড়ে পা রাখলেই খুন হয়ে যাবেন। ওরা মেরে ফেলবে আপনাকে।’

বলতে বলতেই আরো এক রেজিমেন্ট সৈন্যদের দেখা মিলল। হৃন্দবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে ওরা। সবার হাতে বিরাট সাদা ঢাল আর মাথায় সাদা রঙ করা পাম পাতা। ইনকোসাজানার সম্মানে এই সাজ নিয়েছে ওরা।

টাম্বুসা বলল, ‘দেখেছেন ওদের? এত লোকের মধ্যে কার ক্ষমতা আছে ইনকোসাজানার গায়ে একটা ফুল দিয়ে টোকা দেবে? কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকলে ওরাই এপাড়ে চলে আসবে। বর্শা বসিয়ে দেবে আপনার বুকে। আমি ওদের রুখতে পারব না।’

তর্ক অর্থহীন বুঝে ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েকে একবার জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল মি. ডাভ।

তাড়াহুড়া করায় খুশিই হলো র্যাচেল। কারণ ও জানে দেরি করলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারবে না। আর জুলুরা চোখের পানি ফেলাকে দুর্বলতা ভাবে। ওদের সামনে নিজেকে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করতে চায় না র্যাচেল। ওরা পানিতে নামতেই পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় রত হলো মি. ডাভ।

সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে টাম্বুসা প্রশ্ন করল, ‘সে কি আমাদের জাদু করছে?’

‘না, আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের কাছে প্রার্থনা করছে সে,’ জবাব দিল র্যাচেল।

নদী পেটাতে থাকা দুই সারি কাফ্রি লোকের মধ্য দিয়ে টেঙলা পার হলো র্যাচেল। অপর পাড়ে ওকে স্বাগত জানাল দুই হাজারের মতো সুসজ্জিত জুলু সৈন্য। র্যাচেলের মনে প্রশ্ন জাগল এত দ্রুত ওরা এল কোথা থেকে?

উত্তরটা সহজেই অনুমেয়। তৈরি হয়েই এসেছিল জুলুরা।

যেতে রাজি না হলে জোর করে র্যাচেলকে তুলে নিয়ে যেত ।
তখন নিঃসন্দেহে ছারখার হয়ে যেত রামাহ, এর-বাসিন্দারা আর
রামাহ ঘিরে বসবাস করা কাফ্রিদের সবাই । বলা চলে স্বেচ্ছায়
এসে অজান্তে হলেও দূরদর্শী একটা কাজ করেছে র্যাচেল ।

সোজা হয়ে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসেছে
র্যাচেল । পরনে সাদা পোশাক আর পিঠের ওপর ঝুলছে ঝকঝকে
সোনালী চুল । দ্বিধাহীন চিন্তে র্যাচেলকে এগিয়ে আসতে দেখে
ছুটে এল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন । চিৎকার করে বলতে থাকল,
'ও, নোমকুবুলওয়ানার আত্মার ধারক, স্বর্গের কুমারী, "মহান
হাতি" উপাধিধারী আমাজুলুদের রাজা-ডিনগান-এর তরফ থেকে
জুলুল্যাও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ।'

ওর দিকে সেভাবে নজর দিল না র্যাচেল । তবে মনে মনে
ভাবতে থাকল নোমকুবুলওয়ানা কে বা কী । পরে অবশ্য
আবিষ্কার করেছে এটা ইনকোসাজানা-ই-জুলা-এর আরেক নাম ।
জুলু বিশ্বাস মতে এই শ্বেতাঙ্গ আত্মাই জুলুদের ভাগ্যের
নির্ধারক । আর জুলুরা ভেবে নিয়েছে সেই আত্মার পার্থিব রূপই
হচ্ছে র্যাচেল । নদীর পানি ছেড়ে শুকনো মাটিতে পা ফেলল
র্যাচেল । সাথে সাথেই ঢালের গায়ে বর্ষার হাতল দিয়ে
ছন্দবদ্ধভাবে আঘাত করে ওকে স্বাগত জানাল পুরো দুই
রেজিমেন্ট সৈন্য ।

প্রথমে ওরা খুব নরমভাবে ঢালের গায়ে আঘাত করতে
থাকল । মনে হলো যেন সাগরে মৃদু ঢেউয়ের স্পর্শধ্বনি ।
উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল আওয়াজ । মৃদু কল্লোল রূপ নিল উন্মত্ত
তরঙ্গে । শেষে ঢাল পেটানোর আওয়াজ পরিপূর্ণ হলো বজ্রগম্ভীর
গর্জনে । পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল
সেই আওয়াজ । দুই হাজার ঢালের গায়ে বর্ষার হাতলের
আঘাতে কী রব তৈরি হয়, তার ব্যাপকতা স্বেচ্ছা লিখে বোঝানো

সম্ভব নয়। তারপর হঠাৎই থেমে গেল ঢাল পেটানো। মুহূর্তেই নেমে এল পিন পতন নীরবতা। তারপর কোন একটা সংকেত পেয়ে দুই হাজার সৈন্যের প্রত্যেকে একসাথে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করল তাদের বর্শার ফলায়। সেটাও এক দেখার মতো দৃশ্য। তারপর একসাথে সবগুলো বর্শা তুলে ধরা হলো আকাশের দিকে, একযোগে দুই রেজিমেন্ট সৈন্য হাঁক দিয়ে বলল, ‘বায়াতে।’

ইনকোসাজানা-ই-জুলাকে রাজকীয় স্যালুট দিল সৈন্যরা।

পুরো ব্যাপারটা সম্পন্ন হলো খুবই সুশৃঙ্খলভাবে। র্যাচেলের মনে কোন সন্দেহই রইল না যে, জুলুদের কাছে সত্যিই ও স্বর্গের আত্মা, মোটেও কোন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ নারী নয়।

এদিকে জুলুদের এই বজ্রগম্বীর গর্জনে স্বাগত জানানো দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে র্যাচেলের ঘোড়াটা। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে পেছনের দু’পায়ের ওপর। ঘোড়াটাকে সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে র্যাচেল। তবে বেশ ভাল ঘোড়সওয়ার ও। তাই খানিক সমস্যা হলেও সামলে নিল। ঘোড়াটার লাফিয়ে ওঠা সামলাতে না পারলে ইনকোসাজানা হিসেবে ওর সম্মান নির্ঘাত কমে যেত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পড়ে যায়নি র্যাচেল।

জুলুদের বেশিরভাগই তখন পর্যন্ত ঘোড়া দেখেনি। ফলে ভয় পেয়ে ওটার লাফিয়ে ওঠাটা ওদের কাছেও আতঙ্ক জাগানিয়া একটা ব্যাপার। ওরা ধরেই নিল জাদুকরী প্রাণী যদি নী-ও হয় নিঃসন্দেহে ভীষণ বিপজ্জনক প্রাণী এই ঘোড়া!

ঘোড়াটা যখন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, ডানে ঘুরে, বামে হেলে চার পা ছুঁড়ল, জুলুদের কাছে সেটা হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো ভীতিকর এক ব্যাপার। আঁতকে উঠল ওরা। একই সাথে অবাক হয়ে ভাবল, এই তুলকালামের মধ্যেও কী সুন্দরভাবে জানোয়ারটাকে

সামলে নিয়ে সেটার পিঠে বসে আছে মহান ইনকোসাজানা!
কোন সন্দেহই নেই যে, লেডি আসলেই আলাদা। আসলেই
জুলুদের আত্মার ধারক সে।

অর্থাৎ বিপজ্জনক ব্যাপারটা র‍্যাচেলের জন্য শাপে বর হয়ে
উঠল। ঘোড়াটাকে শান্ত করে জুলুদের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে
এগিয়ে চলল র‍্যাচেল। স্বাগত জানানো শেষে ঠিক ব্রোঞ্জের
মূর্তির মতো নির্বাক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। রেজিমেন্ট
দুটোকে র‍্যাচেল পার হয়ে যেতেই পঞ্চাশজন গার্ড নিয়ে ওর
সামনে চলে গেল সৈন্যদের দলনেতা। আর, সাদা ষাঁড়ের লাগাম
হাতে একজন গার্ডের সাথে ওর পেছনে এসে দাঁড়াল টাম্বুসা।
বাকি সমস্ত সেনাদল রইল ওদের পেছনে। এভাবেই জুলুল্যাণ্ডে
পা দিল র‍্যাচেল। মনে মনে ও ভাবল, না জানি কীভাবে শেষ হয়
এই অদ্ভুত যাত্রা। আরো ভাবল, ও ফিরে না আসা পর্যন্ত ওর
বাবা-মায়ের কপালে কী আছে কে জানে।

দুই ঘণ্টা এক নাগাড়ে চলল ওরা। এরপর ওদের গতি রুদ্ধ
করল একটা দুর্ঘটনা। জুলুদের কাছে প্রকৃত অর্থে ওর অবস্থান ও
মর্যাদা কী সেটা তখনই অনুধাবন করল র‍্যাচেল।

ঘটনাটা এমন:

র‍্যাচেল বসা ঘোড়ার পিঠে। এক ঝোপের পেছন থেকে
হঠাৎ উদয় হলো ছোট এক পাল গরু। পাল ছোট হলেও
গরুগুলো আকারে বেশ বড়সড়। ওদিকে এতগুলো সৈন্য
একসাথে দেখে ঘাবড়ে গেছে গরুগুলো। তার ওপর একটা
“আজব চারপেয়ে” জানোয়ারের পিঠে “আজব” গাত্রবর্ণের
একটা মানুষ দেখে ওগুলো আরো ইতস্তত করা শুরু করেছে।
এবং গরুর যা স্বভাব, পালের নেতা, কিস্টাকার মর্দা ষাঁড়টা
মাথা নিচু করে তেড়ে এল র‍্যাচেলের ঘোড়ার দিকে। শিং দাবিয়ে
“আপদটাকে” একবারে শেষ করে দিতে চায় ষাঁড়টা।

কিন্তু মুহূর্তখানেক আগেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছে র‍্যাচেল। রাশ টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওটাকে বাঁচিয়ে দিল ও। ওদিকে, ওরা যেখান দিয়ে হাঁটছিল তার পাশেই ছিল অগভীর কিন্তু একদম খাঁড়া একটা নালা। আগেই বলেছি, এ ধরনের জায়গাকে নেটিভদের ভাষায় বলে ডোঙ্গা। তো, স্বভাব অনুযায়ী চোখ বন্ধ করে ছুটে আসা ষাঁড়টা পড়ে গেল ওই ডোঙ্গায়। মাথা নীচে দিয়ে পড়ার ফলে শিং গেঁথে গেছে পাথুরে মাটিতে। একই সাথে বিশাল শরীরটার ভার সহিতে না পেরে ঘাড় মটকে গেছে ওটার। ফল, তাৎক্ষণিক মৃত্যু।

জুলুদের ভেতর থেকে আশ্চর্য হয়ে যাওয়া একটা রব উঠল, ‘ও-ও!’

অবশ্য ওদের আশ্চর্য হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, জুলুদের দৃষ্টিতে “বেয়াদব” গরুটা নিজে থেকে তেড়ে এসেছে স্বয়ং দেবীর আত্মার দিকে। ফলে ওটাকে বেয়াদবির শাস্তি তো পেতেই হতো। শাস্তি হিসেবে বোকা ষাঁড়টাকে মৃত্যু উপহার দিয়েছে ইনকোসাজানা!

এক ক্যাপ্টেন তখন হাত নেড়ে সৈন্যদের কিছু একটা ইশারা করল। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গায়ে শতাধিক বর্ষার আঘাত নিয়ে লুটিয়ে পড়ল প্রতিটা গরু। র‍্যাচেল ওদের থামতে বলার আগেই ঘটে গেল এতকিছু। গরুগুলোকে টেনে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা হলো। পথের ওপর মাটি ফেলে মুছে ফেলা হলো রক্তের দাগ।

এই কাজ শেষ হতে হতেই কয়েকজন জুলু ধরে নিয়ে এল একজন পেট মোটা পুরুষ আর কুৎসিত দর্শন এক বুড়ি মহিলাকে। মহিলাটির চুলের সাথে ঝুলছে মাছের ব্লাডার আর গায়ে জড়ানো সাপের চামড়া। ভোল দেখেই র‍্যাচেল বুঝল মহিলাটি কোন ওঝা বা জাদুকর।

রাগে কাঁপছে মহিলা। রীতিমতো হুকুম ছেড়ে বলল, ‘আমার গরু মারার সাহস করেছে কে? তুমি’ ‘মেরেছ, মেয়ে, লোকে যাকে বলে নোমকুবুলওয়ানা?’

শান্ত স্বরে র্যাচেল বলল, ‘স্বর্গের হুকুমে বড় ষাঁড়টার মৃত্যু হয়েছে। বাকিগুলোর ব্যাপারে রাজার ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতে পার।’

ডোগার দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকতে দেখল ষাঁড়টাকে। মুহূর্তের জন্য ভয়ের ছাপ ফুটল ওর চেহারায়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই রাগে ফেটে পড়ল সে। কারণ জাদুচর্চার কারণে লোকে তাকেই ভয় করে। লোকের ভয় ভেঙে গেলে বিপদ। তাই ঝাঁঝালো কণ্ঠেই সে বলল, ‘জুলুল্যাও পা দিয়েই মৃত্যুদূত ডেকে নিয়ে এসেছে ইনকোসাজানা। ওটাই তার প্রমাণ,’ ষাঁড়টাকে দেখিয়ে বলল সে। ‘অবশ্য এমনটাই চিরকাল হয়ে এসেছে, এবারও তা-ই হবে। আজীবন জেনে এসেছি, জুলা, রক্তে রঞ্জিত তোমার পথ। আজ নিজ চোখে দেখলাম। যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। গিয়ে দেখো, আমি ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি,’ বলে র্যাচেলের ঘোড়াটার লাগাম ধরল সে। উদ্দেশ্য ওটার মুখ ঘুরিয়ে দেবে।

কিন্তু ঘোড়াটাকে সামলাতে গিয়ে র্যাচেলকে ওর হাতের গণ্ডারের শিঙের দণ্ডটা তুলতে হলো ওই মহিলার দিকে। জুলুল্যাও এই ইশারার একটাই অর্থ। তাত্ক্ষণিক বিনা বিচারা, করুণাহীন মৃত্যু। এই ইশারা করার অধিকার রাজা ছাড়া আর কারো নেই। এবং খোদ রাজাই এই অধিকার অর্পণ করেছে ইনকোসাজানার ওপর। সুতরাং “হুকুম” পাওয়ার পর এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট করল না সৈন্যরা। কক্ষা গেঁথে দিল বুড়ির বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জাদুকরীর প্রাণহীন দেহ। এবারও র্যাচেল বাধা দেয়ার বা কিছু বলার আগেই যা ঘটার ঘটে গেল।

সৈনিকরা জিজ্ঞেস করল, ‘বাকিদের কী করব? জাদুকরীর কাছে পাঠিয়ে দেব?’

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেছে র্যাচেল। সামলে নিয়ে কোনরকমে বলল, ‘ওদের জীবন দিলাম।’

ঘোষণাকারীরা ঘোষণা করল, ‘জীবন, শয়তানি কাজ করা জাদুকরীর শিশুদের জন্য জীবন। বাঁচবে ওরা।’

এরপর রওনা হয়ে গেল ওরা। স্তুতিকারীরা র্যাচেলের গুণগান করে গান ধরল। গান গাইতে গাইতেই চলতে থাকল ওরা।

দশ

ইনকোসাজানা হিসেবে এর চেয়ে ভালভাবে জুলুল্যাও প্রবেশ করা র্যাচেলের দ্বারা সম্ভব ছিল না। “বন্য ও বিপজ্জনক” ঘোড়াটা ওকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইল কিন্তু ওটার পিঠে সফলভাবে টিকে রইল র্যাচেল। অথচ ওখানে উপস্থিত সব যোদ্ধাই জানে, ওই অশান্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার সামর্থ্য ওদের কারোই হতো না। এরপর ত্রুক্ষ ষাঁড় আক্রমণ করল র্যাচেলকে। ওর তো কিছু হলোই না, উল্টো ষাঁড়টার মৃত্যু এল স্বর্গ থেকে। র্যাচেলের পথের ওপর দাঁড়াল জাদুকরী, কটু কথা বলল। ফলে মারা পড়ল সে-ও। অবশ্য ওই বুড়ি ওঝা এমনিতেও মারা পড়ত। কারণ রাজা আগেই তার সৈন্যদের

হুকুম দিয়ে রেখেছিল যে, ইনকোসাজানার রাস্তায় কেউ এলে তাকে মরতেই হবে। সৈন্যরা কেবল দেখছিল যে, র্যাচেল কী করে। ওঝার বাজে কথার প্রতিশোধ না নিলে ওরা ভাবত র্যাচেল স্রেফ আর দশটা সাধারণ সাদা মেয়ের মতোই। সুন্দরী এবং ওর মধ্যে সাদাদের জ্ঞান একটু বেশি আছে, এ-ই যা। কিন্তু জুলুদের দৃষ্টিতে এখন প্রমাণ হয়ে গেছে, র্যাচেল সাধারণ কেউ নয়, ও আসলেই ইনকোসাজানা-ই-জুলা।

যেহেতু প্রমাণ হয়েই গেছে তাই বিদ্যুৎ গতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল ওর নাম। ফলে এই ভয়ানক চরিত্রের ছায়া থেকে বের হবার সুযোগ র্যাচেলের আর রইল না।

সূর্যাস্তের সময় ওরা পৌঁছুল একটা পাহাড়ের পাদদেশে। ওটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা একাকী ক্রাল (জুলু ভাষায় ক্রাল মানে ঘর)। প্রস্তাব করা হলো, ইচ্ছা হলে ওখানে রাত কাটাতে পারে ইনকোসাজানা। সম্মত হলো র্যাচেল। ঘরে ঢুকে দেখল ওখানে কয়েকটা নেটিভ মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। ওরাও আছে কেবল ইনকোসাজানার সেবা করার জন্য। ঘরটা বেশ বড়। এবং তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সেটা সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। যা হোক, রাতের খাবার হিসেবে ভুট্টা, টক দই আর মুরগির মাংস পরিবেশন করা হলো।

দই আর ভুট্টা দিয়ে সাপার করল র্যাচেল। মাংসটা পাঠিয়ে দিল ক্যাপ্টেনদের জন্য। তারপর দেখা গেল মেয়েগুলো ওর পাশে থাকতে ভয় পাচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং দেবীকে (!) কে না ভয় পায়।

ওরা চলে গেলে যতটা সম্ভব আরাম করে ঘুমানোর চেষ্টা করল র্যাচেল। একাকী এই পরিবেশে দুই হাজার অসভ্য সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় যতটা ভাল পারা যায় আর কী।

র্যাচেলের মোটেও ভাল ঘুম হলো না। বারবার দুঃস্বপ্ন

দেখল ও। প্রথম কয়েকটা স্বপ্নে সেই জাদুকরী ফিরে এল
বারংবার। প্রতিবার একই কথা বলল সে। বলল, র্যাচেলের পথ
রক্তে রঞ্জিত। যেন নিজের বাড়ি ফিরে যায় ও, গিয়ে যেন দেখে,
সে ঠিক বলেছে নাকি ভুল বলেছে। এই ধাঁধা ও সমাধান করতে
পারল না। বাবা-মাকে নিয়ে আরেকটা স্বপ্ন দেখল ও। দেখল
পাশাপাশি শুয়ে আছে তারা। তাদের চোখ খোলা কিন্তু ওর ডাকে
সাদা দিচ্ছে নড় তাদের কেউ।

ঘুমের ভেতর র্যাচেলের মনে হলো কেউ ওর মুখের ওপর
হাত বুলাচ্ছে। ঝট করে উঠে বসল ও। এবং আবিষ্কার করল
হাতটা হচ্ছে একটা হুঁদুর। পরম আনন্দে ওটা ওর গায়ের ওপর
ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলোকে ঘর থেকে ভাগাল ও। আর ঘুম
আসবে না, ভোরও হয়ে গেছে। তাই হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার
পোশাক পড়ল র্যাচেল। ঠিক তখনই শুনতে পেল, অপরিচিত
ভাষায় মিষ্টি সুরে গান গাইছে বা ছড়া কাটছে একটা মেয়ে।
তবে কথাগুলোর কিছুই ও বুঝতে পারল না। ও তৈরি হতে না
হতেই ঘরে ঢুকল মেয়েগুলো। সকালের নাশতা নিয়ে এসেছে
ওরা। খাওয়া শেষ করে সৈন্যদের খবর পাঠাল যে, রওনা হতে
প্রস্তুত ও। ক্রাল থেকে বের হয়ে দেখল স্যাডল ব্রিডল পরিয়ে
ঘোড়াটাকে প্রস্তুত করে ওটার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে টাম্বুসা।
আগেও দুয়েকবার নাটাল গেছে টাম্বুসা। জানে কীভাবে ঘোড়ার
যত্ন করতে হয়, স্যাডল পরাতে হয়। সৈন্যরাও আগের দিনের
মতো করে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরে দুই ঘণ্টার বিরতি ছাড়া সারাদিনই চলার ওপরই
রইল। একের পর এক জনপদ ওদের চোখে পড়ল। গ্রামগুলোর
ঘর-বাড়ি সব মৌচাকের আকৃতিতে বানানো। কিন্তু দূর থেকে
ওদের বিশাল দলের দেখা পাওয়া মাত্রই “নোমকুবুলওয়ানা,
নোমকুবুলওয়ানা!” চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল গ্রামের

সবাই। স্পষ্টতই জাদুকরী ওঝার মৃত্যুর ঘটনা ওদের কানেও এসেছে। সবাই বুঝে নিয়েছে নোমকুবুলওয়ানার পথে পড়া যাবে না। অতি-পবিত্র আত্মা সে। বিনা ডাকে তার সামনে যাওয়া মানে স্বয়ং মৃত্যুর মুখে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকা। কাজেই কেবলমাত্র হুকুমপ্রাপ্তরা ছাড়া আর কেউ ওর ধারে কাছেও ঘেঁষছে না। সুতরাং এত লম্বা একটা সফর চরম একাকীত্বের মধ্য দিয়ে পার করতে বাধ্য হচ্ছে র্যাচেল।

রাত হয়ে এল। আগের রাতের মতোই একটা একাকী ক্রালে রাত কাটাল র্যাচেল। পরদিন সকালে টাম্বুসাকে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল উমগুনগুঙ্কলোভু আর কত দূর? কখন ওরা ওখানে পৌঁছাবে? (উমগুনগুঙ্কলোভু-এর মানে দাপিয়ে-কাঁপিয়ে বেড়ানো হাতির বাসস্থান। জুলু রাজা ডিনগানের উপাধি দাপানো হাতি, তাই তার প্রাসাদের এই নাম।) টাম্বুসা জানাল সন্ধ্যা নাগাদ ওখানে পৌঁছুবে ওরা।

সন্ধ্যায় সূর্য যখন পাটে নামতে বসেছে, ইউফোরিয়া গাছের বনে পৌঁছুল ওরা। ওখান থেকেই র্যাচেলের চোখে পড়ল পাহাড়ের পটভূমিতে হাজারখানেক ক্রাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড়সড় এক জন-বসতি। আদপে জুলুদের শহর ওটা। পুরো বসতিই দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার ঘেরের ভেতর। বসতির ঠিক কেন্দ্রে আছে বিশাল এক খোলা ময়দান।

ওদের চলার গতি বেড়ে গেল। অন্ধকার জাঁকিয়ে ঝাঁসার আগেই টাউনের মূল ফটকে পৌঁছে গেল ওরা। ঊর্ধ্বে ওদের স্বাগত জানানোর জন্য এখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। এখানে ওরা থামলও না। এগিয়ে যেতে যেতে পৌঁছুল দ্বিতীয় আরেকটা বড় ফটকের সামনে। এটার নাম ইনটুনকুলু। এখানেই রাজার বাসস্থল। ওরা এ পর্যন্ত আসার পরপরই সৈন্যরা সব চলে গেল। র্যাচেলের সাথে এখন আছে কেবল টাম্বুসা। আরো এগিয়ে গেল

ওরা। পার হলো আরেকটা বড় ফটক। এই ফটকের নাম এম্পোসেনি। এটা হচ্ছে রানীদের বাসস্থান। ঘোড়ার পিঠে থাকতেই র্যাচেল দেখল, ঘাসের মশাল হাতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল কজন মহিলা। র্যাচেলকে দেখে রীতিমতো কাঁপছে তারা, কথা বলবে আর কী। ওদিকে সাদা ষাঁড়ের পিঠ থেকে র্যাচেলের ব্যাগ-ব্যাগেজ নামিয়ে রেখে গরু-ঘোড়া দুটোই নিল টাম্বুসা। স্যালুট করে চলে গেল সে। ব্যাগগুলো নিয়ে চলে গেল মহিলাগুলো।

এবার অবশ্য মহিলাগুলোর পেছন পেছন রওনা হয়ে গেল র্যাচেল। গিয়ে দেখল বিরাট এক ক্রালের সামনে এনে রাখা হয়েছে ওর ব্যাগগুলো। তবে মহিলারা নেই। ক্রালের প্রায় সর্বত্রই জ্বলছে কুপিবাতি। কুপিগুলোর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে জলহস্তির চর্বি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলাগুলো ফিরে এল। সাথে করে খাবার আর পানি নিয়ে এসেছে তারা। হাত পা ভাল করে ধুয়ে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি দূর করল র্যাচেল। তারপর আঁচড়ে পরিপাটি করে নিল চুলগুলো। বেশ ক্ষুধা থাকায় খেয়ে নিল যতটুকু সম্ভব। অনুমান করল, অনেক ধকল ষাবে আজ রাতে। তাই বিছিয়ে রাখা কয়েক প্রস্থ ক্যারোসের ওপর নিজেকে গড়িয়ে দিল ও।

আনুমানিক দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েছে র্যাচেল, তন্দ্রা মতো এসে গেছে। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল ওর। ওর পাশে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসল লম্বা এক নারী। সে বলল, 'ইনকোসাজানার জয়! রাজা জিজ্ঞেস করেছেন, আজ রাতে তার সামনে হাজির হতে ইনকোসাজানা নাখোশ হবেন না তো?'

র্যাচেল জবাব দিল, 'না, খুশি মনেই রাজার সাথে দেখা করব আমি।'

সুতরাং মহিলাটির পিছু নিয়ে রাজার সাথে দেখা করার জন্য

রওনা হলো র্যাচেল। গোলকধাঁধার মতো নলখাগড়ার বেড়ার দেয়াল পার হয়ে বড়সড় একটা খোলা ময়দানের সামনে হাজির হলো ওরা। মাঝের চন্দ্রালোকিত জায়গার পর রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন একটা জায়গা। ওখানে পশমি ক্যারোস গায়ে মাটিতে বসে আছে বেশ কিছু লোক। র্যাচেল বুঝল ওখানেই কোথাও আছে ডিনগান।

কয়েক কদম হেঁটে পৌঁছে গেল আলোকিত জায়গাটির কেন্দ্রে। চাঁদের আলোয় সত্যিই রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে ওকে। চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। ডানের আর বামের সবগুলো লোক একসাথে উঠে দাঁড়াল। সবাই ডান হাত তুলে সালাম জানাল র্যাচেলকে। তবে মাঝখানে বসা লোকটি উঠলও না, কোন কথাও বলল না। এভাবেই কেটে গেল স্নায়ুক্ষয়ী লম্বা ছয় সাতটা মিনিট। র্যাচেলও মুখ বন্ধ রাখল। ও জানে, জুলুদের চোখে নিচু শ্রেণীর লোকই প্রথমে কথা বলবে। তবে স্যালুটের জবাব দিতে গভীরের শিং দিয়ে বানানো লাঠিটা তুলল ও। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ওর চুলের ওপর পড়ল চাঁদের আলো। রীতিমতো চমকতে থাকল চুলগুলো।

এবার রাজা ভয় পেয়ে গেল যে, ইনকোসাজানা গায়েব হয়ে যেতে পারে বা চলে যেতে পারে চিরতরে। কাজেই মুখ খুলল সে। একটু বিরক্তি, একটু সম্ভ্রম মাখা স্বরে গম্ভীরভাবে বলল, ‘আমি ডিনগান, আমাজুলুদের রাজা। বলুন, শ্বেতাস্বিনী, আপনি কে?’

পালটা প্রশ্ন করল র্যাচেল, ‘আমাকে এখানে কী নামে ডাকা হয়, রাজা ডিনগান?’

‘অনেক উঁচু একটা নামে ডাকা হয় আপনাকে, শ্বেতাস্বিনী। যে নাম খুব কম লোকই মুখে নিতে পারে। নামটা হচ্ছে

ইনকোসাজানা-ই-জুলা। জুলু জাতির আত্মা নোমকুবুলওয়ানার আরেক নাম এটা। বলুন, কী করে এই নামটা আপনি পেয়েছেন।’

‘তাহলে তো আমার নাম আপনারা জানেন, রাজা।’

‘আমরা জানি, বাতাসের কাঁধে করে এক গল্প ছড়িয়েছে। বনের পাতার কানে কানে গল্পটা বলে গেছে মৃদু বাতাস। পানিতে জন্মানো নলখাগড়াও তা শুনেছে আর শুনেছে জমির ঘাস। আমরাও শুনেছি। জেনেছি, খোদ স্বর্গ থেকে এসেছে আপনার এই নাম, ও, নোমকুবুলওয়ানার আত্মার ধারক, স্বর্গের সন্তান,’ বলল রাজা।

‘তা তো আপনি বলছেন, রাজা। আমি কখনোই বলিনি,’ বলল র্যাচেল।

‘হ্যাঁ, আমিই বলেছি। কারণ চোখের সামনে আপনাকে দেখেই বুঝেছি এই গল্প স্রেফ গল্প নয়, সত্য। কারণ আপনার ভেতরের সৌন্দর্য কেবলই নারী সুলভ সৌন্দর্য নয়। সুন্দরী নারী আমাদেরও আছে। কিন্তু অরা শুধুই নারী। তাই ঘোষণা করছি, আমার দূতেরা অতীতে যে খবর নিয়ে এসেছে তা ভুল নয়, সত্য, খুবই সত্য। তাই আজ থেকে আমার পাশে বসে এই দেশ শাসন করবেন আপনি। এই দেশ আপনার। আমার সৈন্যরা আপনার সৈন্য, আপনার হুকুমের অপেক্ষায় সদাপ্রস্তুত রইবে তারা। জীবন ও মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার স্থায়ীভাবে অর্পিত হলো আপনার হাতে। হুকুম করুন, বিনা দ্বিধায় যে কারো প্রাণ নিতে ছুটবে সৈন্যরা। আবার আপনার হুকুমে বিনা দ্বিধায় ফিরে আসবে যে কোন জল্লাদ। এই রাজ্যের সমস্ত কালো মানুষ আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকবে চিরকাল। তবে এই শাসন কেবল কালোদের ওপর খাটবে, সাদাদের ওপর নয়।’

‘শুনেছি,’ রাজা। এবার আপনার কথা রক্ষা করুন। আপনার

কথামতো এসেছি আমি। এবার আমার হাতে তুলে দিন মৃত সেয়াপির কন্যা, আমার দাসী নোয়িকে। আমার বাড়ি রামাহ থেকে সৈন্যরা ওকে তুলে নিয়ে এসেছে। আপনার শর্ত মেনেছি আমি, রাজা। এখন আপনার কথা রাখার পালা। ওকে আমার হাতে তুলে দিন।’

রাজা বলল, ‘নোয়ি মারা গেছে। কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু ঘটেছে ওর।’

ধড়াস করে উঠল র্যাচেলের বুক। কথাটা কি সত্যি? হয়তো ওকে ফাঁদে ফেলে এ পর্যন্ত আনার জন্যই এই রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে। অথবা, হয়তো ও আসলেই ইনকোসাজানা কি না, তা জানার জন্য ওর ক্ষমতার পরীক্ষা নিচ্ছে ওরা। তবে, রাজা ও অন্যরা যাকে আত্মা বলে বিশ্বাস করে (অন্তত বিশ্বাস করতে চায়!), তার সাথে মিথ্যা ওয়াদা করবে না বলেই মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে এসব ভাবল ও। সিদ্ধান্ত নিল, তর্কে যাবে না, যা বলার সরাসরি বলবে। তাই বলল, ‘নোয়ি জীবিত। জুলুল্যাণ্ডের সমস্ত বর্ষাকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোনটাই বলেনি, ওর রক্ত লেগেছে সেটার গায়ে।’

রাজা বলল, ‘ঠিকই বলেছেন। কোন বর্ষা ওকে বিদ্ধ করেনি। নদীতে ডুবে মরেছে ও।’

নোয়ির বেঁচে থাকা নিয়ে র্যাচেল এবার নিঃসন্দেহ, তাই দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ‘আমি পানিকে জিজ্ঞেস করেছি, কুমিরকে প্রশ্ন করেছি। তারা সবাই বলেছে নিরাপদে চলে গেছে নোয়ি।’

‘এবারও ঠিক বলেছেন, শ্বেতাঙ্গিনী। নোয়ি মরেছে পাশের ঘরে রশিতে ঝুলে।’

‘নোয়ি, তোমার শব্দ শুনছি, গন্ধ পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। এসো, বের হয়ে এসো,’ হুকুম দিল র্যাচেল।

সত্যি সত্যি বের হয়ে এল নোয়ি। মাটিতে বুক ঘষটে

এগিয়ে এল। রাজা বা আর কারো দিকে ফিরেও তাকাল না। সোজা চলে এল র্যাচেলের সামনে। এসে র্যাচেলের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। খুশিতে নেচে উঠল র্যাচেলের বুক। ওর মন চাইল মেয়েটার কপালে চুমু খায়। কিন্তু নিজেকে সামলাল। কারণ এমনটা করলে জুলুদের চোখে ওর অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। তাই গম্ভীর স্বরে ও বলল, ‘স্বাগতম, নোয়ি। আমার ছায়ায় বসো, এখানে তুমি নিরাপদ। বলো, এই লোকগুলো তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে তো?’

‘রাজার ক্রালে পৌঁছার পর কেউ খারাপ আচরণ করেনি। তবে পথে ওই ইন্দুনা আমাকে আঘাত করেছে, কেড়ে নিয়েছে আমার খাবার,’ বলে ছায়ায় বসে থাকা একজনের দিকে আঙুল তুলল নোয়ি।

রেগে গেছে র্যাচেল। হাতের ভেতর মোচড় খাচ্ছে ওর গঙারের শিঙের দণ্ডটা। ওদিকে ভয়ে লোকটার কাঁপুনি ছুটে গেছে। কারণ সে খুব ভাল করেই জানে, ওই দণ্ড তার দিকে তোলার অর্থ মুহূর্তের ভেতর মৃত্যু। উঠে দাঁড়াল লোকটি। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ইন্দুনাটি।

‘আমার ভৃত্যের গায়ে হাত তোলার সাহস তোমার হলো কী করে? বলো, কী বলার আছে তোমার,’ রাগত স্বরে বলল র্যাচেল।

কম্পিত কণ্ঠে লোকটি বলল, ‘রাজার আদেশ ছিল, মেয়েটিকে তার সামনে হাজির করতে হবে, ও, ইনকোসাজানা। কিন্তু মেয়েটি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল, আমার দোষ কী? দয়া করুন, প্রাণদণ্ড দেবেন না, আপনাকে কাছে প্রার্থনা করছি আমি।’

‘রাজা, এই লোকটির ওপর আমার জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত

নেয়ার ক্ষমতা আছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, আছে। আপনার ইচ্ছা হলে ওকে মেরে ফেলুন,’ বলল রাজা।

র্যাচেল বলল, ‘নোয়ি, ও তোমাকে মেরেছে, আমাকে নয়। কাজেই সিদ্ধান্ত তুমিই নাও, আজ জীবিতদের মধ্যে ও রাত কাটাবে, না মৃতদের সাথে চলে যাবে সূর্যের ওপারে?’

হাতের একটা কাটা দাগের দিকে চাইল নোয়ি তারপর চাইল লোকটার দিকে। সাথে সাথেই লোকটা র্যাচেলকে ছেড়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরল নোয়ির পা। দয়া ভিক্ষা চাইতে থাকল। বলল, ‘তুমি তো জীবন পেয়েছ, এবার আমাকেও জীবন দাও, নয়তো দুর্ভাগ্য নেমে আসবে তোমার ওপর।’

নোয়ি তখন বলল, ‘টেঙুলা পার হবার সময় আমাকে কী বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে, আমার বুকে বর্ষার ফলা বসাতে পারাটা হবে তোমার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। জবাবে আমি কী বলেছিলাম, তা কি মনে আছে, ইন্দুনা? আমি বলেছিলাম, আমার দিকে বর্ষা উঠানোর আগেই ফলাটা তোমার দিকে ঘুরে যাবে। তখনই আমাকে আঘাত করেছিলে তুমি,’ বলে টেনে পা ছুটিয়ে নিল নোয়ি। তারপর মাড়িয়ে দিল লোকটার মুখ।

রাজা আর বাকি ইন্দুনারা ধরে নিল, সব শেষ। ওর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু র্যাচেলের মনে ভিন্ন চিন্তা। ও ভাবছে নোয়ি যা-ই করুক, লোকটাকে বাঁচাবে ও।

নোয়ি তখনও বলে চলেছে, ‘সাহসী বীর পুরুষটি কোথায় এখন? একটা মেয়ের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এখন বাধছে না তোমার? তবে আমি নিষ্ঠুর নই। এখানে এখন এসেছ, দেখেছি তোমার কাছে ছুটে এসেছে তোমার স্ত্রীরা। আর ছিল একটা মেয়ে, আমার বয়সী তোমার মেয়ে। কেবল ওই মেয়েটার জন্য

আজ বেঁচে গেলে, ইন্দুনা। মেয়েটাকে আমি এতিম করতে চাই না, তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তবে তোমার জন্য একটা উপাধি ঘোষণা করছি আমি। আজ থেকে সবাই তোমাকে চিনবে, “নারীর গায়ে হাত তোলা সৈনিক” নামে।’

দু’হাতে মুখ ঢেকে অধোবদনে দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল সে। সম্ভবত ভাবল, ইনকোসাজানা বা নোয়ি যে কোন সময়ে মত পরিবর্তন করে আবার তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারে। তবে এই ঘটনার পর লোকটি আর সেখানে থাকেনি। কারণ নামটি ওর জন্য একটু বেশিই অপমানজনক হয়ে গিয়েছিল। তাই পরিবার পরিজন নিয়ে জুলুল্যাণ্ড ত্যাগ করে সে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটল সেই ইন্দুনা পর্বের।

যা হোক, এবার মুখ খুলল ডিনগান। বলল, ‘আপনার জাদু খুব শক্তিশালী, ইনকোসাজানা। অন্ধকারের বুক চিরে দেখতে পায় আপনার চোখ। ঘরের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখা নোয়িকেও খুঁজে বের করেছে, হাজির করেছে সবার সামনে। কিন্তু জেনে রাখুন, ও আপনার নয়, আমার জন্য নির্ধারিত। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগেই ও আমার বৌ হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর পালিয়ে যাওয়ার অপরাধেই আমার হুকুমে ওর পরিবারের সবাইকে কতল করা হয়।’

‘ঠিক। কিন্তু মেয়েটাকে আপনি খুন করতে পারেননি, কারণ ওকে রক্ষা করেছি আমি,’ বলল র্যাচেল।

‘সেটাও শুনেছি আমি। আকাশ থেকে বজ্রপাত নামিয়ে এনেছেন আপনি। বাজের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমার সৈনিক। তাই পরে এই মেয়ের অনুসরণকারীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।’

‘হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে বাজ ডেকে এনে আপনাকেও পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারি আমি, রাজা ডিনগান।’

এবার ডিনগানের চেহারা ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ। কিন্তু তারপরও অস্বস্তিকর ব্যাপারে কথা বলা বাদ দ্বিতে চায় এমন একটা ভঙ্গি করল রাজা। মুখে বলল, ‘তারপরও, এই মেয়ে আমার। আমিই ওকে রাখছি।’

র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘নোয়ি যে আমার আশ্রয়ে আছে সেটা আপনি কীভাবে জেনেছেন?’

দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা হলো রাজার। দেখে র্যাচেল নিজেই আবার বলল, ‘ইবুবেসি বলেছে, তাই না?’

ইতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল ডিনগান। তখন র্যাচেল আবার বলল, ‘সে-ই আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছে যে, আমাকে আসতে বলবেন আপনি। তারপর আমি না এলে ওকে মেরে ফেলবেন আর এলে ওকে বৌ করার কথা তুলবেন। বা আপনার যা ইচ্ছা করবেন। তাই না, রাজা?’

‘কিছুই দেখছি আপনার অজানা নেই!’ মন্তব্য করল রাজা।

‘এখনও কি “যা ইচ্ছা” করার চিন্তা আপনার মাথায় আছে?’ বলতে বলতে হাতে থাকা শিঙের লাঠিটা নাড়তে শুরু করেছে র্যাচেল।

ব্যাপারটা রাজারও নজরে এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি সে বলল, ‘না না, আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আপনি না এলে ওকে মরতেই হতো। কিন্তু আপনি এসেছেন, ও, ইনকোসাজানা, নোমকুবুলওয়ানার আত্মার ধারক। আপনার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে ও, পরেছে আপনারই পোশাক। তাই ও আপনার। আপনি যেমন পবিত্র, আজ থেকে ওকেও আমরা তেমন পবিত্র বলে গণ্য করব।’

আর কথা বাড়াল না র্যাচেল। হাতের একটা ইশারা করল, যার অর্থ দাঁড়ায়, ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি। তারপর হঠাৎ ও প্রশ্ন করল, ‘কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে আমার পরামর্শ

দরকার বলে জানিয়েছিলেন রাজা। বিষয়টা কী?’

রাজা জবাব দিল, ‘সেটা তো এতক্ষণে আপনার জ্ঞানের আলোয় জেনেই গেছেন।’

‘হয়তো। কিন্তু তবুও সেটা আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। এবং এখনি,’ বলল র্যাচেল।

ইন্দুনাদের সাথে মুহূর্তখানেক পরামর্শ করে তারপর সে বলা শুরু করল, ‘ব্যাপার খুব গম্ভীর, জুলা। আপনার দিক নির্দেশনা দরকার আমাদের। এটাই ছিল আমাদের ওঝাদের পরামর্শ। নাটালের সাদা লোকদের সাথে জুলুদের লড়াইয়ের কথা আপনি জানেন। সেই যুদ্ধে আমাদের আর সাদাদের উভয়েরই অনেক সৈন্য মারা পড়েছে। তবে অতীত ভুলে ইংলিশদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছি আমরা। কিন্তু এখন কেপ থেকে নতুন উপদ্রব আমাবোপারা (ডাচ বোয়েরদের জুলু ভাষায় বলে আমাবোপা) এসেছে। মোসিলিকাটজে নামে আমার এক বেইমান সাবেক ক্যাপ্টেনের সাথেও তাদের লড়াই হয়ে গেছে। বহু লোক হারিয়েছে মোসিলিকাটজে। সাদা মানুষের অস্ত্র ব্যবহার করে আমাবোপারা। সেটা থেকে বজ্রপাত ঘটায়। মোসিলিকাটজের হাজার খানেক সৈন্য মেরে ফেলেছে ওরা। হুমকি দিয়েছে আমাদের দিকেও এগিয়ে আসবে বলে। বলেছে আমাদের দেশ গিলে খাবে ওরা। ও, দেবীর আত্মা, বলুন, এখন কী করব? ওরা অপ্রস্তুত থাকা অবস্থায়ই ওদের ওপর আমার সৈন্যদের গুলিয়ে দেব? নাকি এখানেই অপেক্ষায় থাকব? তারপর ওরা আগে আক্রমণে গেলে তারপর নামাব আমার সৈন্যদের? দয়া করে ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন, ও, জুলা। আপনার কণ্ঠের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। আরেকটা কথা, আমরা আগে যে এই দেশ শাসন করে গেছে, যার নাম নেয়া যাবে না, সেই সিংহ তার শেষ সময়ে এই দেশ আর এর অধিবাসীদের নিয়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী

করে গেছে, সেই কথাও মাথায় রাখা দরকার।’

‘ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাকে শোনানো হোক।’

এক ইন্দুনার দিকে ইশারা করে তাকে সামনে আসতে বলল রাজা। ‘ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তুমি জানো। জুলার কানে কথাগুলো পৌঁছে দাও।’

র্যাচেল খেয়াল করল, লোকটির গায়ে কম্বল জড়ানো। এবং কম্বলের অংশ দিয়ে ঢাকা তার মাথা। এগিয়ে আসতে আসতে কম্বলটি আরো শক্ত করে পেঁচিয়ে নিল সে। র্যাচেল দেখল, লোকটার একটা হাত সাদা। যেন আগুনে পুড়ে অমনটি হয়েছে। সামনে এলে পরে লোকটিকে ও বলল, ‘বলো।’

লোকটি তখন বলল, ‘আমার নাম ধরে ডেকে হুকুম করুন, হুকুম তামিল করব আমি।’

এই কণ্ঠও র্যাচেলের মনে আছে। নির্বিকারভাবে তাকিয়ে ও বলল, ‘কোন্ নামে তোমাকে ডাকব, রাজার খুনি? মোপো নাকি উমবোপো? দুটোই তো তোমার নাম।’

কম্বল মোড়ানো লোকটি বিস্মিতভাবে মাথা তুলল। রাজাও কেমন হতচকিত অবস্থায় পড়ে গেছে। র্যাচেল বলে চলেছে, ‘আমাকে উপহাস করতে চাইছ কেন? কম্বলের আড়ালে গেলেই কি রামাহ-তে দেখা চেহারাটি আমি ভুলে যাব, রাজার মুখ?’

মাথা থেকে কম্বলটা নামিয়ে ফেলল সে। বলল, ‘দেখাই যাচ্ছে তা সম্ভব না। আমাদের জাতির আত্মাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখা সেই চেহারাটি ছিল অনেকটাই আপনার মতো। বলতে পারেন স্বপ্নে কী দেখেছিলাম আমি?’

র্যাচেল বুঝল লোকটি ওর সাথে আগে কথা বললেও এখনো ওকে বিশ্বাস করেনি। একই সাথে মোপোকে নিয়ে নোয়ির বলা গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বলল, ‘পারি। তবে একটা নয় তিনটা স্বপ্ন দেখেছ তুমি। এখন সম্ভবত তৃতীয়টির কথা

জানতে চাইছ? ডুগুজা নামের ক্রালে থাকতে দেখেছ যেটি। তখন বজ্রবিদ্যুতের পোশাক গায়ে ঝড়ের সওয়ারীতে চেপে বজ্রদণ্ড হাতে তোমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে ইনকোসাজানা।’

‘হ্যাঁ, জুলা, এই স্বপ্নটার কথাই আমি বলছিলাম। কিন্তু, কিন্তু...আপনি আমাকে বলেছেন সাধারণ এক নারী আপনি, তাহলে এত কিছু কীভাবে জানলেন?’

‘হয়তো, আমি একই সাথে নারী আবার এক মহান আত্মা। হয়তো অতীত এসে আমার কানে কানে এই ঘটনার গান শুনিয়ে গেছে। তবে অতীতের অনেক কণ্ঠ। অনেকভাবে কথা বলে সে। আর যেহেতু আমি এখন মানবীর রূপে রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করে আছি। তাই সেসব কথার সব কিছু আমি শুনতে পাই না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি যে, তোমার মনের কথা কিছু শুনতে পাই কিনা,’ বলে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল র্যাচেল। তারপর বলা শুরু করল, ‘আহ্, মনে হয় কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। বালেকা নামে তোমার এক বোন ছিল, তাই না? একসময় তাকে মহান কালো রাজার ঘরে ঢুকতে হয়। একটা পুত্র সন্তানও হয়েছিল তার। তাতিয়ানা ক্রিফের ওপর মারা গেছে সে। বলব, কীভাবে সে মারা গেছে?’

কেঁপে উঠে মোপো বলল, ‘না না, জুলা, আর বলতে হবে না!’

‘ঠিক আছে, তা-ই হোক। তবে বলে রাখি, বালেকা মারা যাওয়ার আগে তার কাছে একটা ওয়াদা করেছিলে তুমি। আর ডুগুজা নামের ক্রালে সেই ওয়াদা পূরণ করেছে তুমি আর যুবরাজ উমলাঙ্গানা। আরো এক যুবরাজ ছিল তোমাদের সাথে। তার নামটা আমি ভুলে গেছি।’ রাজা ডিনগান দুই হাতে তার মুখ ঢেকে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে র্যাচেল বলল, ‘আর আপনি, রাজা ডিনগান, আপনি কথা রেখেছেন অ্যাসেগাই দিয়ে। দেখি,

আপনার ভেতরটা দেখতে দিন। এই তো পেয়েছি, ছোট একটা অ্যাসেগাই, লাল কাঠ দিয়ে বানানো ওটার হাতল। অনেক, অনেক রক্ত পান করেছে এই অ্যাসেগাইটা (নাডা দ্য লিলি দ্রষ্টব্য)।’

রাজার কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল নিচু একটা আতঙ্কিত আর্তনাদ। একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখাল ইন্দুনাদের কাউন্সিল। আর মোপো এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন ঝড়ো হিমেল হাওয়া বইছে ওকে ঘিরে। ‘ক্ষমা করুন, দয়া করে ক্ষমা করে দিন, জুলা। আপনার ক্রালে যেদিন দেখেছি সেদিন আপনি নিজেও বলেছেন আপনি কেবলই একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী। আমিও তাই ভেবেছি সুন্দরী, সাহসী ও সাদাদের জ্ঞানে জ্ঞানী একজন নারী আপনি। কিন্তু এখন আমি জানি, আপনি অবশ্যই আমাদের জাতির আত্মা, নইলে এসব গোপন কথা কীভাবে জানবেন?’

ছায়ায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে নোয়ি। তবে র‍্যাচেলের চেহারা একদম গম্ভীর। নীরব হয়ে আছে ও।

মোপো বলল, ‘কালো জনের (সাবেক জুলু রাজা চাকা) বলা শেষ কথাগুলো বলার হুকুম করা হয়েছে আমাকে। কিন্তু সবই যেহেতু আপনার জানা, তাই ওসব বলে আর লাভ কী? তবুও বলি। ছুটন্ত একদল সাদা লোকের পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল সে। বলে গেছে জুলুদের সন্তানদের পিষে ফেলবে এরা, দেশছাড়া করবে জুলুদের সন্তানকে।’

‘না, আমার মনে হয় একটা কথা বাদ দিয়ে গেছ তুমি। কথাটা ছিল, “যেখানে আমাকে হত্যা করবে মোপো”, তাই না?’ বলল র‍্যাচেল (নাডা দ্য লিলি দ্রষ্টব্য)।

ওঙিয়ে উঠল রাজা। কারণ এই কথাগুলো তার কানেও গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল রাজা আর মোপো। মোপোকে কাছে ডাকল র‍্যাচেল। ও এলে পরে নিজের ক্লোকের

একটা প্রান্ত দিয়ে ওর মাথা ঢেকে দিল র্যাচেল। মোপোর কানে কানে কিছু কথা বলল ও। সাথে সাথেই আর্তনাদ করে সরে গেল মোপো। ছুটে পালাল ওর সামনে থেকে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওর দিয়ে তাকিয়ে রইল রাজা।

র্যাচেল তখন বলল, ‘ওর কিছু গোপন ব্যাপার আছে। তবে আমাকে বা ওকে প্রশ্ন করার দরকার নেই। একবার এক কুঁড়েতে বসে দুই প্রিন্সের সাথে কিছু একটা নিয়ে দর কষেছিল মোপো। তাদের একজন জীবিত আর একজন মৃত।’ আকাশের দিকে ইশারা করে বলে চলল র্যাচেল, ‘এসো, এগিয়ে এসো, মৃতদের জগৎ থেকে উঠে এসো, সেন্সাঙ্গাকোনার সন্তান, বলে যাও, মোপোর সাথে তুমি আর তোমার ভাই কী চুক্তি করেছিলে?’

এবার উঠে দাঁড়াল রাজা ডিনগান। তার কালো ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বাঁশ পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে সে। মনে পড়ে গেছে ক্রালের ভেতর বসে উমলাংগানা, তার আরেক ভাই আর মোপোর সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। কম্বলের নীচে মাথা ঢেকে বসে তাদের ভাই, তৎকালীন জুলু রাজা চাকাকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল তারা।

খাবি খেয়ে উঠে দাঁড়াল ডিনগান। বলল, ‘সব, সব জানেন আপনি, ইনকোসাজানা। অবশ্যই আপনি নোমকুবুলওয়ানা। ক্ষমা করুন, দয়া করে ক্ষমা ভিক্ষা দিন আমাদের। কোন সন্দেহ নেই, অতীত খুঁড়ে আমাদের সমস্ত অপরাধের বয়ানই আপনি বের করে আনতে পারবেন। পারবেন সেই অতীতের জীবিত প্রাণীর মতো আমাদের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে।’

খানিকটা উপহাসের সুরেই র্যাচেল বলল, ‘না না, আমি সাধারণ এক শ্বেতাঙ্গ নারী ছাড়া আর কিছু নই। আর দশটা মেয়ের মতোই আমি খাই, পান করি, ঘুমাই। টেঙলা নদীর ওপারেই বাস করে আমার বাবা-মা। রাজা, আপনি আর

আপনার ক্যাপ্টেনরা সবাই মনে রাখবেন, এই মুহূর্তে সাদাদের জ্ঞানের আলো পাওয়া স্রেফ একজন শ্বেতাঙ্গ নারী আমি। তবে, যদি মারা যাই, কোন সন্দেহ নেই আত্মা হয়ে যাব আমি। আপনার, আপনার ক্যাপ্টেন বা যার হুকুমেই বা যার হাতেই মারা যাই খুব খারাপ রূপ নিয়ে ফিরে আসব আমি। যার হাতেই আমার রক্ত থাকবে, তার শেষ দেখে ছাড়ব আমি।’

কাঁপতে কাঁপতে রাজা ডিনগান বলল, ‘জানি, জুলা, আমরা জানি। দয়া করুন, আমাদের অজ্ঞতা নিয়ে আর উপহাস করবেন না। আমরা জানি, আপনিই নোমকুবুলওয়ানা। আগুন যেভাবে চকমকির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, সেভাবে সাধারণ এক নারীর খোলসে নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন আপনি। নিঃসন্দেহে চকমকির ফুলকির আড়ালে লুকিয়ে থাকা ধ্বংসাত্মক অগ্নিসম আপনার রূপ। যে সেই চকমকিতে পাথর ঠুকতে যাবে দুর্ভাগ্যের পাহাড় নেমে আসবে তার ওপর। এখন, ও, জ্ঞানী, আপনার জ্ঞানের আলোয় আমাদের পথ দেখান। বোয়েরদের ওপর আমি আক্রমণ করব, নাকি ওদের এগিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকব বলে দিন, ও, জুলা।’

মাথা তুলে আকাশের দিকে চাইল র্যাচেল।

ওকে মাথা তুলতে দেখে গুঞ্জন শুরু হলো ইন্দুনাদের কাউন্সিলে। নিচু স্বরে একজন বলল, ‘স্বর্গের সন্তান ইনকোসাজানা, তাই স্বর্গের সাথে পরামর্শ করছে সে।’

লোকটা এই কথা বলতে বলতেই আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ছুটে এল একটা উল্কাপিণ্ড। রাজার ক্রাল উমগুনগুঙ্কলোভুর ওপর এসে আকাশের বুকে মিশে গেল সেটা।

ইন্দুনাদের আরেকজন তখন বলল, ‘ইনকোসাজানার কাছে আসা স্বর্গের দূত এটা। তার চুলে ওই তারার প্রতিফলন দেখেছি আমি।’

প্রথমে কথা বলা ব্যক্তিটি তখন বলল, ‘না, এটা আমাজুলুদের অভিভাবক ভূত “এহ্লোস”, সে এল আর মারা পড়ল।’

তৃতীয় আরেকজন বলল, ‘না, এটা আমাবুনা (বোয়ের)। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসছে ওরা। ওরা আসবে আর আমাদের সৈন্যদের হাতে মারা পড়বে সবাই।’

এত কথা হচ্ছে, কিন্তু সেসবের দিকে ডিনগানের কোন দ্রক্ষেপও নেই। র্যাচেলকে আবার সে প্রশ্ন করল, ‘কী দেখতে পেলেন, ইনকোসাজানা? বলুন...’

‘না, কী দেখেছি তা বলব না। তবে আপনার আগের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, “যে-ই বর্ষা তুলবে, বর্ষার আঘাতেই প্রাণ হারাবে সে।”’

কথাটা শুনে ক্যাপ্টেনদের মধ্য থেকে অসম্ভষ্ট গুঞ্জন উঠল। কারণ লড়াই আশা করছিল তারা। তারা বুঝল, বোয়েরদের সাথে শান্তির পরামর্শ দিচ্ছে জুলা। তবে কেউ কেউ আবার ভাবল, র্যাচেলের কথার অর্থ হচ্ছে, ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে বোয়েররাই মারা পড়বে। রাজাও মাথা নামিয়ে নিয়েছে। তাদের অসম্ভষ্ট চেহারা দেখে র্যাচেল বুঝল, লড়াই ঠেকানো সম্ভব না। যুদ্ধ হবেই। তাই আবার বলল, ‘ওই তারাটা ছুঁড়েছে মানুষের প্রভু স্বয়ং উমকুলুনকুলু। তাই বর্ষা যখন কারো দিকে তাক করা হবে, সেই বর্ষাই খুঁজে নেবে নিষ্ক্ষেপকারীর ক্ষতপিত্ত। যা বলার ছিল আমি বলেছি। এখন সিদ্ধান্ত আপনার। যা হবার তা হবেই।’

তারপর মাটির দিকে কান পাতল র্যাচেল। যেন মাটি থেকে আসা কোন কিছু শুনতে পাচ্ছে ও। তার কয়েক মুহূর্ত পর সোজা হয়ে বলল, ‘মহান সিংহ, সাবেক রাজার শেষ কথাগুলো কী ছিল? মনে হচ্ছে মাটি আর পাহাড়ের ওপর ছুটন্ত লোকদের

পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি আমিও। পেছনে রক্তের নদী বইয়ে আসছে তারা। কিন্তু তারা সাদা না কালো? যা হোক, যা বলার বলেছি। এ-ই প্রথম এবং এ-ই শেষ। সাদাদের সাথে কালোদের লড়াই-যুদ্ধের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না,' বলে ধীরে ধীরে দৃষ্ট পদক্ষেপে কাউন্সিলের সামনে থেকে চলে এল র্যাচেল। আর মাথা নুইয়ে ওর পেছন পেছন চলে এল নোয়ি।

এগারো

ঘরে ফিরে এল দুজনে। দরজা বন্ধ করার পর নোয়িকে জড়িয়ে ধরল র্যাচেল। প্রিয় বাস্কবীটির কপালে চুমু খেল ও। কিন্তু র্যাচেলের কপালে চুমু দেয়ার বদলে ওর হাতটা নিয়ে নিজের কপালে ঘষে দিল নোয়ি।

‘আমাকে চুমু দিলে না কেন, নোয়ি?’

‘কীভাবে দিই, ইনকোসাজানা, আমি তো আপনার ভৃত্য ছাড়া আর কিছু নই। তবুও মূল্যহীন এই ভৃত্যের প্রাণই আপনি দুই দুই বার বাঁচিয়েছেন,’ বলল নোয়ি।

‘ইনকোসাজানা নামটা শুনতেও এখন বিরক্তি বোধ হয়, নোয়ি। সত্যিই আমি তোমার মতোই সম্মারণ একটা মেয়ে। ইনকোসাজানার চরিত্রে বাধ্য হয়ে অভিনয় করছি কিন্তু ব্যাপারটাকে ঘৃণা করি আমি,’ বলল র্যাচেল।

‘ঘৃণা করেন আর যা-ই করেন, অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী উপাধি এটা। সত্যি বলতে উপাধির উপযুক্ত খেলাই দেখিয়েছেন আজ। দুইবার, না, অন্তত তিনবার আমার মনে হয়েছে, আপনি নিজেকে সাধারণ বলেন বটে, কিন্তু আসলেই কি আপনি সাধারণ? দেখতে শুনতে আপনি আর দশটা মেয়ের মতোই, তারপরও অসাধারণ সুন্দরী। সেটাও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু জ্ঞানের আলো কোথা থেকে পান বলতে পারবেন? রাজা আর তার কাউন্সিল কেন আপনাকে ভয় পেল? আপনি নিজে কেন কাউকেই ভয় পান না? আমার স্বপ্নে বারবার আপনার সম্বন্ধেই কথা বলে আমার বাবা। কিন্তু কেন? কী আছে আপনার মধ্যে যা আপনাকে জুলুদের চোখে এত পবিত্র বানিয়েছে? কোন্ শক্তি “এভাবে” আপনাকে দিয়ে সত্যি বলায়? সাদা কালো, যে কোন মেয়ের থেকেই আপনি ভিন্ন, জুলা। কিন্তু কেন? বলতে পারবেন?’

‘জানি না, নোয়ি। কখনো কখনো মনে হয়, কেউ বা কিছু একটা যেন আমাকে বলে দেয়, এ-ভাবে বলো, ও-ভাবে বলো। তবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, সহজেই আমি জুলুদের চিন্তাধারা বুঝতে পারি। তার ওপর ওদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন কিছু কথা আমাকে জানিয়েছে তুমি। সেগুলোও আমার মনে ছিল। সময় বুঝে ওগুলোই বলেছি, এ-ই যা।’

‘বুঝলাম, কিন্তু মোপোকে গোপনে কী বললেন, লেডি? হেসে ফেলে র্যাচেল বলল, ‘তেমন কিছু না। শুধু জিজ্ঞেস করেছি, আগের রাজাকে তো মেরেছ, এই রাজার সাথেও অমন কিছু করার ইচ্ছা আছে নাকি...’

‘আহ, তাহলেই বুঝুন! অমন কিছু আপনাকে কখনোই আমি বলিনি।’

‘না, তা বলোনি বটে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে। এক

মুহূর্তের জন্য ওর মন পড়তে পারছিলাম আমি। ঠিক তেমন রাজার মনও পড়েছি। রাজা ভয় পায় মোপোর্কে আর মোপো ঘৃণা করে রাজাকে। একদিন ওদের এই ভয় আর ঘৃণা অবশ্যই মুখোমুখি দাঁড়াবে।’

‘আপনি আসলেই অনেক কিছু জানেন,’ মন্তব্য করল নোয়ি।

জবাবে র্যাচেল বলল, ‘হয়তো তা-ই। যতটুকু আমার জানা উচিত কখনো কখনো তার চেয়ে বেশিই জানতে পারি আমি। আমার রক্তেই মিশে আছে এই ক্ষমতা। যা দেখার কথা না তা-ই দেখতে পাই, যা শোনার কথা না তা-ই শুনতে পাই। কখনো ভয়ে শিউরে উঠি, কখনো আনন্দে উদ্বেলিত হই। কখনো মনে হয়, অন্য এক দুনিয়ার কথা শুনতে পাচ্ছি আমি। ধুর, কী সব আজোবাজে বকছি। আসলে আমিই অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ। তবে কিনা, ক্ষমতা কে না চায়? মুখের এক কথায় কারো জান নিয়ে নেয়া বা দিয়ে দেয়ার মতো ক্ষমতা মোটেও সাধারণ ব্যাপার নয়। তা এমনকী এই বর্বরদের মধ্যে হলেও না। কিন্তু, রাজা যখন সাবেক রাজার মুখনিঃসৃত ধাঁধার উত্তর জানতে চাইল, কী অসহায়ই না লাগছিল আমার। বুঝতেই পারছিলাম না কী জবাব দেব। একটা মেয়ের মুখের কথায় হয়তো হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাত। তখনই এল ওই উচ্চা পিণ্ডটা। আজ অনেক উচ্চাপাত হয়েছে। কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকানোর আগ পর্যন্ত কেউ সেদিকে খেয়ালই করেনি। বাকিটা তো নিজেই দেখেছ। পারলে ওরা নিজেরাই এবার এই ঘটনার অর্থ বের করে নিক। অবশ্য আমি জানি, এর কোন অর্থই বের হবে না। কারণ উচ্চাপাতের কোন অর্থ হয় না। এটা নিছকই প্রাকৃতিক একটা ঘটনা।’

নোয়ি জিজ্ঞেস করল, ‘আরো সরল ভাষায় ওদের সাথে কথা বললেন না কেন, জুলা?’

‘বলিনি, কারণ সরল ভাষায় কিছু বলার সাহস আমার ছিল না। আমি এখানে এসেছি তোমাকে বাঁচাতে। ওদের লড়াই যুদ্ধের ব্যাপারে কথা বলার আমি কে? আমি শুধু ওদের সতর্ক করে দিয়েছি যে, বোয়েরদের বিরুদ্ধে ওরা যেন অস্ত্র ধারণ না করে। কিন্তু আমিও জানি, এই সতর্কবার্তা অর্থহীন। লড়াই ওরা করবেই আর এর মূল্যও ওরা চুকাবে। স্পষ্টভাবেই এটা অনুধাবন করছি আমি। যাক, এখনি বাড়ির দিকে রওনা হতে পারলে খুব ভাল হয়। আগামী কাল সকালে কি আমরা রওনা হতে পারব না?’

জবাবে নেতিবাচকভাবে মাথা নেড়ে নোয়ি বলল, ‘আমার মনে হয় না এত সহজে আপনাকে যেতে দেবে ওরা। অন্তত এখন তো নয়ই। ওরা চায়, জুলুদের মহান ওঝা হন আপনি। আপনাকে আসতে মানা করে দূত পাঠিয়েছিলাম আমি। কেন এলেন? একটা নোয়ির জীবনের কী এমন মূল্য?’

‘আমাকে আটকে রাখবে! এই চিন্তা না করাই ওদের জন্য মঙ্গল। তাছাড়া আমি এখানে ইনকোসাজানা। আমার হুকুম ওদের মানতেই হবে,’ জোর গলায় বলল র্যাচেল।

এই কথার কোন উত্তর দিল না নোয়ি। তবে বলল, ‘ইসমাইল এখানেই আছে। আমি নিজেও ওকে দেখেছি। ওর ইচ্ছে ছিল, দেখা মাত্রই যেন রাজা আমাকে খুন করে। কারণ আমাকে ভয় পায় ও। কিন্তু রাজা যখন বার্তা পাঠাল আর নিশ্চিত হলো আপনি আসছেন, তখন ও বুঝে নেয়, আমাকে এখন মারা সম্ভব না।’

র্যাচেলের চোয়াল ঝুলে পড়ল। ‘ইসমাইল!’ পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘ওকেও ভয় পাই না আমি। কারণ এখানে ওর প্রাণও আমার হাতে। উফ, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর কথা বলা সম্ভব না। আমাকে এখন ঘুমাতে হবে। এসো,

নোয়ি, তুমিও আমার পাশে শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে নাও খানিক।’

‘না, লেডি, ঘুমাব না। সারা রাত পাহারা দেব আমি। নিন, এই দুধটুকু খেয়ে নিন। তারপর নির্ভয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি পাহারায় আছি,’ নিশ্চয়তা দিয়ে বলল নোয়ি।

আসলেই পুরো রাতে দু’চোখের পাতা এক করল না নোয়ি। ভোরে যখন ওর মনে হলো আর ভয়ের কিছু নেই তখন গিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল দরজার পাশে। সকালে যখন র্যাচেলের ঘুম ভাঙল বেলা ততক্ষণে অনেক চড়ে গেছে।

‘অনেক ঘুমিয়েছেন, লেডি। এখন উঠুন, গোসল সেরে নাশতা করে নিন। রাজার লোকেরা ইতিমধ্যেই এসে ঘুরে গেছে। বলে গেছে, রাজার হুকুমে আপনার থাকার জন্য আরো ভালো একটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে। সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করবে ওরা।’

‘কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, আমাকে জুলুল্যাণ্ডের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবে কেউ,’ বলল র্যাচেল।

‘সেটাও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু ওরা বলল এখনি তা হবার নয়। কারণ ওঝাদের কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হয়েছে। ওরা আপনার বক্তব্যের অর্থ খুঁজে বের করবে। তাতে অন্তত দুই দিন তো লাগবেই। ওরা আরো বলেছে, আপনার ঘোড়াটা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মোট কথা, আপনাকে এখনি যেতে দেবে না।’

‘কিন্তু, নোয়ি, আমার তো যাবার অধিকার আছে, তাই না?’

‘অবশ্যই, জুলা। পাখিরও ওড়ার অধিকার আছে। কিন্তু খাঁচায় বদ্ধ পাখির জন্য “অধিকার” কোন্ কাজে লাগে?’

‘আমি এখানে রাণী, আমার কথায় জেলের গরাদেও ভেঙে ফেলা হবে।’

‘হয়তো। কিন্তু যদি সেই পাখিটার নিজের বাসাটিই আর না

থাকে তখন কোথায় যাবে সে?’

‘মানে? কী বলতে চাইছ, নোয়ি?’

‘বলতে চাইছি, এই মাখামোটা জুলুদের রাগাবেন না। তাহলে ওদের মাখায় এমন ভাবনাও চলে আসতে পারে যে, আপনার বাসা নষ্ট করে দিলে আপনার আর যাওয়ার কোন জায়গা থাকবে না। তখন হয়তো এই বাসাটিই আপনার বেশি ভাল লাগবে। না, না, অমন কিছু আমি শুনিনি। তবে ওদের চিন্তাধারা অনুমান করতে পারি আমি। লম্বা যাত্রা করে এসেছেন তাই আপনারও বিশ্রামের দরকার। এখানে আপনি নিরাপদও। থাকুনই না দু’দিন। একটু অপেক্ষা করেই দেখুন কী হয়।’

‘স্পষ্ট করে বলো, কী বলতে চাইছ। তোমার পাখি আর খাঁচা নিয়ে দার্শনিক কথা খুব একটা বুঝিনি,’ বলল র্যাচেল।

‘বলছি। আপনি যদি বলেন যাবেনই, স্বয়ং রাজাও আপনাকে থামানোর সাহস করবে না। কিন্তু আপনাকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। কারণ দেখা যাবে, এরা হয়তো আপনার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে। তার ওপর আপনার আগে বা সাথে সাথে এক বা একাধিক সৈন্য যাবে। সে যাবে এটা নিশ্চিত করতে যে, এখানে আবার ফিরে আসতে আপনার যেন আর কোন বন্ধন বা পিছুটান না থাকে। এখন বুঝেছেন?’

‘মানে... তুমি বলতে চাইছ... কিন্তু, আমি তো এখানে এসেছি কয়েক দিনের জন্য মাত্র!’

যা হোক, এরপর উঠে গোসল সারল র্যাচেল। নোয়ির সহায়তায় পোশাক বদলে নাস্তা করল। ঘর থেকে বেরুতেই দেখল উঠানে দাঁড়িয়ে আছে একটা পালকি। ঘাসের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে সেটা চারদিক থেকে সুন্দরভাবে ঘের দেয়া আছে। নোয়ির কথায় সেটায় চড়ল র্যাচেল। ও পালকিতে চড়তেই হাত তালি দিল নোয়ি। ছুটে এল কয়েকটা মেয়ে। পুঁতির পোশাক ওদের

পরনে। ওরাই তুলে নিল পালকিটা। আর পালকির পাশে হেঁটে চলল নোয়ি।

পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে র্যাচেল দেখতে পেল শতাধিক বর্শাধারী প্রহরীর প্রহরায় এগিয়ে চলেছে ওরা। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর বড় বড় গাছে ঘেরা একটা টিলার কাছে এসে দাঁড়াল ওদের বহর। এখানটা দুই স্তরের দেয়ালের ঘেরের ভেতর গাছপালা ঘেরা খুব সুন্দর পার্কের মতো একটা জায়গা। এর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটা ঝিরি। ঝিরিটার পাশে ছায়াঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে খুব সুন্দর দেখতে বড়সড় একটা ক্রাল। এটাই হবে র্যাচেলের আবাস। নোয়ির ভাষায় পাখির খাঁচা। মূল বড় ক্রালের পাশে আরো দু'তিনটা ছোট ছোট ক্রাল আছে। সেগুলোর কোনটা ভৃত্যদের ঘর আবার কোনটা আগত অতিথিদের বিশ্রাম কক্ষ। তবে রাজার ক্রালের হই হট্টগোল থেকে দূরে-শান্ত ও সুন্দর একটা জায়গা এটা। তবে “খাঁচা” তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুবই কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা খাঁচা।

র্যাচেল এখানে পৌঁছার পর থেকে গার্ডদের দেখেনি। ওর দৃষ্টির আড়ালে থেকেছে ওরা।

র্যাচেল এখানে আসার প্রথম দিনই এক লোক ভুলে বা অজ্ঞতাবশত প্রথম বেড়ার দায়িত্বে থাকা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় সারির প্রহরীদের দৃষ্টিতে পড়ে যায়। শুরু হয় রাগান্বিত হাঁক-ডাক। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভেসে আসে তীব্র বেদনাতুর আর্তনাদ। কিছুক্ষণ পরই দেখা যায়, ঢালে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একজন লোককে। সন্দেহ নেই মারা পড়েছে লোকটি। বিনা কারণে মারা পড়ল একটা মানুষ।

রাজার কাছ থেকে প্রতিদিনই লোক আসে। তাঁদের মাধ্যমে রাজা জানতে চায়, ইনকোসাজানার কোন হুকুম আছে কিনা। ওর

সামনে মুখ ঢেকে আসে এই লোকগুলো। এমনকী ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা মেয়েরাও মূর্তির মতো নীরব থাকে সবসময়। ভৃত্য মেয়েগুলোকে ডাকা হলে র্যাচেলের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ওরা। ভুলেও চোখ তুলে ওর দিকে তাকায় না। আর এমনভাবে কথা বলে যেন সত্যি সত্যিই কোন স্বর্গীয় দেবীর সাথে কথা বলছে।

যা হোক, রাজার দূতদেরকে প্রথম দিনেই র্যাচেল বলে দিল যে, ও যে কাজ নিয়ে এখানে এসেছে তা শেষ। তাই বাড়িতে ফিরতে চায় ও। নীরবে র্যাচেলের কথা শোনে ওরা, তারপর জিজ্ঞেস করে আর কিছু ও বলতে চায় কিনা। তখন ও বলে যে, ওর সামনে এলে দূতেরা যেন মুখ ঢেকে না আসে। এবং ওর নাম করে আর কাউকে যেন হত্যা করা না হয়। তখন দূতেরা জানায়, কিছু লোক প্রশ্ন তুলেছিল যে লেডি আসলেই ইনকোসাজানা কিনা। তাদেরও বন্দি করা হয়েছে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাদের। যে কোন সময় রায় কার্যকর করা হবে। তখন র্যাচেল ওদের বলে দ্রুত ছুটে যেতে, যেন ওদের কাউকে হত্যা করা না হয়। লোকগুলোও ওকে বায়াতে দিয়ে সাথে সাথেই রওনা হয়ে যায়। খুশির ব্যাপার, সময় মতো তারা পৌঁছাতেও পারে। ফলে ওদের রক্তের দায় থেকে বেঁচে গেল র্যাচেল।

র্যাচেলের বাড়ি ফিরতে যাওয়ার দাবিতে রাজার জবাব নিয়ে পরদিন এল দূতেরা। বলল যে, কোথাও যাওয়ার জন্য কারো অনুমতির দরকার অন্তত ইনকোসাজানার নেই। কারণ যেখানে ইচ্ছা যাওয়ার অধিকার ও ক্ষমতা দুটোই তার আছে। জুলুল্যাণ্ডের সমস্ত বর্শাধারীও ইনকোসাজানার আত্মার সাথে দৌড়ে পারবে না। এরপরই এল আসল খোঁচা। ওরা বলল যে, যেহেতু ইনকোসাজানা এখন রক্ত মাংসের এই শরীরটার ভেতর বাস করছে তাই ওদের আবদার, ইনকোসাজানার ভবিষ্যদ্বাণীর

মর্মোদ্ধার না করা পর্যন্ত রক্ত মাংসের এই শরীরটাই যেন এখানেই থাকে। নিজের আত্মাকে যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দিক জুলা, কেউ হ্যাঁ বা না করতে পারবে না। তবে সমগ্র জুলুল্যাওবাসীদের দাবি, ইনকোসাজানার শরীরটা যেন আপাতত এখানেই থাকে।

এই কথার আর কী জবাব দেবে ও? তারপরও কিছু বলার আগেই আবার দূত বলল যে, এক শ্বেতাঙ্গ, যাকে জুলুরা ইবুবেসি নামে ডাকে, জুলার সাথে দেখা করার অনুমতি চায় সে। সে বলেছে, জুলার সাথে আগেও নাকি সে কথা বলেছে।

ইসমাইলের সাথে শেষবার দেখা হওয়ার কথা র্যাচেলের খুব ভাল করেই মনে আছে। ওকে আর ওর বাবাকে যেসব হুমকি ইসমাইল দিয়েছিল সেগুলোও র্যাচেল ভোলেনি। এমনকী নোয়িকে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়েছিল সেটাও ভোলেনি র্যাচেল। শেষ হুমকিটা সে কার্যকর করেই ফেলেছিল প্রায়। আরেকটু হলেই মারা পড়ত নোয়ি। এমনকী র্যাচেলকে যে হুমকিগুলো দিয়েছিল সেগুলোও হয়তো কার্যকর করত। পারেনি শুধু সময়ের অভাবে। কাজেই এই লোকটার সাথে দেখা করতে না চাওয়াটাই র্যাচেলের জন্য স্বাভাবিক। এমনকী সে পৃথিবীর শেষ মানুষ হলেও তার সাথে দেখা করতে চায় না র্যাচেল।

কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। ইসমাইল শ্বেতাঙ্গ। তার ওপর ক্ষেত্র বিশেষে ওর কাছ থেকে পরামর্শও নেয় রাজা। র্যাচেল স্পষ্ট অনুভব করছে, রাজার ইচ্ছা-ইসমাইলের সাথে দেখা করুক র্যাচেল। তদুপরি, এই দেশে র্যাচেলের কেশাঘ্র ও স্পর্শ করার ক্ষমতা ইসমাইলের নেই। কারণ র্যাচেল এখানে রাণীর চেয়েও বেশি কিছু। দেবীর আত্মা ও তাঁই এখানে ওর ক্ষতি করার সামর্থ্য ইসমাইলের হবে না। কিন্তু তারপরও র্যাচেলের দ্বিধা কাটছে না। পরামর্শের জন্য ইংরেজিতে নোয়িকে ও জিজ্ঞেস করল, 'সবই তো শুনলো কী করি বলো তো।'

‘আসতে বলুন,’ ইংরেজিতেই উত্তর দিল নোয়ি। ‘সাদা লোকটার কালো অন্তরে কী আছে তা জানতে পারব আমরা। আপনার কাছ থেকে তার মনের কথা সে লুকাতে পারবে না। তবে সৈন্যদের প্রহরায় আসবে ও। আপনার সাথে খারাপ আচরণ করলে সাথে সাথেই সৈন্যদের দিয়ে ওকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারবেন। আর আমার জন্য ভাববেন না। ওই জানোয়ারটাকে আমি ভয় পাই না।’

এবার দূতদেরকে র্যাচেল বলল, ‘রাজার কথা শুনলাম। বুঝতে পারছি, তিনি চান আমি যেন ইবুবেসির সাথে দেখা করি। এই লোকটাকে আমি চিনি। ভাল করেই চিনি, যেভাবে চিনি সমস্ত সাদা ও কালো লোককে। খারাপ লোক ইবুবেসি। তার সাথে একাকী আমি কথা বলব না। ছয়জন সৈন্যের প্রহরায় আসবে সে। ক্যাপ্টেনদের হাতে বশী থাকবে, যাতে আমি হুকুম করলে ইবুবেসির জীবনের ইতি টানতে পারে ওরা।’

র্যাচেলকে সালাম করে চলে গেল দূতেরা।

পরদিনের কথা। দ্বিতীয় বেড়ার সামনে হাজির হলো এক ঘোষণাকারী। ইনকোসাজানার পার্থিব উপস্থিতি, তার দৈব গুণ, আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ইত্যাদির প্রশংসা আর গুণকীর্তন করে নানা কথা বলল সে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, লম্বা সময় ধরে এসব বলা সত্ত্বেও একটা কথা দু’বার বলল না সে। তারপর ঘোষণা করল, রাজার ইন্দুনারা এসেছে। আর এসেছে ইবুবেসি। দেখা করার অনুমতি চায় তারা। নোয়ির মাধ্যমে ওদেরকে ভেতরে আসার অনুমতি দিল র্যাচেল। তারপর শিঙের দণ্ডটা হাতে নিয়ে উঠানে রাখা বিশেষ টুলটায় গিয়ে বসল ও। শুনতে শেল জুলুদের সাথে ইসমাইলের কিছু একটা নিয়ে জোর “কথোপকথন” চলছে। জুলুরা কিছু একটা করার জন্য চাপ দিচ্ছে ইসমাইলকে।

তখন নোয়ি বলল, ‘জুলুরা ওকে বলছে, আপনার সামনে

আসার আগে ওর মাথার টুপিটা খুলে ফেলতে। নইলে ওকে পিটুনি দেবে।’

র্যাচেল বলল, ‘যাও, বলো, যেভাবে চায় সে আসুক। তবে চেহারা যেন উনুজ্ঞ থাকে। যাতে ওকে দেখে চিনতে পারি আমি।’
চলে গেল নোয়ি।

আগত অতিথিদের ভেতরে নিয়ে এল র্যাচেলের ভৃত্য মেয়েরা। প্রথমে ঘরে ঢুকল রাজার ইন্দুনারা। তারপর এল চওড়া ফলার বর্শাধারী ছয়জন জুলু সৈন্য আর সবার শেষে ঘরে ঢুকল ইসমাইল। র্যাচেলের মন গেয়ে উঠল যে, খারাপ কিছু বলবে ইসমাইল। তবে চেহারায় কোন অনুভূতি প্রকাশ পেতে দিল না র্যাচেল।

ইউরোপিয়ান পোশাকের ওপর একটা ক্যারোস চড়িয়ে এসেছে ইসমাইল। মাথায় হ্যাট আর ঠোঁটে জ্বলন্ত পাইপ। পাইপটা মনে হয় আগে জুলুরা খেয়াল করেনি। ভেতরে ঢোকার পর এক জুলু সৈন্য এগিয়ে গেল। ইসমাইলের ঠোঁট থেকে টান দিয়ে রীতিমতো ছিনিয়ে নিল পাইপটা। সেই সাথে ছোঁ মেরে ওর মাথা থেকে খুলে নিল হ্যাটখানাও। দুটোই একসাথে ছুঁড়ে ফেলল মাটির ওপর। পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল ও-দুটো। এই টানাটানিতে ঠোঁটে আর দাঁতে বেশ ব্যথা পেয়েছে ইসমাইল। ঘুমি তুলল ওই জুলুটাকে মারবে বলে। কিন্তু চোখের পলকেই ওকে ঘিরে ধরল জুলুরা। ঠিক ওই মুহূর্তে র্যাচেল বাধা না দিলে ইসমাইলকে মেরেই ফেলত ওরা।

সাম্রাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেও খোঁচা মারার প্রবণতা তখনও ইসমাইলের ভেতর থেকে যায়নি। হুঁচ ফোটানো স্বরে র্যাচেলকে বলল, ‘কেমন আছেন? আপনাকে দেখতে পাব সেটা আসলেই আশা করিনি,’ বলে চোখ দিয়ে গিলে-খেতে লাগল র্যাচেলের সৌন্দর্য।

ইসমাইলের সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে শীতল কণ্ঠে র্যাচেল বলল, ‘আপনাকে এখানে কেন ডেকেছি জানেন? নোয়ি আর আমার বিরুদ্ধে আপনি ষড়যন্ত্র করেছেন। তার দায়ে কেন আপনাকে হত্যা করব না তার সাফাই গুনতে।’

সাথে সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইসমাইলের চেহারা। .
অস্বীকার করল র্যাচেলের অভিযোগ।

র্যাচেল বলল, ‘মিথ্যা বলে লাভ হবে না। রাজা নিজেই আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করেছে। এবং আমার নিজের জ্ঞান থেকেও একই কথা জানতে পেরেছি। মনে রাখবেন, আমি ইনকোসাজানা। জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আমার হাতে। আমার মুখের একটা কথা বা হাতের এই দণ্ডটা আপনার দিকে ওঠানো, মাত্রই স্রেফ “নেই” হয়ে যাবেন আপনি।’

‘ইনকোসাজানা হোন বা না হোন, অনেক বেশি জানেন আপনি। তবে আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন প্ল্যানটা ভাল ছিল। কারণ নোয়িকে তুলে আনায় ওকে ফেরত চাইতে আপনি নিজেও এখানে চলে এসেছেন। আর মজার ব্যাপার দেখুন—এই অসভ্য, নিগ্রো ভূত, কালো জংলীদের মাঝে আপনি আর আমিই কেবল দুজন শ্বেতাঙ্গ,’ বলল ইসমাইল।

আশপাশে তাকাল র্যাচেল। ওর পাশে বসে আছে রাজার ইন্দুনারা আর হাত খানেক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে কর্তব্য-পরায়ণ সৈনিকরা। ওদের দেখে রোমান সৈনিকদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে র্যাচেলের। দায়িত্ব পালনের স্বার্থে যে কোন সময় জান-কুরবানি দিতেও প্রস্তুত থাকত তারা। এই জুলুরাও তো ওদেরই মতো কর্তব্যনিষ্ঠ। নোয়ির ওপরও র্যাচেলের চোখ পড়ল। এই বদমাশ ইসমাইলের লোভের মূল্য চুকাতে গিয়ে আত্মীয় পরিজন সব হারিয়েছে এই মেয়েটি।

এক নজরে সবাইকে দেখে নিয়ে র্যাচেল বলল, ‘এই

গণ্যমান্য সভাসদ আর সৈন্যদের জানাব, এই মাত্র ওদেরকে কী নামে আপনি ডাকলেন? আপনার গল্পের খানিকটা ওদেরকে জানাই, কী বলেন?’

জবাবে ইসমাইল বলল, ‘ইচ্ছা হলে তা আপনি করতেই পারেন। তবে কেন আপনাকে এখানে টেনে এনেছি সেটা আপনার অজানা নেই,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলছে ইসমাইল। ‘রামাহ-তে যখন ছিলেন, আপনার বুড়ো বাবা আর এই কালো ডাইনিটার জন্য আপনার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতাম না। ভেবেছিলাম, এখানে আপনাকে আনতে পারলে পরিস্থিতি ভিন্ন হবে। ভেবেছিলাম এখানে আমার মতো একজন শ্বেতাঙ্গ লোকের সঙ্গ পেয়ে হয়তো ধন্য হবেন। কিন্তু এখন তো দেখছি, দেবীর আসনে বসে আমাকে আর চিনতেই পারছেন না। আমিও একসময় নিজেকে দেবতা ভাবতাম। অন্তত ওদের চোখে ছিলামও তা-ই। তবে মনে রাখবেন, দেবী হোন বা যা-ই হোন, আপনি একজন নারী। দেবীগিরি একসময় আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলবে। বাবা-মায়ের কাছে নিশ্চয়ই ফিরতে চান আপনি। কিন্তু তা পারবেন না, কোন দিন না। এখানে এক রকম বন্দি হয়ে আছেন আপনি। এই মাথামোটা জংলীগুলো ভেবেই নিয়েছে আপনি আসলেই ওদের দেবীর আত্মা। ওরা ভাবে, দেবীর আত্মাকে দেশ থেকে চলে যেতে দেয়ার অর্থ দুর্ভাগ্য ডেকে আনা। কাজেই আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। যতদিন ওরা আপনাকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে না যায় ততদিন ধরে রাখবে এখানে। সেটা অন্তত কয়েক বছর তো বটেই। তারপর মেরে ফেলবে আপনাকে। একটা কথা খুব ভালভাবে মাথায় গেঁথে রাখুন যে, কেবল মাত্র আমি ছাড়া আর কেউ এই জাহান্নাম থেকে আপনাকে বের করতে পারবে না। আর সেটা আমিও মুফতে কোনমতেই করে দিতে রাজি নই।’

রাগ চড়ে যাচ্ছে র্যাচেলের। টুলের সিটটা খামচে ধরেছে ও।

সোজা হয়ে বসেছে। ভাবে মনে হচ্ছে কিছু একটা করেই বসবে।
তখন একটু ঝুঁকে ওর কানে কিছু একটা বলল নোয়ি।

সাথে সাথেই ইসমাইলের প্রতিক্রিয়া, ‘কালো ডাইনিটা কী
গুজুর গুজুর করছে আপনার কানে? আমাকে মেরে ফেলতে
বলছে? ভুলেও ওই চিন্তা করবেন না, যেন। আপনার বাবার দেয়া
শিক্ষার কথা মনে নেই? আমাকে মারলে আমার অপবিত্র রক্তে
রঞ্জিত হবে আপনার পবিত্র হাত দু’খানা, খুনের দায় চাপবে
আপনার কাঁধে। নরক যাত্রা অনিবার্য হয়ে উঠবে আপনার জন্য।
অবশ্য আমার মনে হয় নরক থেকেই উঠে এসেছেন আপনি।
নইলে এমন জাদুকরী ক্ষমতার প্রদর্শনী করলেন কেমন করে?
যাক, বাদ দিন ওসব। আমার সাথে গাঁটছড়া বাঁধুন। এই বাজ
পড়া দেশ থেকে আপনাকে বের করে নিয়ে যাব। পরে না হয় এই
কাজের পুরস্কার হিসেবে আমাকে বিয়ে করে ফেলবেন। আর
আমার কথা যদি না শোনেন, তাহলে দুর্ভাগ্যের পাহাড়সম বোঝা
নেমে আসবে আপনাদের সবার ওপর।’

‘খুব বড় ভুল করছেন, মি. ইসমাইল। আপনি নিজেও
দেখেছেন মানুষ মারতে পারি আমি। প্রয়োজন পড়লে আবার
মারব। তবে, এই মাত্র বললেন এখান থেকে আমাকে বের করতে
পারবেন। ধরে নিলাম আপনার কথা সত্য। যদিও এখানে থাকা
নিয়ে আমার খুব একটা আপত্তি নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বাবা-মা
আমার জন্য চিন্তায় আছে,’ বলল র্যাচেল।

‘এখানে থাকতে আপনার আপত্তি নেই বলছেন? আমারও
নেই। আমিও আরামে আছি। ইনকোসাজানার স্বামী হতে পারলে
আরো আরামে থাকব। এই ক্রালটা বেশ সুন্দর, বড়ও বটে।
অনায়াসে এখানে দুজনের জায়গা হয়ে যাবে,’ খানিকটা যেন
পরিহাস মাখা কৌতুকের সুরেই বলল ইসমাইল।

নিজেকে সামলাতে মুহূর্তখানেক নীরব রইল র্যাচেল।

তারপরও যখন মুখ খুলল, মনে হলো নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে রীতিমত খাবি খাচ্ছে ও। এর মধ্যেই বলল, ‘নাম গোত্রহীন নির্লজ্জ মানুষ আপনি। মুহূর্তখানেক আগে মৃত্যুর খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন। তবে আপাতত ধৈর্য ধরছি আমি। বিনিময়ে আমাকে এখান থেকে বের করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করতে এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে আমার বাড়ি ফেরার আয়োজন সম্পন্ন করবেন। তা যদি না পারেন, তাহলে আপনার বলা কথাগুলোর মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করব আমি। আর কিছু বলার দরকার নেই। আর কিছু আমি শুনব না।’

জুলুদেরকে ডাক দিয়ে র্যাচেল বলল, ‘ওঠো সবাই। জুলু রাজার জন্য ইনকোসাজানার বার্তা শোনো। রাজাকে বলবে, তার পাঠানো এই কুকুর আমার ঘরে এসে আমাকেই অপমান করেছে। বলবে, এই লোকটা আমাকে, ইনকোসাজানা-ই-জুলাকে প্রস্তাব করেছে তার স্ত্রীদের একজন হতে।’

এই কথা র্যাচেলের মুখ দিয়ে বের হয়ে সারতে পারল না, হুঙ্কার ছেড়ে ইসমাইলকে পাকুড়াও করল জুলুরা। বর্শা তুলল ওর বুকে বসিয়ে দেবে বলে।

র্যাচেল ওদের বাধা দিয়ে বলল, ‘এখনি মেরো না। রাজার কাছে নিয়ে যাও। আমার কাছ থেকে নিশ্চিত বার্তা গেলে তবেই যেন ওকে হত্যা করা হয়। ততদিন মুক্ত থাকুক ও। ওর অপবিদ্র রক্তে আমার হাত নোংরা করতে চাই না। প্রতিশোধ নিতে হলে স্বর্গই নেবে। তবে আমার নজর থাকবে ওর ওপর। যাও, রাজার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওকে। এই চেহারা আমি আর দেখতে চাই না।’

ইন্দুনারা বলল, ‘আমরা শুনলাম, জুলু। আপনার হুকুম মতোই সব হবে।’ তারপর ওকে বায়াতে দিয়ে চলে গেল সবাই।

‘কেমন করলাম, নোয়ি?’

‘ভাল না, জুলা। রাগ থাকতে থাকতেই ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত ছিল। কারণ রাগ পড়ে গেলে ওকে আর কিছুই করতে পারবেন না আপনি। তখন সুযোগ বুঝে উল্টো ও-ই কামড় দেবে আপনাকে,’ বলল নোয়ি।

‘তা কেমন করে সম্ভব? কেবল ভালবাসার অপরাধে একটা লোককে নিশ্চয়ই জানে মেরে ফেলা যায় না? সেটা উচিতও না। আর এখন আমাকে ভয় পাচ্ছে ও। কাজেই আমার কথা মতোই কাজ করবে।’

‘এখন হয়তো করবে। কিন্তু টেঙলা পার হয়ে গেলে ও কি আর আপনাকে ভয় পাবে? আমার পরিবারকে হত্যা করিয়েছে ও, ইনকোসাজানা। জুলুল্যাণ্ডের আইন অনুসারে ওকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আমার আছে। ওকে মারতে আমার হাতও কাঁপবে না, মনও দুর্বল হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা ওর মতো মানুষের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড পাওনা।’

‘কিন্তু, আমার কথায় ওর বা কারো মৃত্যু হোক সেটা আমি চাই না, নোয়ি।’

‘বেশ। তবে জেনে রাখুন, কাল বা পরশু ও মরবেই। খুন হবে ও। আমার বাবার আত্মা সেটা নিশ্চিত করে গেছে।’

‘কে? তোমার বাবার আত্মা, নোয়ি!’

‘হ্যাঁ। প্রায়ই সে আসে। নানা বিষয়ে আমার সাথে কথা বলে। অনেক কিছুই আমাকে জানায়। সেই কারণেই ডিনগারের হাতে বন্দি হয়েও ভয় পাইনি আমি। কারণ বাবা বলেছিল আমাকে রক্ষা করতে আপনি আসবেনই।’

‘ইশ্, আমার সাথে যদি সে কথা বলত! জামাত, কবে বাড়ি ফিরতে পারব!’

‘পারলে অবশ্যই আপনার সাথে সে কথা বলত। কিন্তু সে অপারগ। কারণ আপনার সাথে কথা বলতে গেলে অনেক বেশি

বাধার মুখে পড়ে যায় সে। ভালবাসার সকলেই যদি মারা পড়ে তখন বাধার পর্দাটা খুব পাতলা হয়ে যাক। আমার বেলায়ও তা-ই হয়েছে। এমন কিছু হলে তখন আপনিও তার কথা শুনতে পারবেন। পারবেন ভূতদের কথা শুনতে। এমনকী “তাদের গাছের নীচে” আবছাভাবে তাদেরকে ঘোরাফেরা করতেও দেখতে পাবেন।’

‘তাদের গাছের নীচে! মানে?’

‘হ্যাঁ, তাদের গাছ, যেটার প্রতিটা ডালই একেকটা কর্ম আর প্রতিটা পাতাই একেকটা শব্দ ভাঙার। ওই জীবন বৃক্ষের নীচেই আজীবন থাকবে তারা। আমার জাতির লোকেরা হয়তো আরো ভালভাবে ওই গাছ সম্বন্ধে আপনাকে বলতে পারত। হয়তো যখন আমরা দুজন ওখানে যাব, ওরা সেই গল্পও আমাদের বলবে। যাক, বাদ দিন ওসব। কল্পনায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি। এসবে কান দেয়ার দরকার নেই। আমরা কথা বলছিলাম ইবুবেসিকে নিয়ে। তাকে আপনি চলে যেতে দিলেন। সম্ভবত সেজন্য একদিন আপনাকে খুব বড় মূল্য চুকাতে হবে। খুব আফসোস করবেন একদিন। কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকবে না।’

বারো

সেদিন বিকেলেই রাজার সামনে হাজির করা হলো ইসমাইলকে। কিন্তু এর আগেই তার অবস্থা খারাপ করে ফেলা হয়েছে।

ত্যাং চার নীচ ইত্যকর চানচানত । ত্যাং ত্যাং চার চানচান
ইনকোসাজানাকে অসম্মান করে ক্যান্টেনদের চোখে বিরাট
ই-তি ওয়াচন চানচান । চার চার চানচান চার চানচান চানচান
অপরাধ করেছে সে । এতই বড় যে ওদের মতে মৃত্যুই ওর
তানচান চার চার চানচান চানচান চার চার চানচান চানচান
একমাত্র দণ্ড ইওয়া উচিত । কিন্তু দয়ালু ইনকোসাজানা যেহেতু
হৃদয় কানচান । তানচান চার চানচান চানচান চানচান
নিষেধ করেছেন, তাই তার হৃদয় ছাড়া একে মেরে ফেলা যাবে
না । কিন্তু ওকে ইচ্ছামতো খোলাই দেয়া যাবে না সে কথা তো
জুলা বলেনি ।

সুতরাং র্যাচেলের ক্রল থেকে রাজার ক্রল পর্যন্ত প্রায় পুরো
চার এক বিকক্যে চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
বাস্তব মার খেতে খেতে এসেছে ইসমাইল । বশীর হাতলের
ইওয়ান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
আঘাতে চোখে কালশিটে পড়ে গেছে । ছিড়ে গেছে তার
চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
ইউরোপিয়ান পোশাক । ওগুলোর অবস্থা এখন ত্যানীর মতো ।
চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
চাপ আর পাইপ তো আগেই হারিয়েছে । র্যাচেলের ক্রলে
চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
থাকতেই ওগুলো কেড়ে নিয়েছিল এক জলু । সেগুলো আর ফেরত
চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
পায়নি ইসমাইল । পাবে কি করে, ওগুলো আগুনে ফেলে দিয়েছে
কানচানচান চানচানচান চানচানচান চানচানচান চানচানচান
নোয় ।

যা হোক, এই বেহাল অবস্থায়ই রাজার সামনে হাজির করা
চানচানচান চানচানচান চানচানচান চানচানচান চানচানচান
হলো ইসমাইলকে । ওর সঙ্গিন অবস্থা-দেখে বিমলানন্দে উদ্ভাসিত
হলো ইন্দুনাদের মুখ । খুশির চোটে দাঁত বেরিয়ে গেছে তাদের ।

রাজা জিজ্ঞেস করল, ‘ইনকোসাজানার সাথে দেখা করতে
গিয়েছিলেন, সাদা মানুষ?’

সাথে সাথেই ভেতরের সমস্ত রাগ উগরে দিল ইসমাইল ।
বলল এ পর্যন্ত আসতে আসতে ওর কী হাল করেছে জুলুরা ।
একজন সম্মানিত ও মহান সাদা মানুষকে আঘাত করার অপরাধে
তাদের মৃত্যুদণ্ড চাইল ও ।

জবাবে রাজা বলল, ‘খামো । ইনকোসাজানাকে **নিষেধ**
করে তুমিই অপরাধ করেছ, নিশাচর । এই অপরাধে তোমাকে
ক্যান্টেনদের চোখে বিরাট ই-তি ওয়াচন চানচান চানচান চানচান চানচান
মৃত্যুদণ্ড দেব কিনা সেটাই বিবেচনা করছি । এখনও মারিনি, কারণ
ত্যাং চার চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান চানচান
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছে ইনকোসাজানা । কিন্তু আমার

সামনে বেশি হাউকাউ করলে তার হুকুমের অপেক্ষা করব না।
সোজা শেয়াল দিয়ে খাইয়ে দেব।’

বিপদ বুঝে মুখ বন্ধ করল ইসমাইল।

ওদিকে রাজা বলে চলেছে, ‘আমি যেজন্য তোমাকে
পাঠিয়েছিলাম সেটা জেনেছ? জেনেছ, কেন আমাদের ছেড়ে চলে
যেতে চায় ইনকোসাজানা?’

‘জেনেছি, রাজা। নিজের পরিবারের লোকদের কাছে ফিরতে
চায় সে। মানে ওই “প্রার্থনাকারী সাদা ওঝা” আর তার স্ত্রীর
কাছে যেতে চায় সে,’ বলল ইসমাইল।

‘কিন্তু আমরা তো জানি, ওরা তার পরিবার নয়!’ অবাক হয়ে
বলল ডিনগান। ‘আমরা জানি, এক ঝড়ের রাতে তাকে কুড়িয়ে
পেয়েছে ওই সাদা লোকগুলো। এই গল্পটা তো তুমিই আমাদের
বলেছ। আর বলেছ কীভাবে বজ্রপাত ডেকে এনে আমার সৈন্যকে
পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে সে। কাজেই আমরাই তার পরিবার, আর
কেউ নয়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইনকোসাজানার কি বাবা-মা
থাকতে পারে?’ প্রশ্ন করল রাজা।

জবাবে ইসমাইল বলল, ‘আমি তা জানি না। তবে এটা
জানি, ইনকোসাজানা একজন নারী। আর এমন কোন নারী নেই
যে বাবা-মা ছাড়া জন্মেছে। অন্তত এটা নিশ্চিত যে ওই
পরিবারটিকে নিজের পরিবার আর বুড়ো-বুড়িকে নিজের
অভিভাবক বলেই মানে ইনকোসাজানা। এবং সেভাবেই তাদের
সম্মান করে, তাদের সমস্ত হুকুম মেনে চলে। ওঝা জীবিত
থাকাবস্থায় অথবা ওরা যদি নিজে থেকে ইনকোসাজানাকে
আলাদা থাকতে না বলে, তাহলে কখনোই সে ওদের ছেড়ে
আসবে না।’

কুতকুতে চোখে ইসমাইলের দিকে চাইল রাজা। বলল,
‘জীবিত থাকাবস্থায় বা তারা হুকুম না করা পর্যন্ত, না?’ তারপর

এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে বলল, ‘ইনকোসাজানা যদি যেতেই চায়, কার ক্ষমতা আছে তাকে বাধা দেবে? কারণ সে জাদু করা আরম্ভ করলে তা ফেরানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। তার বিরুদ্ধে একটা হাত উঠলেও স্রেফ অভিশাপ দিয়েই পুরো জুলু জাতিকে শেষ করে ফেলার ক্ষমতা আছে জুলার।’

এবার ইসমাইল বলল, ‘অভিশাপ দেবে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয় জুলা যদি সাদাদের মাঝে ফিরে না যায়, রেগে যাবে সে। তখন আপনার ওপর পাঠাবে বোয়ের নামের গজব।’

এবার রাজার চেহারা দ্বিধাম্বল হয়ে গেল। ইসমাইলকে সে বলল পিছু হটে দাঁড়াতে। তারপর ইন্দুনাদের সাথে খানিক পরামর্শ করল সে। তারপর বলল, ‘শোনো, সাদা মানুষ। আমাদের ওঝাদের কাউন্সিল একমত হয়েছে যে, ইনকোসাজানা আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমাদের জাতির আত্মাও তার সাথে চলে যাবে। সেই সাথে যাবে সমস্ত সৌভাগ্য। কাজেই তা হতে দেয়া যায় না। আমিও এ বিষয়ে কাউন্সিলের সাথে একমত। এবং আমাদের দাবি, আরো কিছুদিন আমাদের সাথে রইবেন তিনি। আজ আমাদের ওঝা আর পুরোহিতদের কাউন্সিল ঘোষণা দিয়েছে, ইনকোসাজানার ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ করতে পারছে না তারা। কথাগুলো তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আরেক জাতির জ্ঞানী লোকদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হবে। তাদের দেশ অনেক দূরে। তারাই এসে ইনকোসাজানার সাথে সামনা সামনি বসে কথা বলে তার বক্তব্যের অর্থ আমাদের জানাবে। সুতরাং তারা আসার আগ পর্যন্ত ইনকোসাজানাকে এখানে উমগুনগুঙ্কলোভুর আতিথেয় আরো কয়েকটি দিন কাটাতেই হবে।’

নির্বিকার ইসমাইলের মন্তব্য, ‘রাজার যা ইচ্ছা...’

ওঝার কাউন্সিল বা এ ধরনের কিছুর ওপর ইসমাইলের

মোটোও বিশ্বাস নেই। তবে নেটিভদের চিন্তা ভাবনা ভালই বুঝতে পারে ও। তা থেকেই ধরে নিয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জুলুরা র্যাচেলকে অতিমানবী ধরনের কিছু একটা মনে করে। তদুপরি, মোপো, যার সম্বন্ধে বলা হয়, ইনকোসাজানাকে দেখেছে সে এবং তার হুকুমেই খুন করেছে আগের জুলু রাজা চাকাকে, সে-ও র্যাচেলকে জুলু জাতির আত্মা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে এই বিশ্বাসটাই দৃঢ়মূল হয়ে গেঁথে গেছে জুলুদের ভেতর। তাই র্যাচেলের কথাগুলোকে অন্তঃসারশূন্য বলতে পারছে না তারা। আবার এটাও বলতে পারছে না যে, বোয়েরদের ওপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেছে ও। ফলে বিপাকে পড়ে গেছে ওরা। ওদিকে যুদ্ধ করার গোপন ইচ্ছা যদি রাজার থেকেও থাকে প্রকাশ্যে তা সে বলতে পারছে না। কারণ সেক্ষেত্রে যুদ্ধে হেরে গেলে সবাই রাজার দিকেই আঙুল তুলবে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে সেটাও হতে দেয়া যায় না। তাই সিদ্ধান্ত নেবার কঠিন দায়িত্ব আরেক জাতির ওঝাদের কাঁধে ফেলে দিচ্ছে রাজা। তবে তারা কারা, বা কোথা থেকে আসবে এসব জিজ্ঞেস করার ঝামেলায় ইসমাইল একদমই গেল না।

রাজা বলে চলেছে, ‘ডাহকের তো ডানা আছে, যখন ইচ্ছা উড়ে চলে যেতেই পারে সে। তবে তার পছন্দের বাসাটি যদি এখানে নিয়ে আসা যায় তাহলে আর তার চলে যাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। বুঝেছ, ইবুবেসি?’

ইসমাইল খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে যে র্যাচেলের ইংলিশ নাম ডাভ-কে ইঙ্গিত করে কথা বলছে রাজা। কিন্তু তান করল যেন কিছুই বোঝেনি সে। তাই বলল, ‘না, রাজা। কিছুই বুঝিনি। ইনকোসাজানা ডাহক নয়, যে চাইলেই এখান থেকে উড়ে চলে যাবে।’

রাজা একটু অস্থির হয়ে গেল। বলল, ‘ডাঙার বাড়ি খেয়ে

বুদ্ধিশুদ্ধি সব কি গুলিয়ে গেল, ইবুবেসি? নাকি বিয়ার বেশি খেয়ে মাতাল হয়ে গেছ? বলেছি, ইনকোসাজানার বাড়ি তো নদীর ওপাড়ে। সেখানেই ফিরতে চায় সে। তাহলে তার বাড়িটাকে মানে বাড়ির লোকদেরই এখানে নিয়ে আসি। তাহলেই তো আর তার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করবে না। প্রথমে আমিই বলেছিলাম, ইনকোসাজানার সাথে কেউ এলে তাকে মেরে ফেলা হবে। সেই হুকুম উঠিয়ে নিলাম। তার বাবা-মাকে এবার জুলুল্যাণ্ডে নিয়ে আসতে হবে।’

‘কেন ভাবছেন, ওরা এখানে আসার মতো বোকামি করবে?’

‘কেন, ইনকোসাজানাকে কি ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসিনি আমি? এবারও তা-ই আসবে ওরা। আর কেন আসবে? আসবে ওদের প্রিয় মেয়েকে দেখতে,’ বলল ডিনগান।

‘আসবে না। কারণ, তারা ভাববে তাদের মেয়েকে খুন করেছেন আপনি। এখন তাদের ডাকছেন, তাদেরও খুন করবেন বলে।’

‘না, ওরা তা ভাববে না। কারণ ওদের আনতে কোন সৈন্য নয়, তুমি, ইবুবেসি, নিজে যাবে।’

‘সম্ভব না। আপনার সৈন্যরা মেরে আমার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। মাথাই সোজা করতে পারছি না আমি। হাঁটা বা ঘোড়ায় চড়া তো অসম্ভব,’ বলল ইসমাইল।

‘কিন্তু পালকিতে চড়ে তো যেতে পারবে। নইলে, শকুন দিয়ে খাওয়াব তোমাকে। ইনকোসাজানা খুব দয়ালু। তাই তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে না। কিন্তু তার সাথে অন্যায় করার শাস্তি আমি অবশ্যই দিতে পারি,’ হুমকির সুরে বলল রাজা ডিনগান।

ইসমাইল বুঝল, যেতে ওকে হবেই। কাজেই তর্ক বাদ দিল। সেই সাথে ওর মনের গহীন কোণে ঊকি দিতে শুরু করল দুরভিসন্ধির মেঘ। যে কোন মূল্যেই র্যাচেলকে জয় করতে চায়

মোঃ) কচুরাওকে ইয়াদেদর মস্তা জালাবাসে ইসমাইলক অবশ্য
 এদিকে যদি জালবাসা কামা যায় জাহাজেই আর কী যা যোক
 ইসমাইলক আরো বুলল, এখানে থেকে যাওয়াও অর্থ মত। ফলে
 সেদিক ব্যক্তি হলো সে। তবে আরশাই উপায়ক পারিষ্ঠামিকের
 লিগিময়ে আইকরি আর গবাদি পশুর বড়সড় একটা পাল চাইল
 মোঃ আরাদে কনি। এখনই দিতে হবে ব্যক্তি দিতে হবে কাজ
 সমাপ্ত হওয়ায় প্রক সেই মাথোতিনশ জল যোদ্ধা চাইল সেন
 যারা প্রক হকুমে নিয়া গুণে যে কোন কাজ করবে
 চানচায়াত। হলো ডিনখান। তারপর ইসমাইলকে নিদেশনা দিবে
 বলল, সৈন্যদের নিয়ে রামাহ-তে। যদেই সে। উমফনহসি। জাতি
 মোস্তেলেক্ত বারান-মি। জাহাজে বলাবের মেস্তোক্ত দেয়াতে, হলে
 জললম্বায়ে পিয়েইলত অ্যেককো বাস করবে। বরক রাজি হ্যাংলে
 দেয়া দিবে। তাহেরকে তলে আনতে হবে। তবে এর মধ্যেই যদি
 ইয়াকোমাজান। তার ক্ষমতা বাড়িয়ে ওখানে চলে গিয়ে থাকে তবও
 তার বাবা-মাকে নাহলে আনতে হবে। তখন সে নিজেও ওদের
 পোষন পেছন জললম্বায়ে দিবে আসবে। আর যদি দেখা যায় তারা
 নিজে থেকে আসেই। বরনা হয়ে গেছে তাহলে যদরে অভর্থনা
 জাতিয়ে নিয়া আসতেই হবে। মোঃ দেবেও যদি ইয়াকোমাজান
 অধেক পথ চলে গিয়েও থাকে, তবও বাবা-মার সাথে এখানে
 চলে আসবে সে। এই হকুম বাস্তবায়নার্থে এই মহতের ওরা হতে
 হতে ইসমাইলকে।

'শুনেছি, রাজা। আমার, পাওনা আইকরি আর গবাদি পশুর
 প্রাল জাহাজে ইয়াদেদর পৌছে দেয়া মাজই আমিও এদিকে
 রওনা হয়ে যাব।' 'তবুও দলত চাড়াচ হানি চক চাচা কচা
 চাচা কিছু একটা হিন্দা ইসমাইলের হাতে। ডিনখানের কানোও ধরা
 প্রক হোজা। শীতল কর্তে রাজা বুলল ন্যাংইকরি আর পদক পৌছে
 দিলে। চির মনে রেখা। ইরবেরি কোন কোশল খাটানোর

চেষ্ঠা করলে তার ফল ভাল হবে না। আমার ঘরেরটা খেয়ে বড়লোক হয়েছ তুমি, ইবুবেসি। মাফুটিতে অনেক গরু জমেছে তোমার, আর আছে বহু স্ত্রী ও সম্ভান। তোমার গরুর সঠিক সংখ্যা আমাকে জানিয়েছে আমার চরেরা। আমার হুকুমের অন্যথা করলে বা ওই সাদা লোকগুলোর বিরুদ্ধে একটা আঙুলও যদি তোল, জেনে রেখো, পুড়িয়ে ছারখার করে দেব তোমার ক্রাল। দখল করব তোমার সমস্ত গবাদি পশু, খুন করব তোমার ঘরের সমস্ত বাসিন্দাদের। আর যখন আমার হাতে ধরা পড়বে তুমি, খুব ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপহার দেব তোমাকে। যা বলার বলেছি। এবার রওনা হয়ে যাও।’

‘ও, মহান হাতি, কালো গরুর বাছুর, আপনার হুকুম আমি অবশ্যই পালন করব,’ ডিনগানের হুমকিতে ভীত ইসমাইল ভদ্র কণ্ঠে বলে চলেছে, ‘সাদা লোকদের অবশ্যই এখানে নিয়ে আসব। তবে প্রার্থনা করি, এই কাজের জন্য ইনকোসাজানা যদি রেগে যায়, তাহলে আমাকে আশ্রয় দেবেন আপনি।’

জবাবে রাজা বলল, ‘ইনকোসাজানার সাথে তোমার নিজেকেই শান্তি বজায় রেখে চলতে হবে। দেখতে হবে, তিনি যেন তোমার ওপর রেগে না যান,’ বলে নিজের ক্রালে ঢুকে গেল রাজা।

এক ঘণ্টা পরের কথা।

রাজার ইন্দুনা টাম্বুসা এল র্যাচেলের সাথে দেখা করতে। ওর সাথে কথা বলার অনুমতি চাইল সে।

র্যাচেল এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার? আমাকে জুলুন্ডাও থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছ?’

‘না, মহান আত্মা। এই দেশের মাটি আপনাকে আরো কয়েকদিন চায়। তবে আমি এসেছি একটা বিষয়ে আপনার সদয় অনুমতি চাইতে। সেটা হচ্ছে আপনার ভৃত্য নোয়ির সাথে কথা

বলতে চায় ডিনগান। তবে ভয় পাবেন না, ওর কোন ক্ষতি করা হবে না। আর আমি তার জামিনদার হিসেবে এখানেই থাকব। ওর কিছু হলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন আপনি। এখানে আপনি যতটা নিরাপদ থাকবেন ওকেও একই রকম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে রাজা।’

নোয়িকে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘যেতে ভয় পাও তুমি, নোয়ি?’

‘না, জুলা। রাজার দেয়া কথা অবশ্যই মূল্যবান। আর আপনার শক্তির ওপর আমার ভরসা আছে।’

‘ঠিক আছে, যাও তাহলে। তবে কথা শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবে। সৈন্যরা নিয়ে যাবে তোমাকে।’

চলে গেল নোয়ি। রাত হয়ে গেছে। সূর্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরের কথা। র্যাচেলের রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, খেতে বসেছে ও। এমন সময় বেড়ার দরজা খুলে গেল। ভেতরে এল নোয়ি। ওকে দেখে খাবার পরিবেশনকারী মেয়েগুলোকে তখনই সব পরিষ্কার করতে বলল র্যাচেল। বাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে আছে ও। আশা করছে, সেই সংক্রান্ত কোন খবর নিয়ে এসেছে নোয়ি। তাই রাজার সাথে কী কথা হলো তা জানতে চাইল র্যাচেল।

র্যাচেলের প্রশ্নের জবাবে নোয়ি বলল, ‘লম্বা গল্প সংক্ষেপে বলছি, জুলা। আপনার কি মনে আছে, প্রথমবার আমাদের স্থান দেখা হয়েছিল, বলেছিলাম, আমি জুলু জাতির মানুষ নই? আমার জাতির বাস অনেক উত্তরে, গাছের ছায়ায় বাস করে তারা, গাছকেই পূজা করে, তারা স্বপ্ন-দ্রষ্টা, ভূতের জাতি ইত্যাদি?’

‘হ্যাঁ, মনে আছে। সম্ভবত সে কারণেই তোমার আত্মীয়দের মৃত্যু নিয়ে খুব একটা আফসোস করতে তোমাকে দেখিনি। বরং তাদের আত্মাদের সাথে কথা বলেছি তুমি। কিন্তু রাজার সাথে ওই

গল্পের সম্পর্ক কী?’

‘সম্পর্ক আছে, জুলা। আমার জাতির লোকেরা খুব জ্ঞানী। ভবিষ্যৎ দেখতে পারে তারা। আরো অনেকেই ভবিষ্যৎ দেখতে পারে। আমিও কিছুটা পারি। কিন্তু তাদের মতো করে আর কেউই পারে না।

‘যেহেতু আমার আত্মার বোন আপনি, তাই একদিন আপনাকেও ওসব শেখাব,’ বলতে বলতে চকচক করে উঠল নোয়ির চোখ। ও বলে চলেছে, ‘ভূত জাতির লোকেরা এতই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে, সব বড় বড় গোত্রের সর্দাররা আর ডিনগানের মতো বড় মানুষরা তাদের কাছে উপহার পাঠায়। চায়, তারা যেন এসে ভবিষ্যৎ বলে যায়। যদিও ওসব ডাকে খুব কমই সাড়া দেয় তারা।

‘এখন আপনার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে আমাদের রাজা ও তার ওঝার দল। তারা না পারছে নিজেরা সেগুলো বুঝতে, না পারছে আপনার কাছে এসে এর অর্থ জিজ্ঞেস করতে। কারণ, প্রথমত আপনি ওদেরকে নিষেধ করেছেন যে, এই বিষয় নিয়ে আপনাকে যেন আর বিরক্ত করা না হয়। দ্বিতীয়ত, ওরা ভয় করছে, অর্থ বলতে বললে আপনি হয়তো এমন কিছু বলে বসবেন যেটা ওদের জন্য সুখকর হবে না।’

এবার র্যাচেল বলল, ‘ঠিকই ধারণা করেছে। একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছি, তা-ই যথেষ্ট। আবার মুখ খুললে স্পষ্ট কথা বলব আমি।’

‘সে কারণেই আমার জাতির লোকদের সহায়তা নিতে চাইছে রাজা। ওদের ভবিষ্যৎ বক্তাদের এনে আপনার সাথে মুখোমুখি কথা বলিয়ে দেয়া হবে। তারাই হলো “ভূত রাজা”। তারা স্পষ্ট করে দেবে যে, আপনি আসলেই জুলু জাতির মহান আত্মা কিনা। এবং আপনার বক্তব্যের আসল অর্থ কী। সেই সাথে তারা বলবে

কীসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল আকাশে খসে পড়া তারকা (উল্কা)।’

‘বলতে চাইছ, ওই ভূতের রাজাদের সাথে দেখা করতে যেতে হবে আমাকে?’

‘না, জুলা। ভূতেরা আপনার সামনে আসবে না। তবে বৃক্ষজাতির উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতরা আসতে পারে। সাথে নিয়ে আসবে বৃক্ষমাতার “বাণী”।’

‘পুরোহিতরা আসবে? ওদের আনতে যাবে কে?’

‘রাজার ইচ্ছা, আমি যেন গিয়ে ওদের নিয়ে আসি। রাজা জানে, আমার শিরায় বইছে বৃক্ষজাতির রক্ত। তাছাড়া ওদের ভাষায় কেবল আমিই কথা বলতে পারি। ছোট বেলায়ই বাবা আমাকে এই ভাষাটা শিখিয়েছে।’

র্যাচেলের মাথার ভেতর একটা সতর্ক ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। বলল, ‘আমাদেরকে তাহলে আলাদা হয়ে যেতে হবে?’

‘হ্যাঁ, লেডি, কিছুদিনের জন্য আমাদের আলাদা হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা আপনার জন্য খারাপ হবে না। কারণ আপনাকে বাড়ি ফেরানোর কোন উপায় না পেয়ে রাজাকে আমি বলেছি, এক শর্তে ওই পুরোহিতদের সাথে কথা বলবেন আপনি। শর্তটা হচ্ছে, আপনার সাথে কথা বলে রাজাকে যা জানানোর তা জানিয়ে দেবে পুরোহিতরা। কিন্তু ওদের কথা রাজার মনঃপূত হোক বা না হোক, এক মুহূর্তও দেরি না করে আপনাকে আপনার নিজের এলাকায় ফিরে যেতে দিতে হবে। শর্তে রাজি হয়েছেন ডিনগান। এখন পুরোহিতদের আনতে আমাকে যেতে হবে। ততদিন আপনি যেন এখানে নিরাপদে থাকেন তা নিশ্চিত করবে ডিনগান। এবং বাড়ি ফিরতে আপনার দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে রামাহ-তে দূত পাঠাতেও সম্মত হয়েছে রাজা,’ বলল নোয়ি।

‘বৃক্ষজাতির এলাকায় পৌঁছাতে কতদিন লাগবে তোমার, নোয়ি? আর পুরোহিতরা যদি আসতে অসম্মতি জানায়, তখন কী

হবে?’

‘ওই পথে আমি কখনো যাইনি, লেডি। তাই বলতে পারছি না তা কতদিনের পথ। তবে খুব দ্রুত চলার চেষ্টা করব। ক্লান্ত হয়ে পড়লে পালকিতে চড়ে বসব। দ্রুতগামী পালকি বাহকরা আমাকে বয়ে নেবে তখন। তবে ওই দেশে ঢোকান কিছু গোপন পথ আছে। সেগুলো যারা জানে, তাদের জন্য দেশটা খুব বেশি দূরে নয়। তদুপরি, বৃক্ষমাতা আমার বাবার বোন। কাজেই আশা করি, আমার প্রার্থনা তারা শুনবে। অন্তত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দেবে। এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ আমি। তবে কীভাবে নিশ্চিত হয়েছি তা দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না।’

কিন্তু তারপরও তর্ক চালিয়ে গেল র্যাচেল। বোঝাতে চাইল লম্বা সফরে একা বের হওয়া নোয়ির জন্য নিরাপদ নয়। পথে হাজারটা বিপদ তো আছেই। তার ওপর ওত পেতে থাকতে পারে ইসমাইল নামের বিষাক্ত সাপ। নোয়িও পালটা যুক্তি দিল। যুক্তি আর যুক্তি খণ্ডন চলল বহুক্ষণ ধরে। শেষে রণে ভঙ্গ দিল র্যাচেল। তার মানে এই না, যে যুক্তি দিয়ে ওকে প্রভাবিত করতে পেরেছে নোয়ি। না, তা নয়। ও আসলে বুঝেছে, নোয়ি যতটুকু বলছে তার বাইরেও ওর নিজস্ব আরো কিছু কারণ আছে। মূলত সেই জন্যই নিজের দেশে যেতে চায় নোয়ি। তবে সেই কারণটা বা কারণগুলো সম্বন্ধে র্যাচেলের কাছ থেকে এড়িয়ে গেছে নোয়ি।

র্যাচেল বলল, ‘বুঝেছি। তোমার বিশ্বাস, তোমার জীবনের লোকদের সঙ্গে কথা বলার সাথে জড়িয়ে আছে আমার ভাগ্য, তাই তো?’

আত্মবিশ্বাসী নোয়ি দৃষ্ট স্বরে বলল, ‘হ্যাঁ, লেডি, তা-ই আমার বিশ্বাস।’

‘ঠিক আছে, যাও তাহলে। কিন্তু যত জলদি সম্ভব ফিরে এসো। তোমাকে ছাড়া এই বিরান দেশে সত্যিই ভীষণ একা হয়ে

যাব আমি,' বলতে বলতে নোয়ির হাত দুটো ম্লিয়ে তার উল্টো পিঠে চুমু খেল র্যাচেল।

সেদিন ঘুমুতে যাবার আগে নোয়িকে ইসমাইলের কথা জিজ্ঞেস করল র্যাচেল। জবাবে র্যাচেল জানাল যে, ও শুনে এসেছে, ইসমাইলকে রাজার সামনে হাজির করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রহরীদের তত্ত্বাবধানে তার নিজের ক্রালেই আছে সে। নোয়িকে যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে তাদের একজন বলেছে, এখান থেকে বের হবার সময় ইবুবেসিকে বেশ উত্তম মধ্যম দেয়া হয়। সে সময় তার চোখের পাশে একটা আঘাত লাগে। সেই আঘাতের প্রভাবে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে সে। চিকিৎসকরা তাকে দেখে রাখছে।

নোয়ি এরপর হিংস্র কণ্ঠে বলল, 'খুব খুশি হতাম যদি সংজ্ঞার সাথে সাথে ওর প্রাণটাও শরীর ছাড়ত। বহু ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম আমরা। কিন্তু জানি, সময়ের আগে তা হবার নয়।'

পরদিন সকালে কয়েকজন ওঝা আর প্রহরী হিসেবে কিছু জুলু সৈন্য সাথে নিয়ে দেশের পথে রওনা হলো নোয়ি। ও বিদায় নেয়ার আগে জুলুদেরকে র্যাচেল বলে দিল যে, ওর নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব। এর অন্যথা হলে প্রাণ দিয়ে তার দায় শোধ করতে হবে। জবাবে জুলুরাও বলল, এটা তাদের জানা আছে। তাদের ভুল বা গাফিলতির কারণে নোয়ির যদি ক্ষতি হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড মেনে নিতেও আপত্তি নেই তাদের।

নোয়ি রওনা হবার আগে বোয়েরদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা যা র্যাচেল জানে তা ওকে জানাল। বোঝাতে চাইল বোয়ের আর জুলু যোদ্ধারা মুখোমুখি হলে তা কী মারাত্মক রূপ নেবে।

জবাবে নোয়ি বলল যে, কথাগুলো তার মনে থাকবে। তবে এগুলো বলা অর্থহীন। কারণ "বোলের পানিতে" সবই দেখতে

পায় রাজাদের আত্মারা ।

ঠিক ওই মুহূর্তে নোয়ির কথার অর্থ জিজ্ঞেস করতে পারেনি র্যাচেল । এরপরই সজল নয়নে রওনা হয়ে যায় নোয়ি । র্যাচেলের চোখেও দেখা দিল অশ্রু বিন্দু । দরজা বন্ধ করে বাড়ির সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল র্যাচেল । দেখতে পেল, প্রায় একশ' বর্ষাধারীর বহর চলেছে নোয়ির সাথে । এদের অর্ধেকই অবশ্য বেয়ারা । খাবার, পানি ইত্যাদির সাথে উপহার হিসেবে ক্যারোস ও আরো বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস বয়ে নিয়ে চলেছে তারা । আর বইছে হালকা একটা পালকি । দলের সামনে আছে তিনজন ওঝা । আর সবার সামনে হেঁটে চলেছে সাদা পোশাক গায়ে নোয়ি । ওর হাতে একটা কচি ডাল । তাতে চকচক করছে সবুজ পাতা । একটা বাঁকের সামনে গিয়ে র্যাচেলের উদ্দেশে হাতের ডালটা নাড়ল নোয়ি । এই বাঁকটা পার হয়ে গেলেই আর ওদেরকে দেখা যাবে না । চলে গেল ওরা । ঘরে ফিরে এল র্যাচেল । একা, ক্রন্দনরতা ।

নোয়ি বিদায় নেয়ার পরের দিনের কথা । কয়েকজন ইন্দুনাকে সাথে নিয়ে হাজির হয়েছে টাম্বুসা । সে এসে বলল, ইনকোসাজানা দেশের সবচেয়ে বড় বিচারক । সেই কারণে রাজা জানতে চেয়েছে কিছু জটিল মামলার বিচার করতে রাজার ক্রালে যেতে ইনকোসাজানার আপত্তি আছে কিনা ।

র্যাচেল উত্তর দিল যে, এখানে সব কিছুতেই রক্তের গন্ধ পায় ও । ওরা যদি একান্তই চায় যে, বিচারের কাজগুলো ইনকোসাজানা করবে, তাহলে মামলার বাদী-বিবাদীদের ওর ক্রালে হাজির করা হোক ।

পরদিন সকালে র্যাচেল অবাক হয়ে আশ্চর্য হইল, সত্যি সত্যিই ওরা চলে এসেছে । চল্লিশ পঞ্চাশজন শুভানুধ্যায়ী, সাক্ষী, যার যার প্রতিনিধি বা উকিল সহ হাজির হয়ে গেছে বাদী-বিবাদী

দুই পক্ষই। অপেক্ষা করছে, কখন ইনকোসাজানা বিচার কাজ আরম্ভ করবে। স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে র্যাচেল বলল এখনই বিচার কাজ শুরু হবে।

তবে র্যাচেল অস্বীকার করবে না যে, বিচার-আচার ও আইন-কানুন বিষয়ে ওর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ওর বাবা কেপ কলোনির জাস্টিস অভ পিস হওয়ার সুবাদে তার সংগ্রহে থাকা আইন বিষয়ক কিছু বই ও ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ডারবানে থাকতে এক দু'বার তৎক্ষণাৎ শুরু হওয়া দুয়েকটা বিচারকার্যও দেখেছে। বিচার আচার সংক্রান্ত র্যাচেলের জ্ঞান এতেই সীমাবদ্ধ। তবে সত্যানুসন্ধানী হওয়ায় আর সহজাত প্রবৃত্তির সুবাদে বেশ ভাল বিচারই করল র্যাচেল।

র্যাচেলের প্রথম মামলাটা বেশ ঝামেলাদার। বাদী-বিবাদী দুইজনই জুলুল্যাণ্ডের বেশ বড় ও প্রভাবশালী দুই সর্দার। এদের একজনের পক্ষে রায় হলে অনিবার্যভাবে অপরজনের বিরাগভাজন হবে রাজা। তাই বিচারের ভার র্যাচেলের কাঁধে চাপিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে ডিনগান।

লম্বা সময় ধরে বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনল র্যাচেল। এক পর্যায়ে একজন সাক্ষী তলব করল বাদীর উকিল। সাক্ষী এমনভাবে কথা বলতে লাগল যে, র্যাচেলের স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল লোকটি মিথ্যা বলছে। কাজেই এবার মুখ খুলল র্যাচেল। বলল, ইনকোসাজানা-ই-জুলার সামনে সবসময় সত্য উন্মুক্ত। অথচ তার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছ? এত বড় সাহস? গবাদি পশু সংক্রান্ত সব কিছুই আমার খুব ভাল করে জানা আছে।

এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল লোকটি। হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। এবং সবার সামনে স্বীকার করল বাদী তার খালাত ভাই, ভাইয়ের কাছ থেকে বিরাট

“উপহার” পাওয়ার লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছে সে। এবার রায় দিল র্যাচেল। জরিমানা হিসেবে রাজাকে বেশ কিছু গরু দিতে হলো বাদীকে। আর রায় যা হবার তো হলোই। সেই সাথে ভবিষ্যতে তাকে সৎ থাকার হুকুম করল র্যাচেল। ব্যস, সুবিচারক হিসেবে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ল র্যাচেলের নাম। ফলে প্রতিদিনই ওর দুয়ারে বিচার প্রার্থীর ভিড় বাড়তে থাকল। র্যাচেলও সাধ্যমতো সুবিচার করল। তবে যেসব মামলা জাদু করার সাথে সম্পর্কিত বা শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া লাগতে পারে, এমন বিচার ও করে না। সোজা বলে দেয়, ইনকোসাজানার হাত দিয়ে মৃত্যুর হুকুম হওয়া শোভনীয় নয়। তাই এই কাজ ও করবে না। ওসব মামলার বিচারের দায়িত্ব রাজা ও তার কাউন্সিলের ওপর বর্তায়। এভাবেই জুলুল্যাণ্ডে ওর নাম ছড়িয়ে গেল যে, “সুবিচারক” যাকে ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না বা ভয় দেখানো যায় না। ইনকোসাজানার গৌরবের মুকুটে যুক্ত হলো আরো একটি পালক।

বিচার ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। সারাদিন ধরে এই কাজ করা সম্ভব না। তবে, আশার কথা হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায়। ফলে ওখানেই শেষ হয় মামলা। প্রতিদিনই নিয়ম করে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে র্যাচেল। সময়টা ভালই কাটে তখন। কিন্তু ঝামেলা শুরু হয় এর পর। পরের সময়টা আর কাটতেই চায় না। পরবর্তী দিন সকাল পর্যন্ত নিরানন্দ একাকী সময় কাটাতে হয় ওকে।

এর মধ্যে র্যাচেল একবার রামাহ-এর উদ্দেশে দূত পাঠাল। দশদিন পর লোকটি ফিরে এসে বলল টেগুলায় বান ডেকেছে। নদী পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। তাই কোন পথের আনতে বা দিতে পারেনি সে। লোকটিকে আবার পাঠাল র্যাচেল। এক সপ্তাহ পরে জানতে পারল সিংহ খেয়ে ফেলেছে তাকে। এরপর দূত হিসেবে

আরেকজনকে পাঠাল ও। তার যে কী হয়েছে কেউ বলতেই পারল না। এসবের অর্থ আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর মধ্যেই র্যাচেল জানতে পারল, সুস্থ হয়ে উমগুনগুনলোভু থেকে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে ইসমাইল। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সেই দিন থেকেই ভয় পেতে শুরু করল র্যাচেল। ধরেই নিল ওর সাথে যোগাযোগ না করে ইসমাইলের পালিয়ে যাওয়া কোনভাবেই শুভ ফল বয়ে আনবে না। দুয়েকবার ভাবলও যে, নোয়ির পরামর্শ মতো শাস্তির জন্য ইসমাইলকে রাজার হাতে তুলে দিলেই বোধ হয় ভাল হতো। আর এত দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু এর মধ্যে নোয়ির নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করল না কেউ। ওর খবরই কেউ জানে না। যেন আক্ষরিক অর্থেই গায়েব হয়ে গেছে মেয়েটি।

একটু একটু করে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে র্যাচেল। যতক্ষণ বিচার কাজ চলে, লোক সমাগম থাকে, খুব দৃঢ়চিত্ত দেখা যায় র্যাচেলকে। কিন্তু সবাই চলে গেলে নিজের ঘরে ফিরে আসে ও। পশমের বিছানায় শুয়ে পড়ে, কখনো বা ভেঙে পড়ে কান্নায়। কারণ সত্যি বলতে, যতই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ওর ওপর আরোপ করা হোক না কেন, আদপে র্যাচেল একাকী এক তরুণী।

ঝড়ের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই ব্যাপক বজ্রঝড় উঠছে। একদিন একটা বজ্রপাত আঘাত করল ওর ক্রালের সামনে একটা লৌহসমৃদ্ধ পাথরের ওপর ঝড় ঝঞ্ঝাকে আগে কখনোই ভয় পায়নি র্যাচেল। কিন্তু এখন ভয় পেতে লাগল ও। কিন্তু ভয়টাকে নেটিভদের সামনে প্রকাশ করা সম্ভব না। কারণ, নেটিভদের বিশ্বাস বজ্রপাত নিয়ে খেলা করে স্বয়ং জুলা, তাহলে ও কেন বজ্রকে ভয় পাবে? আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বেশ কয়েক বছর খরা যাওয়ার পর এই বছরই পরিপূর্ণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ধরেই নেয়া হলো এটি জুলুল্যাও ইনকোসাজানার

উপস্থিতির ফসল। ভেবে নিল জুলার উপস্থিতির কারণেই সৌভাগ্য ফিরে পেয়েছে জুলুল্যাণ্ড। এর মধ্যেই এক ওঝার ঘরে বজ্রপাত হলো। মারা পড়ল সে ও তার বড় বৌ। ঘটনাক্রমে এর দু'দিন আগে প্রকাশ্যেই সে বলেছিল, র্যাচেল ইনকোসাজানা নয়, ওর ক্ষমতায় ওই ওঝার মোটেও বিশ্বাস নেই। ফলাফল সহজেই অনুমেয়। সবাই ধরে নিল স্বয়ং ইনকোসাজানা শোধ তুলেছে অথবা ইনকোসাজানার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে স্বর্গ। ফলে যে দুয়েকজন র্যাচেলের ইনকোসাজানা হওয়া না হওয়া নিয়ে উচ্চবাচ্য করত, একদম বন্ধ হয়ে গেল তাদের মুখ। র্যাচেল হয়ে উঠল জুলুল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

এদিকে একেকটা দিন যাচ্ছে আর রাতগুলোকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর মনে হচ্ছে র্যাচেলের। রাত যেন কাটতেই চায় না। আগে খুব ভাল ঘুমাত র্যাচেল। এখন ঘুমও আসে না। যদিও বা আসে, একের পর এক দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে ও। সেগুলোর বক্তব্য সবসময়ই এক। দেখে ওর মা খুব অসুস্থ, ওকে ডাকছে সে। প্রতিদিন একই স্বপ্ন দেখতে দেখতে র্যাচেলের বিশ্বাস জন্মে গেল যে ওর মা আসলেই অসুস্থ। কাজেই সিদ্ধান্ত নিল নোয়ির জন্য আর অপেক্ষা করবে না। চলে যাবে। কথাটা টাম্বুসার মাধ্যমে ডিনগানকেও জানাল র্যাচেল। পরদিন রাজার জবাব এল। রাজা বলে পাঠিয়েছে, ইনকোসাজানাকে আটকে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। তবে যেতে হলে ইনকোসাজানাকে উড়ে যেতে হবে। কীরণ টেঙুলার পানি উপচে পড়ার অবস্থা। নদীর এমন কোন বঁক নেই যেখানে স্রোত একটু কম। উপরন্তু, পলাতক ইকুয়েসিকে ধরার জন্য রাজা যে সেনাদল পাঠিয়েছে তারাও টেঙুলার অপর পাড়ে আটকে গেছে। আসতে পারছে না।

র্যাচেল বুঝে নিল, যাওয়া যাবে না। এমনকী নদী পার হওয়ার কোন উপায় যদি থেকেও থাকে তবুও ওকে যেতে দেবে

না জুলুরা। কাজেই দুঃস্বপ্ন সঙ্গী করে এখানেই থাকতে হবে ওকে। তবে আশার কথা হচ্ছে মাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা কমতে শুরু করল। ওই জায়গা নিল মোটামুটি আনন্দদায়ক বিভিন্ন স্বপ্ন। এর মধ্যে একটা ছিল রিচার্ড ড্যারিয়েনের সাথে নদীর পাড় ধরে হাঁটা। ওই স্বপ্নটার ব্যাপারে এর বেশি আর কিছু ওর মনে নেই। যদিও র‍্যাচেল অনেক আগেই ধরে নিয়েছে মারা গেছে রিচার্ড। তবে ওর মনের গহীন কোণে এখনও নিভু নিভু হয়ে জ্বলে আছে ছোট্ট একটু আশার আলো যে, হয়তো এখনো বেঁচে আছে রিচার্ড। এক না একদিন ওর কাছে ফিরেও আসবে সে। ওই স্বপ্ন দেখার পর থেকে কেবল রিচার্ডকে নিয়েই ভাবে র‍্যাচেল। ভাবনাটা ওর ভেতর কেমন একটা অদ্ভুত শক্তি এনে দেয়।

মাঝে মাঝেই র‍্যাচেল ভাবে, রিচার্ডের ভাবনা থেকে ওর মন সরে না কেন? তাহলে কি আবার ওদের দেখা হতে যাচ্ছে? চিন্তাটা আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলে ওকে। র‍্যাচেলের আরো মনে পড়ে, ওর মা সবসময়ই বলত, ওর জীবনে অবশ্যই ফিরে আসবে রিচার্ড ড্যারিয়েন। তাহলে কি মায়ের ধারণাই ঠিক? আসলেই কি র‍্যাচেলকে এখান থেকে উদ্ধার করবে রিচার্ড? ওহু, তাই যদি হয়, তো এখন আর কিছুকেই ভয় পায় না র‍্যাচেল। তারপরই ও ভাবল যে, নাহু, ওকে নিয়ে খেলছে ওর মস্তিষ্ক। না, আর খেলা নয়। কিছুতেই আত্মনিয়ন্ত্রণ খোয়াবে না র‍্যাচেল। কিন্তু তাহলে বারবার কেন স্বপ্নে এসে ওকে আশা দিচ্ছে রিচার্ড?

নোয়ি চলে যাওয়ার পর এক মাস পার হয়ে গেছে কিন্তু ওর কোন খবর নেই। ওদিকে রিচার্ডকে নিয়ে র‍্যাচেল আর স্বপ্ন দেখছে না। তবে মাকে দেখছে নিয়মিত। এদিকে প্রতিদিন সকালে আদালতে বসছে র‍্যাচেল। এক সকালে আপোষ রফার মধ্য দিয়ে ঝামেলাপূর্ণ এক বিচারের ফয়সালা করল ও। তারপর বাদী-বিবাদীর প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না শুনেই এজলাস ত্যাগ

করল ও। কেন যেন খুব খারাপ লাগছে র‍্যাচেলের। খাবার দেয়া হলে সেটাও খেতে পারল না। ক্রমাগত একই খাবার খেতে খেতে ওসবের ওপরও ঘেন্না ধরে গেছে ওর।

প্রতিদিনকার মতো আজও ঝড় ঘনিয়ে আসছে। বাতাস হয়ে উঠেছে ভীষণ ভারী। প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে উঠছে র‍্যাচেল। এর মধ্যে ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না। একটু বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে ওভেনের মতো গরম কুঁড়ে থেকে বের হয়ে পুলের পাশে গাছের নীচে গিয়ে বসল ও। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। গাছের পাতা থেকে ওর হাতে মুখে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি। পানির শীতল স্পর্শে ঝরঝরে হয়ে উঠল ওর মন। বর্তমান ভুলে গেল ও। ডুব দিতে চাইল অতীতের সেই ঝড়ো দিনটায়। যেখানে প্রথম রিচার্ডের দেখা পেয়েছিল ও। ভাবছে এতদিনে পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠেছে সে।

আনমনেই আক্ষেপ করে বলল, ‘এখন যদি আমাকে সাহায্য করতে আসতে তুমি, রিচার্ড!’ বলতে বলতেই ঘুমে ঢলে পড়ল ও।

র‍্যাচেলের মনে হলো ঘুমের মধ্যেই সচেতন হয়ে উঠেছে ও। যেন একটা রহস্যময় দুয়ার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে ওর সামনে। তার প্রভাবেই চেতনা ফিরে পেয়েছে ও। ওর সামনে উন্মোচিত হলো ক্রালের পাশের স্বচ্ছ পানি ভরা পুল। পুলটার তলদেশের গ্রানিট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেখানে ফুটে উঠল একটা দৃশ্য। দেখল:

একটা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকৃতির অনেকগুলো ওয়াগন। ওগুলোর পাশেই বসে আছে লম্বা চওড়া, স্বাস্থ্যবান, দাড়িওয়ালা কিছু হাসিখুশি লোক। ওখানে সাইপ টানতে টানতে কথা বলছে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন। তাড়াহুড়ো করে ওদের সামনে হাজির হলো এক যুবক। সাথে করে নিয়ে এসেছে অত্যন্ত

ক্লান্ত এক কাফ্রিকে। যুবকটি র্যাচেলের দিকে পিছু ফিরে থাকায় তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না র্যাচেল। তবে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে। যদিও ওর মনে হচ্ছে কথাগুলো ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

দাড়িওয়ালা লোকটি ডাচ ভাষায় যুবককে প্রশ্ন করল, ‘কী ব্যাপার, ভাতিজা, কী হয়েছে? এমন হুড়োহুড়ি করছ কেন?’

জবাবে একই ভাষায় যুবকটি বলল, ‘চাচা, ব্যাপার হচ্ছে জুলুদের ওপর গুপ্তচরগিরি করার জন্য ওকে পাঠিয়েছিলাম আমরা। ওর নাম কুয়াবি। আগে শুনেছিলাম, লোকটি মারা গেছে। কিন্তু আসলে ডিনগানের ক্রাল উমগুনগুনকলোভুতে পৌঁছে গিয়েছিল সে। ভারী অদ্ভুত একটা গল্প নিয়ে ফিরেছে লোকটা।’

‘সব চরই দেখছি, অদ্ভুত গল্প নিয়ে ফিরতে শুরু করেছে। তবুও, বলো তোমার গল্প,’ বলল দাড়িওয়ালা ভারিকী চেহারার লোকটি।

ক্লান্ত লোকটি শুরু করল তার লম্বা গল্প। প্রথমেই শোনাৎ জুলুল্যাণ্ডে কীভাবে ঢুকল সেই গল্প। জুলুল্যাণ্ডে ঢুকে ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠে সে। ওখানে অবস্থান করেই বোয়েরদের সম্বন্ধে ডিনগান আর তার ইন্দুনাদের মনোভাব বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। এরই মধ্যে কোন এক সাদা আত্মার ব্যাপারে কিছু কথা শুনতে পায় সে। লোকে তাকে ডাকে ইনকোসাজানা-ই-জুলা নামে। নাটালে বাবা-মায়ের কাছে থাকে সে। তার বাবা নাকি ধর্ম শিক্ষক। জুলুল্যাণ্ডে থাকতে থাকতেই কুয়াবি শুনেছে নাটাল থেকে রওনা হয়েছে সে। রাজার কাছে আসছে।

আবার কথা বলল সেই দাড়িওয়ালা। ‘হ্যাঁ, ঈশ্বর, এ যে আশাড়ে গল্পকেও হার মানাবে দেখছি! সাদা হোক বা কালো, আত্মার আবার বাবা-মা থাকে কেমন করে? তারা নাকি আবার ধর্ম শিক্ষক!’

জবাবে ক্লান্ত কালো লোকটি বলল, আত্মার বাবা-মা কীভাবে থাকে সে জানে না। যা শুনেছে, দেখেছে তা-ই সে বলছে। এই বলে গল্প বলা চালিয়ে গেল ও। বলল যে, স্বর্গীয় দেবীর আগমন উপলক্ষে জুলুল্যাণ্ডের সবাই খুব উত্তেজিত। সে নিজেও এই ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তাই সত্যিকারের তথ্য জানার জন্য নিজের আত্মীয়কে সাথে নিয়ে টেগুলার দিকে রওনা হয় ও। টেগুলার কাছাকাছি এসে এক জায়গায় লুকিয়ে বসে পড়ে ওরা। অপেক্ষায় থাকে ইনকোসাজানা কখন আসবে। সেই জায়গার প্রতিটা মাটি পাথরের বর্ণনা দিল গুপ্তচরটি। র্যাচেলও চিনতে পারল, জায়গাটি হচ্ছে যেখানে গরু সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ঘটে ও মারা পড়ে ওঝা বুড়ি।

এরপর সদলবলে র্যাচেলের আগমন, ষাঁড়ের হামলা, গবাদি পশুর পালের মৃত্যু, র্যাচেলের হাতে থাকা গণ্ডারের শিঙের দণ্ড, ওঝা কর্তৃক ঘোড়াকে ঘুরাতে যাওয়া, তারপর তার মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুর সবিস্তার বর্ণনা দিল লোকটি। এরপর ওদের পিছু নেয় সে। এবং ক্রমানুসারে উমগুনগুস্কলোভুতে র্যাচেলের পৌঁছানো, রাজার সাথে তার সাক্ষাৎ, বোয়েরদের ওপর আক্রমণ করতে রাজাকে নিষেধ করা সহ সবকিছুর সবিস্তার বর্ণনা দিল কুয়াবি নামের লোকটি।

এবার সেই দাড়িওয়ালা লোকটি প্রশ্ন করল, ‘সেই মহিলাটি এখন কোথায় আছে?’

‘উমগুনগুস্কলোভুতে আছে, সর্দার। দেশের সবচেয়ে বড় ওঝার মতো রাজার পাশাপাশি দেশ শাসন করছে সে।’

‘আমার মনে হচ্ছে, ভাতিজা, আমাদের সুবন্ধু এই মহিলাটির ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর করা দরকার। তাহলে, খবর নিতে কে যেতে চাও?’ বলল লোকটি।

সাথে সাথেই যুবকটি বলল, ‘আমি যাব,’ বলতে বলতেই

ঘুরে দাঁড়াল যুবকটি। তার মুখে দাড়ি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল করার কোন উপায় নেই। এ যে রিচার্ড, রিচার্ড ড্যারিয়েন!

‘কিন্তু এই বিপজ্জনক মিশনে তুমি কেন যেতে চাইছ? ওই মহিলা বা আত্মাকে দেখতে চাও, ভাতিজা?’

‘হ্যাঁ, চাচা। আমাকে হয়তো বোকা ভাবছেন। তবে আসলে আমি বোকা নই। বহু বছর আগে এক ধর্মপ্রচারকের মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। এতদিনে কুয়াবির বর্ণনার মতোই হয়ে ওঠার কথা সেই মেয়েটির। আসলে গত বছর আপনাদের দলে আমি যোগ দিয়েছিলাম সেই মেয়েটিকে খোঁজার উদ্দেশ্যেই। তাই, যেহেতু হাতে সুযোগ এসেছে, দেরি না করেই নদী পার হতে চাই আমি।’ এ পর্যন্ত আসতেই স্বপ্ন হালকা হয়ে গেল। চলে গেল সব দৃশ্য। অবশ্য র‍্যাচেলের ঘুম এখনো ভাঙেনি।

তাই আবার স্বপ্নটাকে ফেরাতে চেষ্টা করল ও। অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে কালো একটা পর্দা যেন সরে গেল। পুলের পানিতে আবার ফুটে উঠল আরেকটা দৃশ্য। দেখল একটা কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রিচার্ড। ঘোড়াটার একটা পায়ের রঙ সাদা। পাশেই ছুটে চলেছে সেই কালো গুপ্তচরটি, যার নাম কুয়াবি।

কুয়াবিকে প্রশ্ন করল রিচার্ড, ‘উমগুনগুনকলোভু কত দূরে?’

‘নদী যদি ফুঁসে না ওঠে বা কোন কারণে দেরি না হলে এখান থেকে তিন দিনের পথ, সর্দার,’ বলল কুয়াবি।

এক সেকেণ্ডের জন্যই যেন এগুলো দেখতে পেল র‍্যাচেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সব চলে গেল। ঘুম ভেঙে গেল র‍্যাচেলের। ছুটে পুলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। কিন্তু ওখানে সেখানে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। টলটলে পানির গভীরে দেখা যাচ্ছে গ্রানিটের তলদেশ।

ভেরো

সূর্য ডোবার পর ঘরে ফিরে এল র্যাচেল। বুঝতে পারছে না কী আশা করবে। সত্যিই কি রিচার্ড আসছে? এখনও কি র্যাচেলের কথা মনে আছে ওর? পুলের পানিতে দেখা স্বপ্নদৃশ্যটা সত্যি বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন উঠছে যে, কেন ব্যাপারটি ওর কাছে উন্মুক্ত করা হলো? জুলুরা হয়তো অনায়াসে এটা মেনে নেবে। কিন্তু র্যাচেলের আধুনিক মন তা মানতে পারছে না। বারবার নিজেকেই ও প্রশ্ন করছে আসলেই কি রিচার্ড আসছে? কিন্তু আবার ফিরে আসছে সেই আগের প্রশ্নটিই।

মানুষের চোখে দূরের দৃশ্য কখনো উন্মুক্ত করা হয় না। সেই অনুমতিই দেয় না প্রকৃতি। তাহলে এবারে কেন ব্যতিক্রম হলো? র্যাচেল জানে ওর মায়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব ভাল কাজ করে। ওরও তাই। কিন্তু তাই বলে এত স্পষ্টভাবে কিছু দেখা কি সম্ভব? নাকি পুরো ব্যাপারটাই ওর ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত একটা স্বপ্ন মাত্র?

পরক্ষণেই র্যাচেলের মনে হলো, না তা নয়। কারণ দৃশ্যটা থেকে ওর লাভ সামান্যই আছে। তা-ও ওর ক্রমাগত প্রার্থনার জবাবে কেবল একটু সান্ত্বনা পাওয়া মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটার আসল মহত্ত্ব অন্য জায়গায়। দৃশ্যটা ওকে দেখানো হয়েছে রিচার্ডের নিরাপত্তার জন্য। কারণ বোয়েরদের সাথে জুলুরা দ্বন্দ্ব চলছে।

একজন অপরিচিত সাদা লোকের জন্য জুলুল্যাও এখন তপ্ত উনুন। কাজেই যে কোন শ্বেতাঙ্গ যদি এখন এই দেশে আসে এমনিতেই বিরাট বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে সে। তার ওপর জুলুরা যদি শোনে-সে আসছে ইনকোসাজানার সাথে দেখা করতে, তাহলেই কন্ম সাবাড়। ওই লোকের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সাথে সাথেই র্যাচেল সিদ্ধান্ত নিল, যা হয় হবে। ইনকোসাজানার সুনাম খোয়াতে হলে খোয়াবে, কিন্তু ঝুঁকি ও নেবেই। ভৃত্য মেয়েটিকে বলল প্রহরীকে ডেকে আনতে। ক'জন ভৃত্য মেয়ের সাথে হাজির হলো প্রহরী জুলু। লোকটিকে র্যাচেল বলল, এখনি ডিনগানের কাছে ছুটে যাও, যত জলদি পারো একটা পালকি আনাও। রাজার সাথে অতি জরুরী বিষয়ে কথা বলব আমি। ছুটে চলে গেল লোকটি।

লোকটি চলে গেলে পরে খেতে বসল র্যাচেল। বহুদিন পর ভরপেট খেল। এর মধ্যেই হাজির হলো পালকি আর প্রহরী। সাথে সাথেই একশ' গার্ডের প্রহরায় রওনা হলো র্যাচেল। এক মাস আগের মতোই চন্দ্রালোকিত রাতে রাজা ডিনগান আর তার কাউন্সিলের সামনে এসে দাঁড়াল র্যাচেল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বায়াতে দিল ওকে। এবার এমনকী মাংসের পাহাড় ডিনগানও বহু কষ্টে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের সালামের উত্তরে একবার হাতের শিং-দণ্ড তুলল র্যাচেল। তারপর চুপ করেই রইল।

প্রথমে মুখ খুলল রাজা। 'এক মাস আগে যে কঠিন কথাগুলো বলেছিলেন আজ কি সেগুলোর অর্থ বলতে এসেছেন, সাদা আত্মা?'

'না, রাজা। যা বলার ছিল একবারই বলেছি। যেভাবে ইচ্ছা তার অর্থ ভেবে নিন। অথবা ভূত জাতির অবিষ্মৎ বক্তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। শুনে রাখুন, রাজা ও ইন্দুনাগণ, আমাকে এখানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে রেখেছেন আপনারা। অছিলা দিয়েছেন

টেঙলায় বান ডেকেছে, আমার ঘোড়া অসুস্থ, আমি চলে গেলে এদেশ থেকে সৌভাগ্য চলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মতো আপনারাও জানেন চাইলে মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু যাইনি। কারণ চোরের মতো রাতের আঁধারে পালিয়ে যাওয়া ইনকোসাজানাকে শোভা পায় না। তাই ঘরেই রয়ে গেছি। তবে আপনাদের ওপর খুব রেগে আছি আমি। আমার কথা সাদা মানুষরাও শোনে। একবার ভেবেছিলাম, বাফেলো নদীর ওপাড়ে ক্যাম্প করা আমাবুনাদের ডেকে আনব। ওরাই আমাকে মুক্ত করে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে।’

কঠিন কথা শুনে নড়েচড়ে বসেছে রাজা। ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে ইন্দুনাদের মধ্যেও। একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমাবুনারা যে বাফেলো নদীর পাড়ে ক্যাম্প করেছে সেই কথা সে জানল কী করে?’ র্যাচেল খেয়াল করল কথাটা বলেছে হাত পোড়া মোপো।

র্যাচেল বলে চলেছে, ‘কিন্তু ওদেরও ডাকিনি আমি। কারণ তাহলে লড়াই হবে, রক্তপাত হবে। রক্তপাত ঘৃণা করি আমি। তবে একটা কাজ করেছি। ওই আমাবুনাদের দলে একজন ইংলিশ সর্দার আছে। বয়সে সে তরুণ। তার নাম ড্যারিয়েন। বহু বছর আগে থেকেই তাকে চিনি আমি। একবার আমার উপকার করেছিল সে। তাকে আমি হুকুম করেছি এদিকে আসার জন্য। সে-ই আমাকে টেঙলার ওপাড়ে নিয়ে যাবে। এখান থেকে মাত্র তিন দিনের দূরত্বে আছে সে। এখন আমি এসেছি রাজাকে অনুরোধ করতে যে, ওই লোককে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতে এখনি একজন গাইড পাঠানো হোক। দ্রুত ছুটতে পারে এমন একজনকে গাইড হিসেবে পাঠাতে হবে,’ এ পর্যন্ত বলে থামল র্যাচেল।

এবার ডিনগান প্রশ্ন করল, ‘কোন্ দূত দিয়ে “ডোরিয়াকে”

আসতে হুকুম করেছেন, জুলা? আমরা তো আপনার ক্রাল থেকে কাউকে বের হতে দেখিনি?’

‘আপনার কি মনে হয় যে, আমার দূতকে চোখে দেখবেন আপনি? আমার দূতকে কেউ দেখতে পায় না। আমার চিন্তাই আমার দূত। ওই লোকের কাছে উড়ে গেছে আমার চিন্তা। মনের কানে আমার ডাক শুনেছে সে। আর তারপরই পুলের পানিতে দেখেছি রওনা হয়েছে সে।’

‘ও-ও!’ আশ্চর্যবোধক গুঞ্জনধ্বনি উঠল ইন্দুনাদের ভেতর থেকে। ওরা বলল, ‘ইনকোসাজানার হুকুম পাখির মতো উড়ে যায়! এমনকী পুলের পানিতে তার বাস্তুবায়ন হতে দেখে সে! সত্যিই বিরাট শক্তিশালী জাদু ক্ষমতা আছে তার।’

র্যাচেল বলে চলেছে, ‘সর্দার ড্যারিয়েনের চুল দাড়ি সোনালী, চোখ আমার মতো, গায়ের রঙ ফর্সা। আমার চোখ ঠিক দেখে থাকলে একটা কালো ঘোড়ায় করে আসছে সে। ঘোড়াটার একটা পা সাদা। তার সাথে একজন মাত্র লোক আছে। কাফ্রি সে। দুবলা পাতলা, খাড়া কাঁধ, তার নাম কুয়াবি।

‘আমি নিশ্চিত, আমি জুলুল্যাওে আসার আগে এখানে তার কোন এক আত্মীয়ের কাছে এসেছিল সে।’

রাজা জিজ্ঞেস করল যে, ইন্দুনাদের কেউ কুয়াবি নামে কাউকে চেনে কিনা।

তখন বিব্রত কণ্ঠে এক ইন্দুনা বলল, সে শুনেছিল যে, এই নামে এক লোক শহরে ঢুকেছিল। এক সৈন্যের বাড়িতে উঠেছিল সে। আর ইনকোসাজানা যে সময়ের কথা বলেছেন সেটাও ঠিকই আছে। কিন্তু ইনকোসাজানা এখানে আসার আগেই শহর ছেড়ে চলে গেছে সে। তবে কোথায় গেছে তা ইন্দুনাটি জানে না।

এবার র্যাচেল বলল, ‘হ্যাঁ, একেই দেখেছি। এর মাথার চুল

কালো, কিন্তু দাড়ি সাদা, খাড়া কাঁধ ।’

আগের সেই ইন্দুনাটি বলল, ‘হ্যাঁ, লোকটির অদ্ভুত চেহারা-
ছবি দেখে আমিও তাকে লক্ষ করেছিলাম ।’

র্যাচেল বলল, ‘আপনার দূতকে তাড়াতাড়ি ডাকুন, রাজা ।
এই মুহূর্তে রওনা হতে বলুন ওদের । আর জেনে রাখুন, ওই সাদা
সর্দার আর তার ভৃত্য স্বর্গের নিরাপত্তা প্রাপ্ত । যদি তাদের কোন
ক্ষতি হয়, মনে রাখবেন, এই দেশে স্বর্গের অভিশাপ নেমে
আসবে । রক্তের বন্যা বয়ে যাবে জুলুল্যাণ্ডে । দূতদেরকে বলে
দিন, ড্যারিয়েনকে তারা বলবে, বন্যার সময় নদীর মাঝে যেদিন
ঝড় উঠেছিল, সিংহ গর্জন করেছিল গুহার দরজায় আর তীব্র
বজ্রপাত হচ্ছিল, সেদিন তার সাথে থাকা ইনকোসাজানা-ই-জুলা
তাকে জুলুল্যাণ্ডে স্বাগত জানিয়েছে ।’

এক ইন্দুনার দিকে তাকাল ডিনগান, বলল, ‘যাও,
ইনকোসাজানার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করো । সবচেয়ে
দ্রুতগামী দূতকে পাঠাও জুলার ডাকা সাদা, মানুষকে পথ দেখিয়ে
নিয়ে আসতে । আর মনে রেখো, যদি তাদের কোন ক্ষতি হয় তো
দূত তো মরবেই, তুমিও মরবে ।’

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই ইন্দুনা । ছুটে গেল দূত পাঠাতে ।

তার ঠিক পরমুহূর্তেই ক্রান্ত পরিশ্রান্ত এক লোক ছুটে এল ।
সোজা রাজার সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসে হাঁপাতে লাগল সে ।
বলল, ‘সংবাদ এনেছি, রাজা ।’

‘কী সংবাদ?’

‘পাহাড় থেকে পাহাড়ে খবর এসেছে, একজন ভৃত্য সহ এক
সাদা লোক কালো ঘোড়ায় চেপে বাফেলো নদী পার হয়ে এদেশে
চুকেছে । এখন, রাজা, আপনার হুকুম কী? তাকে কি মেরে ফেলব
নাকি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব?’

রাজা প্রশ্ন করল, ‘এই খবর কখন এসেছে?’

‘বাইরের পাহাড়ের গার্ড এই খবরটা নিয়ে কেবলই এসে গেটে দাঁড়িয়েছে। শুনেই ছুটে এসেছি, রাজা, এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। এটা ছাড়া আর কোন খবর আসেনি।’

এবার মুখ খুলল র্যাচেল। বলল, ‘রাজা, আপনার লোক খবর এনেছে বটে তবে দেরিতে এনেছে। তার চেয়ে অনেক দ্রুত কথা বলেছে পুলের পানি,’ বলে চুপ হয়ে গেল র্যাচেল। নেমে এল পিন পতন নীরবতা। একবার উঠানের সবাইকে দেখে নীরবে বের হয়ে এল ও।

হতভম্ব হয়ে গেছে র্যাচেল। নিজেকেই নিজে বারবার বলছে, ‘সত্যি! যা দেখেছি সত্যি!’ ভাবছে, এখন ওকে জুলুরা আরো সম্মানের চোখে দেখবে। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন ইনকোসাজানা নামটা আরো কঠিনভাবে জুড়ে বসবে ওর সাথে। এসব ভাবতে ভাবতে ঘরে পৌঁছল র্যাচেল। কোনরকমে পোশাক বদলে গুয়ে পড়ল। এবং ঘুমালও বেশ। নোয়ি যাওয়ার পর এমন শান্তির ঘুম ওর আর হয়নি।

টানা ঘুমের পর র্যাচেল জেগে উঠল পরদিন সকালে। তখন ওর মনে আবার সন্দেহ ফিরে এসেছে যে, ও কি কোন ভুল করল? একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, কোন অদ্ভুত উপায়ে নেটিভরা তাদের চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে দিতে পারে (পড়ুন, টেলিপ্যাথি করতে পারে)। এই ব্যাপারটা সাদাদের মোটেও বোধগম্য নয়। তারপরও তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, ডাকিনীবিদ্যার চর্চা অতীতেও ছিল, এখনও আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। এগুলোও হয়তো তেমনই কিছু। কিন্তু ওর বেলায় এটা কী হলো? ও তো ডাকিনীবিদ্যা বা কালো জাদুর চর্চা করে না! তাহলে? কালো ঘোড়ায় চড়া লোকটি কি আসলেই বিটার্ড ড্যারিয়েন? কোন ভুল হয়ে যায়নি তো? সে আবার ইসমাইল নয়তো? সে-ও তো শ্বেতাঙ্গ, তারও কালো ভৃত্য আছে। কিন্তু তা-ই বা হয় কী করে?

কারণ কুয়াবির ব্যাপারটাও তো মিলে গেছে!

পরের দুটো দিন অত্যন্ত জঘন্যভাবে কাটল। দিনে বিচার করে কিছু সময় কাটালেও বাকি দিন আর কাটেই না। শেষে অসহ্য হয়ে পুলের পাড়ে গেল ও। চেষ্টা করল ঘুমাতো। আশা, আবার যদি কিছু দেখা যায়। কিন্তু ফলাফল লবডক্ষা।

পরদিন টাম্বুসা এল। র্যাচেলের কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করার পর কথায় কথায় জানাল ওর ঘোড়াটা সুস্থ হয়ে উঠছে। এবং বলল, যদি সেদিন সেই সাদা লোকের কথা র্যাচেল না জানাত তাহলে গুপ্তচর ভেবে খুন করে ফেলা হতো তাকে।

তখন র্যাচেল বলল যে, ও বলতে ভুলে গেছে, সাদা লোকটিকে প্রথমে ওর কাছে নিয়ে আসতে হবে। রাজা তাকে স্বাগত জানাতে চাইলে পরে জানাতে পারে। তবে আগে ওর কাছেই তাকে আনতে হবে। আগে যদি এ বিষয়ে কিছু বলে না-ও থাকে, তাহলেও সবাইকে জানানো হোক যে এটাই ইনকোসাজানার হুকুম।

টাম্বুসা জানাল যে, হুকুম অবশ্যই পালন করা হবে।

এরপর র্যাচেল জানতে চাইল নোয়ির কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা। জবাবে টাম্বুসা বলল যে, যেদিকে নোয়ি গেছে ওদিকে জুলুদের কোন শত্রু না থাকায় ওই এলাকায় কোন খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়নি। ফলে ওর খবর কেউ জানে না। তবে ইনকোসাজানার জন্য এটা অবশ্যই কোন সমস্যা নয়। কারণ আধ্যাত্মিক উপায়ে ইনকোসাজানার অবশ্যই জানতে পারবে, কেমন আছে তার ভৃত্য নোয়ি। জবাবে র্যাচেল বলল সে অবশ্যই তা পারে। তবে ও নিয়ে ওর তেমন মাথা ব্যথা নেই। তারপর ইশারা করল যে আজকের মতো কথোপকথনের ইতি। পরে আবার কথা হবে। চলে গেল টাম্বুসা।

তৃতীয় দিন সকাল। রোজকার মতো বিচার করতে বসেছে

র্যাচেল। এক দূত ছুটে এল। এজলাসে কর্মরত এক ইন্দুনার কানে ফিসফিস করে বলল কিছু একটা। উঠে দাঁড়াল ইন্দুনা। ঘোষণা করল, ‘সাদা সর্দারকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। বাইরে অপেক্ষা করছে সে।’

শুনে র্যাচেল বলল, ‘বেশ, অপেক্ষা করুক,’ বলে বিচার কার্য চালিয়ে গেল র্যাচেল। তবে সত্যি বলতে বিভিন্ন মিশ্র আবেগের প্রভাবে চোখে কিছুই প্রায় দেখছে না ও। এত জোরে হার্টবিট হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ড্রাম বাজছে বুকের ভেতর। বিচার শেষ হলো একসময়। রীতি অনুযায়ী একবার বাউ করল ও। অর্থাৎ এবার সবাইকে চলে যেতে হবে। ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল প্রাঙ্গণ। রয়ে গেল শুধু ওর নারী ভৃত্যরা। ওদের একজনকেই র্যাচেল বলল, ‘যাও এবার, সাদা সর্দারকে আসতে বলো। তবে সমস্ত অস্ত্র রেখে আসবে সে। এবং একা আসবে। তোমরাও সবাই চলে যাও। দরকার পড়লে আমিই তোমাদের ডাকব।’

চলে গেল মেয়েরা সবাই। র্যাচেল একবার দেখে নিল ক্রালে আসলেই ও একা কিনা। সূর্য পেছনে রেখে বসল ওর টুলে। সূর্যের আলো পড়ে সোনালী মুকুটের মতো জ্বলজ্বল করছে ওর চুলগুলো। তবে চেহারাটা রয়েছে ছায়ার ভেতর। ঠিক একটা মূর্তির মতো নিশ্চল বসে রইল র্যাচেল। বেড়ার দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করল একজন লোক। সরাসরি চোখে আলো পড়ায় লোকটি থমকে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চোখে আলো সইয়ে নিল প্রথমে। তবে তাকে দেখতে র্যাচেলের কোন সমস্যা হচ্ছে না। পলকেই ও বুঝে নিল, লোকটি রিচার্ড ছাড়া আর কেউ নয়। পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছে সে। তেমন একটা লম্বা নয় রিচার্ড। তবে পেশির বাহুল্য দিয়ে সেটা পুষিয়ে গেছে। এছাড়া আর তেমন পরিবর্তন আসেনি। সেই ধূসর চোখ, সেই চুল, সেই সুদর্শন চেহারা। কিন্তু দুজনের অবস্থাই এমন যে, কেউই কথা

বলতে পারছে না। স্তম্ভিতভাবে কাটছে না কারো। র‍্যাচেল দু'বার চেষ্টা করল মুখ খুলতে, রিচার্ডকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু ওর মুখে কথাই এল না।

বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টার পর মুখ-খুলতে পারল রিচার্ড। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই ইনকোসাজানা-ই-জুলা?'

চেষ্টা করে গলায় স্বর ফোটাল র‍্যাচেল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এখানে লোকে আমাকে এই নামেই চেনে।'

এক পা এগিয়ে এল রিচার্ড। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'এবার আমি নিশ্চিত, তুমি র‍্যাচেল ডাভ। সেই ছোট মেয়েটি, ওহ, কী সুন্দর হয়ে গেছ তুমি!'

'গর্বিত বোধ করছি আমি,' ভদ্রতা করে কথাটা বলল র‍্যাচেল। কিন্তু তারপর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হাত থেকে খসে পড়ল গণ্ডারের শিঙের দণ্ড। দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল রিচার্ডের দিকে। তবে হাত ধরার ধারে কাছেও গেল না রিচার্ড। সোজা বুকে টেনে নিল। চুমু খেল র‍্যাচেলের ঠোঁটে। এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিল র‍্যাচেল। ওর ফর্সা চেহারাটা রাঙা হয়ে গেছে। আবেগের আতিশয্যে পানি চলে এসেছে র‍্যাচেলের চোখে। প্রায় ফিসফিস করে নিজেকেই ও বলল, 'লজ্জা পাচ্ছি কেন, এ-ই তো আমার নিয়তি।'

একই কথা উচ্চারণ করল রিচার্ড, 'হ্যাঁ, নিয়তিই।'

সত্যি বলতে আগে ওদের একবার মাত্র দেখা হলেও তখন ওদের ভেতর যে গভীর সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতি যেন ওরা দুজনেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে নিয়েছে। তাই আবেগের এই তীব্র বহিঃপ্রকাশে খানিকটা অপ্রস্তুত হলেও বিব্রত হলো না কেউ। এবং এই চুমুটা কেবলই আবেগ নয়, ওদের ভেতর এতদিন ধরে লালিত ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণও বটে।

‘কতদিন পরে আমাদের দেখা হলো?’ আনমনেই প্রশ্ন করল র‍্যাচেল।

‘পুরো আট বছর পার হয়ে গেছে,’ বলল রিচার্ড।

‘আট বছর। এত দিনে একবারও আমার সাথে যোগাযোগ করেনি তুমি। খুব খারাপ আচরণ করেছ, রিচার্ড।’

‘না, না, আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। অন্তত তিনবার চিঠি লিখেছি তোমাকে। কিন্তু তোমাদের খুঁজে না পাওয়ায় তার দুটোই আমার কাছে ফেরত আসে। আর অপরটা খারাপ লোকদের হাতে পড়েছিল। চিঠি পেয়ে উদ্ভা প্রকাশ করে উত্তর পাঠিয়েছিল তারা। তারাই জানিয়েছে নেটালে গিয়েছিল তোমার বাবা-মা। কিন্তু তারপর তারা নাকি ইংল্যান্ডে ফিরে গেছে আর মারা গেছে তুমি। তবে হতে পারে অন্য কারো ব্যাপারে কথা বলেছিল সে। কারণ ঠিক মতো বলতে পারেনি, সে ডাভ পরিবারের কথা বলছে নাকি কাভ পরিবারের কথা বলছে। অথবা হয়তো ইচ্ছেকৃতভাবে মিথ্যা বলছে। তবে ওই লোকটার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে বেঁচে আছ তুমি।’

‘তাহলে আমাকে দেখতে আসোনি কেন, রিচার্ড?’

‘পারিনি, র‍্যাচেল। কারণ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে অনেক বছর বিছানায় পড়ে ছিল বাবা। একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমার পক্ষে তাকে ফেলে আসা সম্ভব ছিল না।’

প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল র‍্যাচেল।

রিচার্ড বলল, ‘বাবা মারা গেছে দশ মাস হলেও বাবা মারা যাওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছে সব ঠিক হয়ে নিতে। বেশ ভালই ব্যবস্থা জমিয়ে নিয়েছিল বাবা। এর মধ্যেই শুনতে পাই নেটাল ছাড়িয়ে আরো বহু ভেতরের দিকে ডার্কেনবার্গের পাশে ট্রান্সভাল নামের প্রায় বন্য একটা এলাকায় বসতি গেড়েছে একটা

ইংলিশ মিশনারী পরিবার। তখনি কানে আসে, ওদিকেই রওনা হয়েছে কয়েকটা দরিদ্র বোয়ের পরিবার। সাথে সাথেই ওদের দলে ভিড়ে যাই। এই হচ্ছে আমার গল্প।’

‘মানে, তুমি র‍্যাচেল ডাভ নামের মেয়েটিকে খুঁজতে এসেছিলে?’

‘নয়তো কী? তোমাকে যদি না-ই খুঁজতাম তাহলে কেপ-এ আমার বাড়ন্ত ফার্ম ছেড়ে কল্লা খোয়াবার ঝুঁকি নিয়ে এতদূরে আসার আর কী কারণ থাকতে পারে?’

‘তুমি বা আর কেউ খবর নেয়ার জন্য গুপ্তচর হিসেবে কুয়াবিকে পাঠিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সে-ই ফিরে গিয়ে তোমাদেরকে ইনকোসাজানা-ই-জুলার কথা বলে, তাই না? আচ্ছা, রিচার্ড, কুয়াবি যখন ফিরল, তখন ওকে কি ধূসর দাড়িওয়ালা বড় পাইপধারী একজন বয়স্ক লোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে? কুয়াবির গল্প শুনে বয়স্ক মানুষটির সাথে লোকেরা হাসাহাসিও করেছিল, তাই না?’

‘হ্যাঁ, ভুল বলেনি। কিন্তু ওসব তুমি জানো কী করে? ওম পিয়েট আর আরতার সাথিদের হাসাহাসির কথাই বা জানলে কীভাবে? তোমার চরেরা নিশ্চয়ই খুব দ্রুতগামী আর অসম্ভব দক্ষ। নইলে কুয়াবির কথা তো তোমার জানার কথা না,’ বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিচার্ড।

‘হ্যাঁ, আমার চরেরা খুব দক্ষ। বলছি তাদের কথা। কিন্তু তার আগে বলো রাজার দূতের সাথে তোমার দেখা হয়নি? সে তোমাকে কিছু বলেনি? আমি বলতে বলেছিলাম, নদীর মাঝের দ্বীপে যার সাথে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, সিংহ গর্জন করেছিল গুহার সামনে, তখন যে তোমার সাথে ছিল সেই ইনকোসাজানা তোমাকে জুলুলাওয়ে স্বাগত জানিয়েছে। বলেনি ওরা এসব?’

‘বলেছে। কিন্তু তখন ওই কথার অর্থ কিছুই বুঝিনি। এখনও বুঝতে পারছি না। কারণ ওরা পৌছার এক মুহূর্ত আগেই আমাকে বোয়ের গুপ্তচর বলে ধরে নিয়েছিল জুলুরা। খুন করতে যাচ্ছিল আমাকে। কিন্তু, এতকিছু তুমি জানলে কী করে?’ বলল রিচার্ড।

হাসতে হাসতে র্যাচেল বলল, ‘স্বপ্নে দেখেছি। হয়তো তোমাকে বাঁচানোর সুযোগ দেয়া হয়েছে যাতে পরে আমাকে বাঁচাতে পার তুমি। এবার একটা গল্প বলি শোন। হয়তো তোমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত গল্প হবে এটা। তবে জেনো এর প্রতিটা অক্ষর সত্য। আর আমার গল্প বিশ্বাস না হলে রাজা ডিনগান বা তার যে কোন ইন্দুনাকে জিজ্ঞেস করতে পার।’

এরপর পূলের পানিতে দেখা ঘটনার কথা খুলে বলল র্যাচেল।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল রিচার্ড। শেষে মাথা নেড়ে কেবল এটুকুই বলতে পারল, ‘এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে এটুকু কেবল বুঝতে পারছি, জুলুরা তোমাকে ওদের দেবীর আসনে বসিয়েছে। কিন্তু এর পর কী হবে? তোমাকে যদি এখানে থাকতেই হয়, আমিও যদি তোমার প্রধান পুরোহিত হিসেবে থাকি, তবুও মনে হয় না ওরা আমাকে পান্তা দেবে। কী বলো?’

‘না, এখানে কোনমতেই থাকব না। বাড়ি যাব। তুমিই আমাকে নিয়ে যাবে। জুলুদেরকে আমি বলেছি যে, আমাকে নিতেই আসছ তুমি। তোমার সাথে তো ঘোড়া আছে, তাই না? কালো রঙের ঘোড়া, যার সামনের একটা পা সাদা? না কিছু বোলো না। আগে খাও, বিশ্রাম নাও। আমাকে কিছু আয়োজন করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার, এখানে জুলুদের চোখে আমি সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী। তাই ওদের সামনে তুমিও আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখাবে। ওদের ডাকছি,’ বলে দু’বার হাত তালি দিল র্যাচেল। সাথে সাথেই ছুটে এল ক’জন মহিলা ভৃত্য। র্যাচেল হুকুম করল, ‘ইনকোসি ড্যারিয়েনের জন্য জলদি খাবার আনো।

আর গেটের ক্যাপ্টেনকে আসতে বলো।’

মুহূর্তের মধ্যে হাজির হলো ক্যাপ্টেন। জুলার সম্মানে তার সামনে হাঁটু ঘষটে এল সে। শতমুখে উচ্চারণ করতে লাগল ইনকোসাজানার স্তুতি।

তাকে থামিয়ে র্যাচেল বলল, ‘এখুনি রাজার কাছে যাও। তাকে বলো আমি যে ঘোড়াটায় করে এসেছিলাম, সেটাকে প্রস্তুত করতে। আমি আর ইনকোসি (সর্দার) ড্যারিয়েন এখুনি টেঙুলার ওপাড়ে যাব। অবশ্য কয়েকদিন পরই ফিরব আবার। কারণ আমার জন্য বিশেষ কিছু খবর নিয়ে এসেছে সে। জুলুল্যাণ্ডের মঙ্গল চাইলে এখুনি আমাকে যেতে হবে। আর রাজা বা ইন্দুনাদের কারো কিছু বলার থাকলে তারা পথে আমাদের সাথে দেখা করবে। এখন রাজার কাছে গিয়ে বিদায় জানানোর সময় নেই। আর বলবে একদল জুলু সৈন্যকে প্রস্তুত হতে। আমাদেরকে টেঙুলা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে তারা। ওই দলের প্রধান হিসেবে যাবে টাম্বুসা। আর রাজাকে বলবে, সে যদি আমাদের বাধা দেয় বা সৈন্য না দেয় তাহলে আমার নিজের সৈন্যদল ডাকব আমি। সেটা কারো জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। এখন যাও। মনে রেখো, তোমার গতির ওপর অনেকের প্রাণ নির্ভর করছে।’

ঠিক তীরের গতিতে ছুট দিল ক্যাপ্টেন।

রিচার্ড প্রশ্ন করল, ‘ওরা তোমার কথা মানবে?’

‘মানবে, কারণ আমাকে ভয় করে ওরা। বিশেষ করে তোমার আসার দৃশ্যটা ওদের বলেছি আমি। তবে ওরা যা ইচ্ছা করুক, আমাদেরকে ত্বরিত গতিতে কাজ সারতে হবে। ওরা কিছু চিন্তাভাবনা করার আগেই যদি বের হতে পারি, তবেই সফল হবো। খাবার চলে এসেছে, জলদি খেয়ে নাও।’

তারপর খাবার পরিবেশনকারী মহিলাটিকে বলল, ‘গেটে গিয়ে বলো, সাদা সর্দারের ঘোড়াটাকে খাইয়ে দাইয়ে প্রস্তুত করে

রাখতে। এখনি ওটা লাগবে। আর তার ভৃত্যকেও প্রস্তুত হতে বলবে।’

এবার রিচার্ড বলল, ‘কিন্তু আমার সাথে তো কোন ভৃত্য নেই। কুয়াবিকে পঞ্চাশ মাইল পেছনে ছেড়ে এসেছি। ওর পা কেটে গিয়েছিল তাই ওয়াগনের সাথে রেখে এসেছি ওকে। একটু ভাল বোধ করলেই পেছন ফিরে বাফেলো নদীর দিকে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা ওর।’

সময় নিয়ে ও প্রচুর পরিমাণে খেল রিচার্ড। খেতে খেতেই র্যাচেলকে জিজ্ঞেস করল জুলুল্যাও থেকে এখনি বের হওয়ার তাড়া কেন ওর। র্যাচেল বলল যে, দুটো কারণে এখনি বের হতে চায় ও। প্রথমত ওর বাবা-মায়ের জন্য। র্যাচেলের সন্দেহ, তাদের কিছু একটা হয়েছে। বিশেষ করে র্যাচেলের মায়ের খুব খারাপ কিছু হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত রিচার্ডের জন্য। কারণ জুলুরা র্যাচেলকে এমন একটা অবস্থানে বসিয়েছে যেখান থেকে বিয়ে তো দূর, ওর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালেও তার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ফেলবে জুলুরা। উপরন্তু, র্যাচেলের নিরাপত্তায় থাকার পরও “ভুল করে ছোঁড়া” একটা বর্শা রিচার্ডের বুকে বিঁধে যাওয়া মোটেও অসম্ভব না। বা “অনিচ্ছাকৃতভাবে” খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিলেও পরে আর কিছুই করার থাকবে না। রিচার্ডকে নিয়ে র্যাচেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে ওকে এখানে আসতে দিয়েছে জুলুরা। কিন্তু পরে কী হবে খোদা মালুম। আর এর মধ্যেই যদি ইসমাইল ফিরে আসে তাহলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যাবে।

রিচার্ড জানতে চাইল ইসমাইল কে?

ইসমাইলের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানাল র্যাচেল। তবে যতটুকু বলল, চেপে গেল তার চেয়ে বহুগুণ। যা হোক তখন ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল র্যাচেলের এক মহিলা ভৃত্য। তখন

রিচার্ডকে ও বলল পেছনে সরে গিয়ে যতটা সম্ভব শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে দাঁড়াতে। তারপর মহিলাটিকে ভেতরে আসতে বলল র্যাচেল। সে খবর দিল যে, রাজার ইন্দুনারা এসেছে। ইনকোসাজানার সাথে কথা বলতে চায় তারা। ওদের আসার অনুমতি দেয়া হলো।

ইন্দুনারা এসে রিচার্ডের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য কারো চোখে ফুটে উঠল কৌতূহলের দৃষ্টি আর কারো চোখে স্থাপদের হিংস্রতা। তবে পরমুহূর্তেই সবাই এমন ভাব করল যেন, এই ঘরেই নেই রিচার্ড।

ইন্দুনাদের প্রশ্ন করল র্যাচেল, ‘যেভাবে বলেছি সেভাবে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে?’

‘হয়েছে, ইনকোসাজানা। আপনার হুকুম অমান্য করবে কে? বাইরে সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছে টাম্বুসা। কিন্তু, ইনকোসাজানা, আপনি চলে যাবেন বলে আমাদের মন খুব খারাপ। কিন্তু আমরা কি আপনার কিছুই পেতে পারি না? এই সাদা লোকটি তো আপনার দাস। তাই আমরা ভাবছিলাম আপনার অনুপস্থিতির সময় অন্তত তাকে তো এখানে রেখে যেতে পারেন...’

‘সে আমার দাস, এটুকুই যথেষ্ট। আর কথা বাঁড়িয়ো না। কী বলেছিলাম মনে আছে তো? এই লোক আমার আর জুলুল্যাণ্ডের মেহমান। যদি তার গায়ে একটা টোকাও দেয় কেউ, তাহলে কঠিন প্রতিশোধ নেব আমি। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেব জুলুল্যাণ্ডের মাটি।’

র্যাচেলের হুমকিতে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল ইন্দুনাদের চেহারায়। কেবল ওদের সর্দার বলল, ‘এই সাদা সর্দার তো আমাবুনাদের সাথে ঘুরছিল। তাই রাজা জানতে চেয়েছে, ওদের কোন খবর কি সে এনেছে?’

‘হ্যাঁ, ড্যারিয়েন ইনকোসির আনা খবর হচ্ছে, আমাবুনারা শান্তি চায়। জুলুরা কিছু না করলে ওরাও কিছু করবে না। আমি কি ওদের

জানিয়ে দেব যে জুলুরাও শান্তি চায়?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘এ ব্যাপারে রাজা আমাকে কিছুই বলেনি। ভূত রাজার প্রতিনিধির জন্য অপেক্ষা করছে রাজা ডিনগান। অপেক্ষা করছে, তারা আপনার কথার কী অর্থ বলে তা জানা আর সেদিনের “ছুটন্ত তারা” কী ইঙ্গিত বয়ে এনেছে তা শোনার জন্য।’

‘বেশ, তবে তা-ই হোক। আমার আরেক ভৃত্য নোয়ি এলে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। শুনব কী বলে ওর জাতির লোকেরা,’ বলে উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। অর্থাৎ কথা শেষ, এবার বিদায় হও।

ইন্দুনা তখন আবার জিজ্ঞেস করল, ‘রাজা জানতে চেয়েছে কবে আপনি ফিরবেন, ইনকোসাজানা?’

‘ফিরব। যখনই জুলুল্যাও আমার প্রয়োজন বোধ করবে তখনই ফিরব। তবে খুব সাবধান, মনে রেখো, আমি আসার আগে যেন কোন রক্তপাত না হয়। রক্তপাত হলে স্বর্গের অভিশাপ পড়বে জুলুল্যাওর ওপর। এ-ই বলার ছিল আমার। আবার আমাদের দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল।’

জুলার বক্তব্য শুনে বিনয় সহকারে বিদায় নিল ইন্দুনারা।

এক ঘণ্টা পরের কথা। জুলু সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে রিচার্ডকে সাথে নিয়ে টেগুলার দিকে এগিয়ে চলেছে র্যাচেল। একটা টিলার চূড়ায় এসে পেছন ফিরে উমগুনগুনলোভুর দিকে ফিরে তাকাল র্যাচেল। তারপর রিচার্ডকে ডেকে বলল, ‘মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই আবার আমাকে এখানে ফিরতে হবে।’

‘সে কী! কেন?’

‘কারণ ওই ইন্দুনাদের চোখে শয়তানি খেলা করতে দেখেছি আমি। কিছু একটা গোপন করছিল ওরা। আমার খুব ভয় করছে, রিচার্ড।’

চোদ্দ

নোয়ির কাছ থেকে র্যাচেল শুনেছিল যে, সৈন্যদের মার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ইসমাইল। খবরটি পুরোপুরি সত্য। মারের চোটে বেশ কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে ওকে। যখন ও সোজা হয়েছে তখনও দূর যাত্রার পক্ষে অনেকটাই দুর্বল। তারপরও রাজার হুকুম বলে কথা। তাই টেগুলার দিকে রওনা হয়ে গেছে সে। গতি যদিও বেশ ধীর।

রাজার তরফ থেকে র্যাচেলকে শোনানো হয়েছে পালিয়ে গেছে ইসমাইল। পালিয়েই গেছে, তবে সেটা ছিল সাজানো একটা নাটক, যার পরিকল্পনার কথা আমরা আগেই জেনেছি। আর যেহেতু সেটা ছিল সাজানো নাটক তাই পরে জুলুরা আর ওকে ধরার চেষ্টা করেনি। টেগুলার পাড়ে পৌঁছে ইসমাইল দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে জুলু সৈন্যদের ছোট এক দল। তাদের ওপর হুকুম ছিল, ইসমাইল যা করতে বলে, বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় তা-ই করতে হবে।

নদীর পাড়ে পৌঁছে ওরা দেখল যে, ফুলে ফেঁপে প্রমত্তা রূপ নিয়েছে টেগুলা। এখন এটা পার হওয়া কোনমতেই সম্ভব না। কাজেই পানি কমার অপেক্ষায় পরবর্তী দশদিন ওখানেই বসে থাকতে বাধ্য হলো ও।

এই দশদিন কেবল শুয়ে বসেই কাটায়নি ইসমাইল। নিজেকে

নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছে। ইসমাইলের পুরো জীবনের ইতিহাস বলে কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। সেটা এই গল্পের সাথে প্রাসঙ্গিকও না। তাই সংক্ষেপে বলি, র‍্যাচেলকে যেমনটা বলেছিল, আসলেই সম্ভ্রান্ত এক ইংরেজ পরিবারের সন্তান ইসমাইল। তবে আগে থেকেই ও রক্ষ স্বভাবের লোক। স্বভাবদোষে বারবার ঝামেলায় জড়িয়েছে ও। পরিবার থেকেও ওকে শোধরাবার তেমন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কেবল দোষারোপ করেই তারা খালাস। পরে সামরিক বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে ইসমাইল। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারেনি। একটা অঘটন ঘটিয়ে আর্মি থেকে পালায় সে। আসলে খুন করে শাস্তির ভয়ে পালায়। পালিয়ে চলে আসে জল-জঙ্গলের দেশ এই দক্ষিণ আফ্রিকায়। এখানে এসে ওর মনে হয় যে, নাম পরিবর্তন করা দরকার। তখনই ইসমাইল নাম গ্রহণ করে সে। তারপর সেখানেই আসল রূপে নিজেকে মেলে ধরে ও। এখানে বাধা দেবার বা কিছু বলার মতো কেউ না থাকায় নিয়ন্ত্রণহীন জীবনযাপন শুরু করে সে। জুলুদের সাথে মিশে হয়ে যায় ওদেরই মতো। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। এর পরেই সে দেখে র‍্যাচেলকে। প্রেমে পড়ে যায় র‍্যাচেলের। মাথায় ঢোকে ওকে পাওয়ার ইচ্ছা। মনের ভেতর ফিরে আসে যে, সে-ও একসময় ছিল সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ঘরের সন্তান। কিন্তু কোথায় নেমেছে আজ!

ওদিকে র‍্যাচেলও ইংরেজ। হোক না পয়সা কম, কিন্তু ও-ও তো সম্ভ্রান্ত সম্মানিত ঘরের মেয়ে। কাজেই র‍্যাচেলকেই তার চাই। কিন্তু র‍্যাচেল ওকে প্রত্যাখ্যান করার পর র‍্যাচেলের প্রতি ওর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেছে। তখন ইউরোপিয়ানদের মতো করে র‍্যাচেলের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে ইসমাইল। প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বাপ-দাদাদের মতো জীবন যাপন শুরু করবে। বর্তমানের সব ভুলে আগের অভিজাত ইংরেজ জীবনে

ফিরে যাবে। কিন্তু তাতেও র্যাচেলের মন গেলেনি। ওদিকে ইসমাইল বিশ্বাস করে বসে আছে যে, র্যাচেল আসলেই সাধারণ কেউ না। আসলেই অতিপ্রাকৃত কিছু একটা আছে ওর ভেতর। ফলে ওকে পাওয়ার ইচ্ছা আরো বেড়ে গেছে ইসমাইলের। কিন্তু র্যাচেল যখন জুলুল্যাও গেল, সভয়ে ইসমাইল আবিষ্কার করল পাশার ছক পুরো উল্টো গেছে। ও নিজেই এখন পড়ে গেছে ইনকোসাজানার ক্ষমতার ভেতর। অর্থাৎ ওকে পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত।

এতকিছুর পরও র্যাচেলকে পাওয়ার আশা ছাড়েনি ইসমাইল। এখানে টেণ্ডলার ধারে বসে ভাবছে, কোনভাবে আবার যদি ওকে জুলুল্যাও থেকে বের করে আনা যায়, র্যাচেল অবশ্যই ওর দিকে সুনজরে তাকাবে। তখনই কিছু একটা আশা করা যাবে। এখন এই আশায়ই আছে সে।

নিজের হাতে আর রক্তের দাগ লাগাতে চায় না ইসমাইল। কিন্তু র্যাচেলকে পেতে হলে ওকে ঘরহারা স্বজনহারা করতে হবে এটা ধরেই নিয়েছে ও। তবে কীভাবে কী করবে সেটা এখনও ঠিক করেনি। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেছে ও। এর মধ্যেই টেণ্ডলার পানি কমতে শুরু করেছে। পার হওয়ার মতো অবস্থায় ইতিমধ্যেই চলে এসেছে সেটা।

ইসমাইলের ইচ্ছা আগামী কাল নদী পার হবে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছুল ডিনগানের দূত। সে জানাল যে, ইসমাইল এখনো নদী পার হয়নি জেনে আহত মোর্শের মতো খেপে গেছে ডিনগান। এমনই খেপেছে যে আজ পর্যন্ত ডিনগানকে এমন খেপতে দেখেনি কেউ। এদিকে একজন সাদা লোককে সাথে নিয়ে রামাহ-এর দিকে রওনা হয়ে গেছে ইনকোসাজানা। আধবেলার রাস্তা পেছনে আছে তারা। এই মুহূর্তে যদি ইবুবেসি রওনা না হয় তাহলে ওরা তার নাগাল পেয়ে যাবে।

কাজেই তার প্রতি রাজার হুকুম:

আগের পরিকল্পনা মোতাবেক এখুনি ইবুবেসি রওনা হবে, তুলে নিয়ে আসবে বুড়ো ধর্ম শিক্ষক ও তার স্ত্রীকে। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি করা যাবে না। আর যদি এর মধ্যেই ইনকোসাজানার সাথে তার দেখা হয়ে যায়, তাহলে, ইনকোসাজানার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা বা তার অপমান করা যাবে না। কেবল কানে আঙুল দিয়ে থাকতে হবে। ইনকোসাজানা যা-ই হুকুম করুক, ওরা স্রেফ কালা হয়ে যাবে। রাজার কাছে নিয়ে আসবে ইনকোসাজানার বাবা-মাকে। ইনকোসাজানার সাথে সাদা লোকটি যদি ইসমাইলকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাকে ধরে বেঁধে রাখতে হবে কিন্তু তারও কোন ক্ষতি করা যাবে না। কারণ তার ক্ষতি হলে বা তার রক্ত বের হলে জুলুল্যাণ্ডের ওপর বিরাট অভিশাপ নেমে আসবে। কালো রাজার নামে (অর্থাৎ চাকা) ডিনগান শপথ করেছে যে, এর অন্যথা হলে মধুতে চুবিয়ে পিঁপড়ার ঢিবিতে গাঁথে রেখে ইবুবেসির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু নিশ্চিত করবে রাজা। আর ইবুবেসি যদি এই মিশনে ব্যর্থ হয় তাহলে এক রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে মাফুটি ধুলোয় মিশিয়ে দেবে রাজা। দখল করবে ইসমাইলের সমস্ত গবাদি পশু, হত্যা করবে ওখানে চলে ফিরে বেড়ানো প্রত্যেকটা মানুষকে।

শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ইসমাইল। কারণ ও খুব ভাল করেই জানে এসব ফাঁপা বুলি নয়। নদী দেখিয়ে দূতকে ইসমাইল বলল যে, নদী “রেগে” আছে। এমন অবস্থায় নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে এখনই সে পার হবে। আর রাজা যা বলেছে সেভাবেই সব হবে। সাদা লোকদের কেশাঘর্ষণ করবে না কেউ।

জবাবে দূত বলল, ‘তাহলে তাড়াতাড়ি করুন। কারণ ইনকোসাজানা আধ দিন দূরেও নেই। আর তার সাথে আছে সাদা

সর্দার ডোরিয়ো ।’

‘ডোরিয়ো দেখতে কেমন?’ প্রশ্ন করল ইসমাইল ।

‘বয়সে তরুণ, দেখতে সুদর্শন, চুল দাড়ি দুটোর রঙই স্বর্ণের মতো । চোখ হুবহু ইনকোসাজানার মতো । লোকে বলে সে-ও নাকি স্বর্ণের সন্তান, আবার কেউ বলে সে ইনকোসাজানার ভালবাসার মানুষ । তবে অত উঁচু ব্যাপারে কথা বলার আমি কে? তবে এটা আসলেই সত্যি যে, লোকটাকে খুবই পছন্দ করে ইনকোসাজানা । জুলুল্যাও সে পা রাখারও আগেই তার আসা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ইনকোসাজানা । এমনকী ইন্দুনাদের পেছনে যখন সে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও বারবার মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে ইনকোসাজানা,’ বলল রাজার দূত ।

‘লোকটাকে ইনকোসাজানা অনেক ভালবাসে, না?’ দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করল ইসমাইল । তারপর সৈন্যদের ডাক দিয়ে বলল, ‘রাজার হুকুম, এখনই নদী পার হতে হবে । নদীর পানিতে ডুবে মরা বর্শায় বিদ্ধ হয়ে লজ্জাস্কর মৃত্যু থেকে অনেক ভাল ।’

কাজেই নদী পার হলো ওরা । বহু কষ্টে যদিও । তবে অবাক ব্যাপার, এত ঝামেলার মধ্যেও কারো প্রাণ খোঁয়াতে হয়নি । ইসমাইল নদী পার হয়েছে শক্ত পোক্ত এক জুলুর কাঁধে চেপে । ওপাড়ে পৌঁছেই নদীর তীরবাসী এক লোককে ডাকল ইসমাইল । লোকটি ইসমাইলকে চেনে, ওর কূট স্বভাবও জানে । তাই দেরি না করে সামনে হাজির হলো সে । লোকটিকে ইসমাইল বলল এখুনি মাফুটির দিকে ছুট দিতে । ওখানকার সর্দারকে বলবে, শক্ত-সমর্থ ত্রিশজন যোদ্ধা নিয়ে আগামীকাল ভোরের আগেই “চিৎকারকারী”-র বাড়ি রামাহ-এর ওপরের কুফে যেন লুকিয়ে থাকে সর্দার । তারপর কী করতে হবে সেটা দেখা হলে তখন ইবুবেসি স্বয়ং জানাবে । খবর নিয়ে ছুট দিল লোকটি ।

এদিকে অসুস্থ ইসমাইলকে বইবার জন্য ইতিমধ্যেই লতাপাতা দিয়ে একটা পালকি বানিয়ে নিয়েছে জুলুরা। সেটায় চেপেই রওনা হলো ও। সন্ধ্যার খানিক আগেই রামাহ-এর কাছে এসে পৌঁছল ইসমাইলের জুলু বাহিনী।

ওদিকে জুলু সৈন্যদের আসতে দেখে রামাহ-কে ঘিরে বসবাসরত নেটিভরা ভাবল, ওদের মারতেই বুঝি সৈন্য পাঠিয়েছে ডিনগান। প্রাণভয়ে আর দ্বিতীয় কোন চিন্তা করল না কেউ। সাথে সাথেই তল্লিতল্লা গুটিয়ে বাড়ি ছাড়ল ওরা। নিয়ে গেল ওদের গবাদি পশুগুলোও। একাকী রয়ে গেল কেবল প্যাস্টর মি. ডাভ। জুলুদের খবর কিছুই তার জানা হলো না।

রামাহ-এর কাছে পৌঁছে পালকি থেকে নামল ইসমাইল। দশজন সৈন্য আর ক'জন ক্যাপ্টেনকে সাথে রাখল ও। বাকিদের বসল রামাহ ঘিরে ফেলতে। উমফুনদুসি (অর্থাৎ চিৎকারকারী) অথবা তার স্ত্রী যদি পালাতে চেষ্টা করে, তাদের ধরে ইসমাইলের সামনে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তাদের কারো কোন ক্ষতি করা যাবে না। সৈন্যদের নির্দেশনা দিয়ে ইসমাইল নিজে রওনা হলো মিশন হাউসের দিকে। ও আশা করেছিল ওদের আসতে দেখে মি. ডাভ হয়তো নেটিভদের সাথে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঘরে পৌঁছে দেখল সদর দরজা হাঁ করে খোলা। সদলবলে ভেতরে ঢুকল ইসমাইল। এমনকী ভেতরের ঘরের দরজাও খোলা। অবাক ও লজ্জিত হয়ে আবিষ্কার করল, মিসেস ডাভ বিছানায় শায়িত। খুবই অসুস্থ সে, যখন-তখন অবস্থা তার। তার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে মি. ডাভ। তখন ওদের ওপর চোখ পড়ল মিসেস ডাভের। তার ঠোট জোড়া নীল হয়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কথা বলার ক্ষমতা নেই তার। ওদের দিকে ইশারা করে হাত তুলল সে। কেবল-ওই শক্তিটুকুই আছে তার।

তখন ব্যাপারটা চোখে পড়ল মি. ডাভের। ফিরে তাকাল সে। মাফুটিতে ঝগড়ার পর আর ইসমাইলের চেহারা দেখেনি সে। রক্ষ কণ্ঠে প্যাস্টর প্রশ্ন করল, ‘এসব কী? এই অসভ্যদের নিয়ে এভাবে ঢুকে পড়ার অর্থ কী? আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। বুঝতে পারছেন না, তাকে বিরক্ত করা উচিত না?’

‘আমি দুঃখিত,’ শুরু করল ইসমাইল। মি. ডাভকে আসলেই ভয় করে সে। তাই খানিকটা সম্মম আর খানিকটা লজ্জা মেশানো কণ্ঠে সে বলল, ‘দুঃখিত, কিন্তু একটা খবর দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে রাজা ডিনগান আর আপনার মেয়ে।’

মেয়ের কথায় নড়ে চড়ে উঠল মি. ডাভ, ‘র্যাচেল খবর পাঠিয়েছে? কী খবর? কেমন আছে ও? ওর কোন সংবাদই আমরা পাই না। কেবল শুনি কিছু আবোল তাবোল গুজব।’

ইসমাইল বলল, ‘তার সাথে একবারই দেখা হয়েছে আমার। ভালই আছে সে। তবে, আপনিও জানেন, জুলুরা ওকে ইনকোসাজানা বানিয়েছে। তাই খুব কড়া প্রহরার ভেতর রাখা হয় ওকে।’

‘আমার মেয়ে তাহলে ওই অসভ্যদের মাঝে একা একা বেঁচে আছে?’

‘অনেকটা তা-ই। তবে শুনেছি এখন একজন সঙ্গী পেয়েছে সে। এক বদখত সাদা লোক সে। তার সাথেই আপাতত আছে আপনাদের মেয়ে,’ বলে বিশ্রী একটা ভঙ্গি করল ইসমাইল।

‘আমার মেয়ে একটা বদখত সাদা লোকের সাথে...? এ হতেই পারে না। তার নাম কী?’ প্রশ্ন করল প্যাস্টর মি. ডাভ।

‘জানি না। কেলে ব্যাটারা ওকে ডাকে ডোরিয়ো নামে। বলে, সে বয়সে তরুণ আর তার চুল নাকি সাদা, ইনকোসাজানা তাকে খুব ভালবাসে। ওই লোকের ব্যাপারে এতটুকুই জানি আমি।’

হতাশায় মাথা নাড়ল মি. ডাভ। কিন্তু মিসেস ডাভ সোজা

হয়ে বসে পড়েছে। সবই শুনেছে সে। স্বামীর আস্তিন ধরে টানল সে। ফিসফিসিয়ে বলল, ‘জন, ও ড্যারিয়েন, রিচার্ড ড্যারিয়েন। সেই যে, উমটুমা নদীতে বানের সময় র্যাচেলকে বাঁচিয়েছিল—সেই ছেলে। র্যাচেল ছেলেটাকে কখনোই ভোলেনি। ওহ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হাজার ধন্যবাদ। ওর সাথে নিরাপদেই থাকবে আমাদের র্যাচেল। আমি সবসময়ই জানতাম, র্যাচেলকে ছেলেটা খুঁজে পাবেই। কারণ ওরা একে অপরের জন্যই সৃষ্টি,’ এটুকুই বলতে পারল সে। তারপর আবার বিছানায় পড়ে গেল মিসেস ডাভ।

এবার ইসমাইলও বলল, ‘জুলুরাও একই কথা বলে, ওরা নাকি তৈরিই হয়েছে পরস্পরের জন্য। হয়তো নেটিভদের মতো করে বিয়েও করে নিয়েছে ওরা।’

রীতিমতো গর্জে উঠল মি. ডাভ। বলল, ‘আমার মেয়ের নামে অপমানজনক কথা বলা বন্ধ করুন। আপনি যেভাবে স্ত্রী গ্রহণ করেছেন আমার মেয়ে কখনোই সেভাবে স্বামী গ্রহণ করবে না। এমনকী লোকটি রিচার্ড ড্যারিয়েন হলেও না। বলুন এবার, ওরা কি এদিকে আসছে?’

‘না। যেখানে ওরা আছে খুবই আরামে আছে। তাছাড়া জুলুরাও ওদের আসতে দেবে না। তবে ও নিয়ে দুঃখ করবেন না। কারণ আমাকে পাঠানোই হয়েছে আপনাদের দু’জনকে ওদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।’

স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে প্যাস্টর বলল, ‘কিন্তু এখন তা কোনমতেই সম্ভব না।’

‘সম্ভব অসম্ভব জানি না। রাজার হুকুম আর ইনকোসাজানার ইচ্ছা আপনারা সেখানে যাবেন। তাই যেতেই হবে।’

‘আপনি কি পাগল হলেন? আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখেছেন? একটা পা ফেলা ওর পক্ষে কি এখন সম্ভব? ও কেমন করে যাবে?’

নির্বিকারভাবে ইসমাইল বলল, ‘ওসব নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করবেন না। বয়ে নেয়া হবে মিসেস ডাভকে। তার পরনে ভাল পোশাক না থাকলেও অসুবিধা নেই। কম্বলে মুড়ে বয়ে নিয়ে যাব। আপনাদের নিতে হবে এটাই আমার জন্য রাজার হুকুম। কাজেই নিতেই হবে। আপনাদের জন্য নিজের গলা কাটা যেতে দিতে পারব না আমি।’

মিসেস ডাভ তখন বলল, ‘জন, তুমি যাও। আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমার সময় চলে এসেছে। নিশ্চিন্তেই মরব আমি, কারণ রিচার্ড ড্যারিয়েন চলে এসেছে। তার কাছে নিরাপদে থাকবে আমার র্যাচেল।’

মনে হলো রিচার্ডের নাম কানে যাওয়া মাত্রই বিগড়ে গেল ইসমাইলের মেজাজ। রীতিমতো ধমকের সুরে সে বলল, ‘আপনারা যাবেন, না সৈন্যদের দিয়ে তুলে নেব?’

এবার প্যাস্টরও রেগে গেল, ‘বদমাশ কোথাকার, ওকে ফেলে এই অবস্থায় কীভাবে যাব? খবরদার! যে ওর গায়ে হাত দেবে গুলি করে মারব তাকে। যাও এখান থেকে, বের হও সব,’ বলতে বলতেই ছিনিয়ে নিল দেয়ালে ঝোলানো ডাবল ব্যারেল শট পিস্তলখানা। কক করল সেটা।

কৌতূহলের সাথে ঘটনা প্রবাহ দেখছিল জুলুরা। ইসমাইল ওদের হুকুম করল, ‘চিৎকারকারীকে বেঁধে ফেলো। আর খাটিয়া সহ তুলে নাও মহিলাটিকে। সে যদি পথে মারাও যায়, আমাদের কিছু করার নেই, রাজার হুকুম।’

ক্যাপ্টেনেরা দ্বিধা করছে। গুলির ভয়ে নয়, বরং অসুস্থ মানুষটির অবস্থা নাড়িয়ে দিয়েছে জুলুদের কঠিন হৃদয়কেও। তাই নড়তে চাইছে না ওরা।

এবার ধমকানো শুরু করল ইসমাইল, ‘ভীতু গাধার দল, শুনতে পাচ্ছিস না? রাজার হুকুম, যা বললাম কর, নয়তো

সবাইকে মরতে হবে। আর ওই বুড়ো ভামটা তোদের বাধা দিলে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাকে নিরস্ত্র কর।’

এবার আর দ্বিধা করল না ওরা। লাফিয়ে গিয়ে মিসেস ডাভের খাট তুলে ধরল। সাথে সাথেই সবচেয়ে কাছের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে পিস্তলের এক নল খালি করল মি. ডাভ। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। অন্য জুলুরা ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মি. ডাভের ওপর। লাঠি দিয়ে আঘাত করছে তাকে।

এদিকে হুড়োহুড়ির মধ্যে একটা জোরাল আঘাত পড়ে গেল মি. ডাভের মাথায়। একই সময় আঙুলের টান লেগে একটা গুলি বেরিয়ে এল পিস্তলের অপর ব্যারেল দিয়ে। একটুর জন্য ইসমাইলকে মিস করল সেটা। ওদিকে লাঠির আঘাতে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে গেছে মি. ডাভ।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে তার। তার আজীবনের চাওয়া ছিল “শহীদের মৃত্যু”। তা-ই পেল সে। এক ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে হৃৎকম্প পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হলো আসলেই মারা গেছে মি. ডাভ। বলল, ‘দু’জনেই তো শেষ, এবার কী, ইবুবেসি?’

ইসমাইলের চেহারা থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সে। এমন কিছু ঘটে যাবে আশা করেনি কেউ। হাতের তালু দিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে বলল, ‘রাজার হুকুম ছিল ওদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেটাই করব। কিন্তু ওদের মেরে ফেললে কেন?’ মহা আতঙ্কের সাথে বলল, ‘এদেরকে মেরে ফেলে ইনকুসিডানার অভিশাপ আমাদের উপর ডেকে এনেছ তোমরা।’

এবার ক্যাপ্টেনের বিস্মিত মন্তব্য, ‘ও-ও, আপনিই আমাদের হুকুম দিয়েছেন লাঠি দিয়ে ওকে আঘাত করতে। আর রাজা আমাদের বলে দিয়েছে আপনার হুকুম মানতে। তাই আপনার হুকুম আমরা মেনেছি। কিন্তু কে জানত, চিন্তাভাবনা করতে

করতে ভাবুক ব্যাটার খুলি এত “পাতলা” হয়ে গেছে? আপনি বা আমি হলে মাথায় ওই “টোকা” টেরই পেতাম না। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে অপর পাড়ে চলে গেছে ওরা। ওদের স্পর্শ করে পাপ করতে আমরা রাজি না। তাছাড়া এই মৃত মানুষদের হাড়িগুড়ি রাজার কোন্ কাজে লাগবে? তার ওপর যদি ভূত হয়ে ওরা আমাদের পিছে লাগে, তখন?’ তারপর জুলুদের দিকে ফিরে ক্যাপ্টেনটি বলল, ‘ভাইয়েরা, চলো রাজার কাছে ফিরে গিয়ে সব তাকে জানাই। তবে আমাদের ভয়ের কিছু নেই, কারণ ইবুবেসির হুকুমে কাজ করেছি আমরা। নিজের ইচ্ছায় করিনি।’

জুলুরাও বলল, ‘হ্যাঁ, রাজার কাছেই ফিরে যাব। ইবুবেসি, আসবেন আমাদের সাথে?’

‘না, যাব না। তোমাদের ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে আমার ধড়টাকে রাজা মুচড়ে ছিঁড়ুক, সেটাই বুঝি চাও? যাও, শান্তি পেলে যাও। কিন্তু জেনে রেখো, ইনকোসাজানা এদিকেই আসছে। ভুলেও তার সামনে যেয়ো না। তোমাদের দেখলেই যা বোঝার বুঝে নেবে সে। তারপর মৃত্যু আসবে তোমাদের। আরেকটা কথা, এই বুড়ো-বুড়িকে বাবা-মা বলে মানত ইনকোসাজানা।’

এক সৈন্য জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, ইনকোসাজানার আসার কথা আমরাও শুনেছি। তাকে এড়িয়ে যাব আমরা। তার অভিশাপকে আমরা সবাই ভয় পাই। কিন্তু, ইবুবেসি, আসলে ভয় আমাদের নয়, আপনার। কারণ আমরা আপনার হুকুম তামিল করেছি কেবল। হয়তো এই চাঁদ শেষ হওয়ার আগেই মারা যাবেন আপনি। পারলে স্বর্গের সাথে সন্ধি করে ক্ষমা চেয়ে নিন। আমরাও যাচ্ছি রাজার কাছে, ক্ষমা চাইব তার কাছে।’

আতঙ্কিত ইসমাইল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, ‘অভিশপ্ত কুন্তার দল, আমাকেও শাপের তলে ফেলতে চাইছিস? মর গিয়ে!’

‘না না, ইবুবেসি, আমরা নই, মরতে চলেছেন আপনি। হয়তো ইনকোসাজানা নিজেই সেটা দেখবেন। আর নইলে দেখব আমি। আমাকে কিন্তু কেউ সাদা “উমফ্যাগোজান” নামে ডাকে না। যার অর্থ “নিম্ন বর্ণের সাদা মানুষ, যে রক্ত ঝরানোর কূট পরিকল্পনা করে কিন্তু নিজে কাপুরুষের মতো পিছিয়ে যায়। আর ওই কাজ করার দায়িত্ব ফেলে যোদ্ধাদের ঘাড়ে।” বিদায়, ইবুবেসি, শেয়ালে আপনার রক্ত মাংস খেয়ে ফেলার পরও যদি কিছু থাকে তো কথা দিলাম আমি ফিরে আসব। কবর দেব যা বাকি থাকে। কারণ ইনকোসাজানা আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেবে।’

মেঝেতে পড়ে থাকা মৃত্যু পথযাত্রী জুলু সৈন্যটি কাতরে উঠে অন্যদের বলল, ‘ভাইয়েরা, আমাকে এভাবে ফেলে চলে যাবে ভৈরব?’

এক কদম এগিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখল এক ক্যাপ্টেন। একবার মাথা নেড়ে সে বলল, ‘ও মরে যাবে। লিভারে গিয়ে ঢুকেছে সাদা মানুষের বজ্র। তবে ওটা তোমার বদলে ইবুবেসিকে গাঁথলেই ভাল হতো। ইনকোসাজানার কিছু ঝামেলা কমত। তবে তুমি মরবেই। তোমার হাতে এখনও শক্তি আছে। এই নাও বর্শা। তুমি জানো, এটা কোথায় গাঁথতে হয়। আর মারা যাওয়ার আগে বলো যদি কোন বার্তা থাকে তোমার। মনে আছে, ভাই, বিশ বছর আগের লড়াইয়ের কথা? কেমন করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছি আমরা? মনে আছে পণ্ডা দানব আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ওকে ঠেলে ফেলে আমাকে বাঁচিয়েছিল তুমি, আর ওকে মেরে ফেলেছিলে? তোমার মেয়েকে আমি বলব, কোথায় নেকলেসটা পাওয়া যাবে। আরো বলব ওর প্রথম ছেলের নাম তোমার নামে রাখতে বলেছি তুমি। শুভ রাত্রি, ভাই। তোমার অ্যাসেসগাইটা ব্যবহার করো। আমিও জানি, তোমার ক্ষতটা খুব

যন্ত্রণাদায়ক। আর, তুমি নিজেকে মারতে না পারলে ইবুবেসি বর্শাটা তোমার ওপর ব্যবহার করবে। শুভরাত্রি, ভাই আমার। আপনাকেও বিদায়, ইবুবেসি। আমরা টেঙলা পার হয়ে যাচ্ছি। ভাই, পারলে ইনকোসাজানার জন্য অপেক্ষা কোরো, তাকে বোলো কীভাবে মারা গেছে চিৎকারকারী।’

জুলু সৈন্যদের দরজা পার হতে দেখল পড়ে থাকা সৈন্যটা। বহুকষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। তুলে নিল বর্শাটা। নিজেকে গাঁথে ফেলল সে। পড়ে যেতে যেতে বর্শাটা ছুটে গেল তার হাত থেকে। সেটা গিয়ে লাগল ইসমাইলের গায়ে। ফলার আঘাতে রক্ত বেরিয়ে এল তার গা থেকে। কিন্তু সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। মৃতদেহ তিনটির দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল সে।

ইসমাইলের নিজের মন থেকেই উঠে এল, ‘ওদের খুন করেছে তুমি, ইসমাইল। প্রতিশোধের জন্য ওরা এখন ঈশ্বরের কাছে আকুতি জানাচ্ছে। ভুলেও কখনো একা থেকে না। নয়তো ওদের আত্মা তাড়া করে ফিরবে তোমায়!’

মৃত প্যাস্টর পড়ে যাওয়ার সময় এমনভাবেই পড়েছে যে, এখন ইসমাইলের মনে হচ্ছে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। নির্নিমেষ খোলা দৃষ্টিতে যেন ইসমাইলের সমস্ত পাপের বয়ান জেনে নিচ্ছে সে। আর ঠিক তখনই খোলা জানালা দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের লালচে সোনালী আলো এসে পড়ল প্যাস্টরের চেহারার ওপর। ঠিক একজন সন্ন্যাসীর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। গলার ক্ষতটা থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। যে সামান্য শব্দটুকু হলো তা-ই ইসমাইলের কানে শোনা পিস্তলের গুলির মতো। এতে করে উঠে বসার শক্তি পেল ইসমাইল। ভীতু হায়েনার মতো ছিটকে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাড়ির সীমানা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল ত্রিশজন লোক আসতে বলেছিল ও। ওরা হয়তো এতক্ষণে জায়গামতো পৌঁছে গেছে। গিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া মানুষের সাহচর্যও এখন দরকার আতঙ্কিত ইসমাইলের। কাজেই রওনা হয়ে গেল ও। মনে হলো, যা হয়েছে আসলে ওর জন্য খুব একটা খারাপ হয়নি। এখন পথের কাঁটা বলতে রইল কেবল এক ডোরিয়ো। অবশ্য এই সাদা লোকটিকে কোন না কোনভাবে তাড়ানো খুব বড় কোন সমস্যা না। এদিকে আজকের অঘটন প্রকাশ করার মতোও কেউ নেই। কারণ মৃত মানুষেরা কথা বলে না। জুলুরাও মুখ খুলবে না। কাজেই র্যাচেলের এখন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাই আশা করাই যায় যে, ইসমাইলের দিকে ফিরবে র্যাচেল। কিন্তু তারপরও র্যাচেলকে ভয় পায় ইসমাইল। জুলুদেরকেও ভয় পায়। এবং আরো কিছু শক্তি আছে যা কোন সংজ্ঞা দিয়েই বোঝানো সম্ভব না, ইসমাইল জানে এইসব শক্তিকেও ওর ভয় পেতে হবে। ইতিমধ্যেই নিজের চারপাশে ওই অদৃশ্য শক্তিগুলোর ভীতি জাগানিয়া উপস্থিতি টের পেতে শুরু করেছে ও।

কুফের ওপর চলে এল ইসমাইল। ঝোপের ভেতর থেকে ওকে ডাকল কেউ।

ইসমাইলের রুক্ষ জবাব, ‘বাইরে বেরিয়ে আয়, কুত্তা!’

ঝোপের ভেতর থেকে বের হয়ে এল এক লোক। সস্রমে ইসমাইলকে স্যাঁলুট করল সে। বলল, ‘সর্দার, আপনার হুকুম পেয়েই রওনা হয়েছি, আমরা। এই মাত্রই এসে পৌঁছেছি। কিন্তু রামাহ-তে কী হয়েছে, সর্দার? সব এত নীরব কেন?’

ইসমাইল ওদের বলল, ‘জুলুরা এসেছিল। মেরে রেখে গেছে শিক্ষক আর তার স্ত্রীকে। আমি ওদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। দেখ, এই করতে গিয়ে ক্ষতও তৈরি হয়েছে একটা। আর রামাহ-

এর কালোরা সবাই পালিয়ে গেছে।’

আফসোস করে উঠল কালো লোকটি, বলল, ‘খুব খারাপ হয়েছে। শিক্ষক লোকটি ছিল খুবই ভাল আর পবিত্র মানুষ। কোন সন্দেহ নেই, তার আত্মা এই অপমৃত্যুর শোধ নেবে। এমন কিছু ঘটবে সেটা আমিও অনুমান করেছিলাম। কারণ, গত রাতে খোদা মালুম কোথা থেকে যেন একটা কুকুর এসে ঢুকে পড়েছিল আপনার ক্রালের বেড়ার ভেতর। কাঁদতেই থাকে ওটা, কাঁদতেই থাকে। আমরা সবাই বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু মারতে পারিনি কুকুরটাকে। ভেবেই নিয়েছিলাম ওটা নির্ঘাত একটা ভূত। আপনার স্ত্রীরা সবাই ভেবেছে আপনার বুঝি কোন ক্ষতি হয়েছে। দুশ্চিন্তায় ছিল তারা।’

ধমক মেরে লোকটাকে থামিয়ে দিল ইসমাইল। বলল, ‘থামো, বদ-জাদুকর কোথাকার, নয়তো ওই ভূত কুকুরের চেয়েও জোরে কাঁদবে তুমি।’

অবাক হওয়া দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চেহায়ায়। ভদ্রস্বরে সে বলল, ‘আমি খারাপ কিছু বোঝাইনি, সর্দার। যাক, এখন আপনার হুকুম কী, সর্দার?’

‘এখানেই অপেক্ষা করব আমরা। মনে হয়, চিংকারকারীর মেয়ে-যাকে জুলুরা বলে ইনকোসাজানা-ই-জুলা, সে আসছে। তার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে। ত্রিশজন লোক আনতে বলেছিলাম, এনেছ?’

‘এনেছি, সর্দার। ঝোপে লুকিয়ে আছে ওরা।’ তারপর পরিহাস তরল কর্তে সে বলল, ‘আমিও ভেবেছিলাম, জুলুদের যে হুকুম দিতে পারে, ইনকোসাজানা-ই-জুলা নাম, তারও সাহায্য দরকার হতে পারে। তাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশিই হব।’

পনেরো

টেঙলা পার হয়ে যেভাবে রাণীর মতো ডিনগানের ক্রালে গিয়েছিল র্যাচেল সেভাবেই আবার ফিরে আসছে ও। ওর সামনে সেই সাদা ষাঁড়টার লাগাম ধরে এগিয়ে আসছে টাম্বুসা আর পেছনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে রিচার্ড। সৈন্যদের অর্ধেক ওদের আগে আর অর্ধেক পেছনে। রাত হলে বিশাল কোন ক্রালে একাকী রাত কাটাচ্ছে র্যাচেল। ওর সেবার জন্য ওখানে থাকছে উচ্চ বংশীয়, কুমারী জুলু মেয়েরা। তবে রিচার্ডের কপালে জুটছে বেড়াহীন, শ্রী-হীন কোন ক্রাল।

ইসমাইল নদী পার হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই র্যাচেলরা ওখানে এসে পৌঁছুল। ক্যাম্প করল নদীর পাড়ে। রিচার্ডকে তলব করল র্যাচেল। যাত্রা পথে ওর সাথে তেমন একটা কথা বলার সুযোগ পায়নি র্যাচেল। রিচার্ড এলে ইংরেজিতে ওকে জিজ্ঞেস করল শরীর স্বাস্থ্যের হাল কেমন, জুলুরা ভাল ব্যবহার করছে কিনা। তবে ওদের বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা নিয়ে রেগে আছে জুলুরা, কারণ স্পাইরা ওদের কথাই অর্থ বুঝতে পারছে না।

যা হোক, র্যাচেলের প্রশ্নের জবাবে রিচার্ড বলল, 'শরীর ভালই। কিন্তু এখন তোমার পরিকল্পনা কী? নদীর পাশে অনেক উঁচু দিয়ে বইছে। পার হওয়া এই মুহূর্তে কষ্টকর হবে মনে হয়, তবে অসম্ভব না। গুনলাম, আজ সকালেই সশস্ত্র জুলু সৈন্য নিয়ে

নদী পার হয়েছে ইসমাইল নামে এক সাদা লোক। সম্ভবত এর কথাই আমাকে বলেছিলে তুমি।’

র্যাচেল জানে ওর ওপর চোখ রেখেছে জুলুরা। তাই খবরটা শুনেও চেহারা বিন্ময় ফুটতে দিল না ও। স্বাভাবিক চেহারা রেখেই প্রশ্ন করল, ‘তা কী করে সম্ভব? আমি তো শুনেছি অনেক দিন আগেই জুলুল্যাও থেকে পালিয়ে এসেছিল ইসমাইল। কিন্তু তাহলে সৈন্য নিয়ে কী করে নদী পার হয় ও?’

‘তা জানি না, র্যাচেল। তলে তলে কোন রহস্য ঘাঁট পাকাচ্ছে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেই জুলুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ওরা কিছু জানে না। সব রাজা জানে। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে, র্যাচেল, জুলুদের আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। তখন ওরা ধরে নিত, সবই জানা আছে তোমার।’

‘জানি। আজকেই আমরা ওপাড়ে যাব। তবে নদী পার হব শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ না। রামাহ-তেও আমরা কেবল দু’জনে যাব। সেটাও আজই। আমার মন বলছে, খুব বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ভীষণ ভয় করছে আমার, রিচার্ড।’

‘কিন্তু একা আমরা নদী পার হব কী করে? জুলুদেরই বা ম্যানেজ করবে কী করে?’ প্রশ্ন করল রিচার্ড।

‘এখনও জানি না। তবে তুমি যেখানে ক্যাম্প করেছ ওখানেই তোমার আর আমার ঘোড়াগুলোকে স্যাডল পরিয়ে প্রস্তুত করে রেখ। সময় হলে আমিই তোমার কাছে আসব। এখন যাও।’ র্যাচেলকে স্যালুট করে চলে এল রিচার্ড।

টাম্বুসা আর অন্যান্য ক্যাপ্টেনদের ডাকল র্যাচেল। জিজ্ঞেস করল নদীর কী অবস্থা। কারণ নদীটা ওদের ক্যাম্প থেকে আধ মাইল দূরে।

টাম্বুসা বলল, ‘নদী খুব “রেগে আছে”। আমাদের কারো পক্ষেই নদী পার হওয়ার চিন্তা করাও সম্ভব না।’

‘তাই? বেশ। আমি নিজেই নদী দেখব,’ বলে ঘোড়া যেখানে রাখা আছে সেদিকে এগুল ও। পেছনে পেছনে গেল টাম্বুসা আর ওর দলবল। ওখানে স্যাডল ব্রিডল পরানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঘোড়া। পাশে মাটিতে বসে ধূমপান করছে রিচার্ড। র্যাচেলদের আসতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। স্যালাউ করল র্যাচেলকে। কিন্তু ওর দিকে ফিরেও তাকাল না র্যাচেল। লাফিয়ে উঠল ধূসর রঙের মেয়ারটার পিঠে। রিচার্ডকেও ঘোড়ায় চড়তে ইশারা করল।

ওদিকে উদ্‌হীব হয়ে উঠেছে টাম্বুসা। উদ্‌হীন কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাচ্ছেন, ইনকোসাজানা?’

‘নদীর পানিতে মন্ত্র দেব, যাতে পানি শান্ত হয়ে যায়। তাহলে আগামী কাল নদী পার হতে পারব আমি। ডোরিয়ো, এসো। তুমিও এসো, টাম্বুসা। বাকিরা থাকুক। আমার জাদু সবাই দেখতে পারবে না। নয়তো ওদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।’

ক্যাপ্টেনরা দ্বিধা করছে দেখে কবে এক ঝাড়ি লাগাল ওদের র্যাচেল। চলে গেল ওরা। ঘোড়ার পিঠে রিচার্ড আর পায়ে হেঁটে ওদের সাথে রওনা হলো টাম্বুসা। নদীর পাড়ে যেখানে ওকে সালাম করে জুলুরা গ্রহণ করেছিল সেখানে পৌঁছে র্যাচেল দেখল নদীতে পানি আছে বটে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে অনায়াসে নদী পার হওয়া সম্ভব। তখন রিচার্ডকে বলল, ‘আমাদের বাধা দেয়ার কেউ নেই। কাজেই এখনি নদী পার হব আমরা। আর টাম্বুসা তোমাকে মারতে বর্শা না তুললে ওকে কিছু বোলো না। আমার সাথে সবসময় সদয় আচরণ করেছে সে।’

তারপর টাম্বুসাকে বলল, ‘আমি পানির সাথে কথা বলেছি। পানি আমার ক্ষতি করবে না। সময় এসেছে, তাই তোমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য আমাকে ছেড়ে যেতেই হবে। আমার শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য ডোরিয়োর সাথেই এগিয়ে যাব আমি। তুমি টাম্বুসা ছাড়া

আর কেউ নদী পার হয়ে আমাকে অনুসরণ করবে না। এটাই আমার হুকুম। পানি একটু কমলে আমার সাদা ষাঁড়টাকে ওটার মালামাল সহ নিয়ে আসবে তুমি। ওটাকে রামাহ-তে পৌঁছে দেবে। শুনেছ আমার কথা?’

‘শুনেছি, ইনকোসাজানা। তবে আমার মন ভেঙে গেছে।’

‘তবুও আমার হুকুম মানবে তুমি, টাম্বুসা।’

‘মানব, ইনকোসাজানা। কারণ আমি জানি, না মানলে আকাশ ভেঙে পড়বে আমার মাথায়। রাজার হুকুম ছিল আমরা যেন নদী পার হবার চেষ্টা না করি। এমনকী পার হতে পারলেও না। তবে আমার ধারণা, খুব শীঘ্রিই জুলুল্যাণ্ডে আপনার সন্তানদের কাছে ফিরে আসবেন আপনি। তাই বলছিলাম, আগামী সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভাল হতো না, তখন পানিও আরো নেমে যেত, আপনার যাত্রাও নিরাপদ হতো।’

তখন একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টাম্বুসার সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে র্যাচেল প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, টাম্বুসা, আমাকে বলেছিলে ইবুবেসি পালিয়ে গেছে। তাহলে ঘণ্টা কয়েক আগে “সৈন্য নিয়ে” সে এই নদী পার হলো কীভাবে? এবং কেন? ওই যে মাটিতে ওর পায়ের দাগ দেখছি আমি।’

মাথা নিচু করে টাম্বুসা বলল, ‘আমি জানি না, ইনকোসাজানা। আগামী কাল সাদা ষাঁড়টাকে রামাহ-তে নিয়ে আসব আমি, একাই আসব।’

‘হ্যাঁ, তা-ই এসো। কিন্তু যদি ওখানে আমাকে খুঁজে না পাও, বের করবে ইবুবেসি কোথায় আছে। দরকার হলে বর্শার সাহায্য নেবে। খুঁজে বের করবে আমাকে আর এই সাদা সর্দার ডোরিয়াকে।’

টাম্বুসা বলল, ‘আপনার কথার অর্থ আমি বুঝিনি। তবে আপনাকে খুঁজব আমি। নিশ্চিত থাকুন, রামাহ-তে না পেলে সারা

তল্লাট উল্টে-পাল্টে ফেলব। দরকার হলে, জুলুল্যাণ্ডের সমস্ত বর্শা ডেকে আনব আমি।’

‘তাহলে বিদায়, টাম্বুসা। ক্যাপ্টেনদেরও আমার হয়ে বিদায় বলে দিয়ো। ওদের জানিয়ো, আমার ইচ্ছা ফিরে যাক ওরা। রাজা ও বাকি সবার জন্য আমার ও সাদা সর্দারের আশীর্বাদ রইল। কাল রামাহ-তে আবার আমাদের দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য বিদায়,’ বলে রিচার্ডকে নিয়ে পানিতে নেমে গেল র্যাচেল। পেছনে সরে দাঁড়িয়ে র্যাচেলকে বায়াতে দিল টাম্বুসা।

গর্জন তুলে ছুটছে কাদায় লাল হয়ে থাকা নদীর পানি। তবে স্রোত থাকলেও নদী পার হতে তেমন একটা ঝামেলা হলো না। মাঝে একবার কেবল র্যাচেলের ঘোড়াটার পা হড়কে গেল। অবশ্য সেটাও কয়েক গজ এগিয়ে নিজে থেকেই সামলে নিতে পারল। ফলে কোন ঝামেলা ছাড়াই ওপাড়ে চলে গেল র্যাচেল আর রিচার্ড।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রিচার্ড বলল, ‘অবশেষে মুক্ত। আর ভয়ের কিছু নেই, র্যাচেল,’ বলে র্যাচেলের দিকে তাকাল রিচার্ড। দেখল ফ্যাকাসে হয়ে আছে র্যাচেলের চেহারা। সামনে ঝুঁকে গেছে ও। এমনভাবে স্যাডলের পমেল আঁকড়ে ধরে আছে যেন এখনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। লাফিয়ে সামনে বাড়ল রিচার্ড, ‘কী হয়েছে, র্যাচেল? স্রোত দেখে ভয় পেয়েছ? অসুস্থ লাগছে? কী হয়েছে?’

কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই থাকল র্যাচেল। তারপর যেন নিজেকে ফিরে পেল। ধীরে নিচু কণ্ঠে বলল, ‘জুলুদের মাঝে এতদিন থেকেছি, ইনকোসাজানার অভিনয় করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলেই ইনকোসাজানার ক্ষমতা আমার চেতনার কাজ করা শুরু করেছে। পানি পার হবার সময় বাবা আর মায়ের কণ্ঠ শুনেছি আমি। মনে হলো তারা যেন আমাকে ডাকছে, ভীষণ যন্ত্রণা আর

ভয়ের ভেতর আছে ওরা। প্রায় এক মিনিটের মতো ওদের কণ্ঠ শুনেছি। মনে হলো তোমাকে নিয়েও কিছু একটা বলল তারা। তারপরই মনে হলো ঠাণ্ডা একটা বাতাসের ঝাপ্টা এল। অপার্থিব বাতাস। আমাদের চেনা জানা কোন কিছু সেটা নয়। এরপরই মুছে গেল সব। আমার মাথাও শূন্য হয়ে গেল। কীভাবে নদী পার হয়েছি বলতে পারব না। সংবিৎ ফিরল তোমার ডাকে। দেখলাম এপাড়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। হেসো না, রিচার্ড। আমি সত্যি বলছি। আসলেই কাফ্রিরা ঠিক বলে। আসলেই মনে হয় আমার ভেতর কিছু একটা আছে। তোমার আসার খবরও আমি অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম।’

‘না, হাসব কেন? আমি তো অন্তত জানি, যে, আর দশটা মেয়ের চেয়ে অনেক ভিন্ন তুমি,’ বলল রিচার্ড। র‍্যাচেলের অস্বস্তির খানিকটা ওর ভেতরও ঢুকে গেছে। অস্বস্তিটা ওর ভেতর বইয়ে দিল ভয়ের চোরা স্রোত। রিচার্ডের কণ্ঠে তা লুকানোও রইল না। রিচার্ড বলে চলেছে, ‘জুলুদের সাথে অনেক দিন ছিলে, ছিলে অসম্ভব চাপের ভেতর। হয়তো তার প্রভাবেই অমন কল্পনা খেলে গেছে তোমার মাথায়।’

‘হয়তো। প্রার্থনা করি সেটাই যেন হয়। কয়টা বাজে?’ হঠাৎ প্রশ্ন করল র‍্যাচেল।

সূর্যের অবস্থান দেখে রিচার্ড বলল, ‘আনুমানিক সোয়া ছয়টা।’

‘তাহলে তো অন্ধকার নামার আগে রামাহ-ই আমরা পৌঁছাতে পারব না,’ বলল র‍্যাচেল।

‘তা হয়তো পারব না, কিন্তু উজ্জ্বল জ্যোৎস্না পাব। চাঁদ বেশ বড় আছে এখনও,’ বলল রিচার্ড।

একবার কেঁপে উঠল র‍্যাচেল। বলল, ‘হ্যাঁ, বড় চাঁদ। জানি না, বাড়ি ফিরে কী দেখব চাঁদের আলোয়।’

সন্ধ্যার লালিমা গায়ে মেখে অনেক ঝোপঝাড় আর ঝিরি পার হয়ে এগিয়ে গেল ওরা। অন্ধকার নেমে এল একসময়। গতি কমে গেল ওদের। তারপর চাঁদ উঠল। উজ্জ্বল রূপালী আলোয় ওরা পৌঁছে গেল রামাহ-এর আগের বিস্তীর্ণ ঘেসো সমতল ভূমির প্রান্তে। চাঁদের আলোয় রূপালী বর্ণ ধারণ করেছে বিশাল প্রান্তর। কিন্তু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে র্যাচেলকে। এই লম্বা পথে ওদের তেমন কথা হলো না। অথচ কত কথা জমে ছিল রিচার্ডের মনে। কথার ঝর্ণাটা হঠাৎই যেন শুকিয়ে গেছে। যা হোক, রামাহ-এর কাছে চলে এসেছে ওরা। কিন্তু ভীষণ নীরব হয়ে আছে রামাহ। লোকজনের কোন সাড়াশব্দ নেই। কোথাও আলো জ্বলছে না। চার্চে এই সময় সন্ধ্যার প্রার্থনা হয়, তার আগে ঘণ্টা বাজে। কিন্তু ঘণ্টাটাও নীরব হয়ে আছে। নিস্ত্রাণ হয়ে আছে পুরো এলাকা।

‘রিচার্ড, কোথাও কেউ নেই কেন? রামাহ-এর তো কোন ক্ষতি হয়নি দেখছি। কিন্তু এমন নিখর হয়ে আছে কেন চারদিক?’

কেবল মাথা নেড়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল রিচার্ড। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগুল ওরা। ঠিক তখনি বারান্দা থেকে ছুটে পালাল একটা স্ট্রাইপড হায়েনা। ভীকু পায়ে রিচার্ডের হাত ধরে এগুল র্যাচেল। খোলা দরজা পার হয়ে ঘরে ঢুকল, তারপর সোজা চলে গেল বাবা-মায়ের বেড রুমে। খোলা জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে ঘরটা।

জায়গায় জমে গেছে র্যাচেল। মূর্তির মতো ঠক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। রিচার্ডের মনে হচ্ছে যেন এক বছর পার হয়ে গেল র্যাচেলের মুখ বন্ধ। মুখ খুলল রিচার্ড। মেঝেতে এক জুলু সৈন্যকে পড়ে থাকতে দেখে ও বলল, ‘জুলুরা মেরে ফেলেছে তোমার বাবা-মাকে!’

‘না, জুলুরা না, ইসমাইল মেরেছে ওদের। ইসমাইল,’ বলে

মেঝেতে পড়ে থাকা গণ্ডারের শিঙের একটা দণ্ড দেখাল র্যাচেল।
'এই জিনিসটা খুব ভাল করে চিনি আমি। এটা সব সময়
ইসমাইলের হাতে থাকে। ও-ই আসল ইন্ধনদাতা। জুলুদের এই
কাজ করার সাইস কখনোই হবে না,' হাত থেকে লাঠিটা ফেলে
দিয়ে বলল র্যাচেল।

'একটু ভাবতে দাও। শয়তানটা যদি এই কাজ করেই থাকে
তাহলেও বিনা স্বার্থে এই হীন কাজ সে করেনি। নির্ঘাত আশপাশে
কোথাও লুকিয়ে আছে ও। অবশ্যই তোমাকে তুলে নিতে চায়।
র্যাচেল, এখনি আমাদের এখন থেকে চলে যাওয়া উচিত,
এখনি। ডারবানের দিকে রওনা হওয়া উচিত আমাদের। সাদা
লোকেরা তোমাকে নিরাপত্তা দেবে,' বলল রিচার্ড।

শীতল কণ্ঠে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, 'বাবা-মাকে কবর দেবে
কে?'

'জানি না। কিন্তু মৃতদের জন্য কিছু করার চেয়ে যারা বেঁচে
আছে তাদের প্রাণের চিন্তা আগে করাটা বেশি জরুরি। পরে আমি
ফিরে এসে যা করার করব।'

'মনে হয় ঠিকই বলেছ,' বলে হাঁটু মুড়ে মৃত বাবা-মায়ের
পাশে বসে তাদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য খানিক প্রার্থনা
করল র্যাচেল। তারপর উঠে ওদের কপালে শেষবারের মতো
বিদায়ী চুমু ঝুঁকে দিল ও। ঘুরে দাঁড়াল, তখনি চোখে পড়ল জুলু
যোদ্ধার অ্যাসেগাইটা। ওটা তুলে নিল র্যাচেল। কিন্তু চৌকঠপার
হতে পারল না। হেলে পড়ল রিচার্ডের বাহুর ভেতর। নিজেকে
আর ধরে রাখতে পারছে না। ডুকরে কেঁদে উঠল।

'সব শেষ হয়ে গেছে রিচার্ড, সব শেষ। আপনি বলতে এক
কেবল তুমিই আছ এখন। কিন্তু তোমাকেও যদি নিয়ে যায়, তখন
কী হবে? কী নিয়ে বাঁচব আমি?' বলতে বলতে ঝরঝর করে কান্না
নেমে এল র্যাচেলের দু'চোখ দিয়ে। তখনি র্যাচেল খেয়াল

করল বারান্দায় হঠাৎ উদয় হয়েছে কিছু লোক। কেউ একজন কাফ্রিদের ভাষায় হুকুম করল, ‘ধরো, বেঁধে ফেলো ওই সাদা লোকটিকে।’

সাথে সাথেই নড়ে উঠল তারা। রিচার্ড একটা শব্দও উচ্চারণ করার আগেই ওকে ধরে বেঁধে ফেলল ওরা। তখন র্যাচেলের মনে হলো, ওরা নির্ঘাত জুলু। সাহস ফিরে পেল ও। বলল, ‘কারা তোমরা? ইনকোসাজানা আর তার ভৃত্যের দিকে হাত তোলার সাহস তোমাদের হলো কী করে?’

কালো লোকগুলোর মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। ফাঁকা তৈরি হলো ওদের মাঝে। এগিয়ে এল একজন। সে হচ্ছে ইসমাইল। বলল, ‘র্যাচেল, এরা আমার লোক। আমরা দেখেছি, লোকটি তোমার গায়ে হাত দিয়েছে। তাই ওকে ধরেছে এরা। দেখেছ নিশ্চয়ই, বিকালে এখানে একটা ভয়াবহ অঘটন ঘটে গেছে। তোমার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে জুলুরা। ডিনগানের হুকুমে ওদের নিতে এসেছিল তারা। আমার আসলে বলা উচিত, তোমার বাবাকে মেরেছে আর তোমার মা ওদের সাথে যেতে চাইছিল না। খুব অসুস্থ ছিল সে। টানাটানি সহিতে পারেনি, শক পেয়ে মারা গেছে সে। আমি জানতে পেরেছি এদিকেই আসছ তুমি। তাই এখানে চলে এসেছি। বাকিটা তো জানোই।’

ইসমাইল ইংরেজিতে বললেও ওকে জুলু ভাষায় উত্তর দিল র্যাচেল, ‘আমি সবই জানি, নিশাচর। জানি, আমার বাবা আর মা মারা গেছে তোমার হুকুমে এবং তোমার সামনে। তাদের আত্মা আমাকে বলে গেছে সেই কথা। এই অপরাধে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম আমি,’ হাতের বর্শাটা দিয়ে ইসমাইলকে দেখিয়ে ঘোষণা করল র্যাচেল। বলে চলেছে, ‘স্বর্গ আর মৃত্যু সাক্ষী রইল, এর মৃত্যুদণ্ড জারি করেছি আমি। জুলু জাতি, শোনো, শোনো, বহু দূরে নিজের আসনে বসে থাকা রাজা ডিনগান, সুমন্ত, ইন্দুনা আর সব

জুলু ক্যাপ্টেন, ইনকোসাজানার হুকুম-এই নিশাচর ইবুবেসিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি আমি। এই লোকের কারণে রক্ত ঝরেছে। ঝরেছে আমার নিজের বাবা-মায়ের রক্ত। অভিশাপ নামবে এবার, ইনকোসাজানার অভিশাপ। নিশাচর, হুকুম জারি হয়ে গেছে। এবার মরার আগে তোমার যা যা করার করে নাও। আর, তোমরা, নিশাচর ইবুবেসির ভৃত্যরা, মনে রেখো, যদি আমার বা এই সাদা সর্দার ডোরিয়োর কোন ক্ষতি তোমরা করো তাহলে তোমরাও মরবে। তোমাদের প্রত্যেকেই মরবে। এবার বলো তোমার শেষ ইচ্ছা কী, নিশাচর?’

দৃঢ়তা দেখাতে চাইল ইসমাইল। বলল, ‘আমার যা বলার মাফুটিতে গিয়ে বলব। অসভ্য জুলুদের মতো তোমাকে ভয় পাই না আমি। আর ডিনগানের কথা বলছ, সে-ও এখান থেকে বহু দূরে আছে। আমার সাথে শান্তভাবে যাবে কিনা বলো? তোমাকে আঘাত দিয়ে অপমান করে নিতে চাই না আমি। তবে যেভাবেই হোক না কেন, যেতে তোমাকে হবেই। ডোরিয়োকেও যেতে হবে। ঝামেলা করলে একে এখনি মেরে ফেলব। বুঝে নাও, র্যাচেল, আমার লোকেরা তোমাকে ভয় পেতে পারে। কিন্তু ওই লোকটার গলা কাটতে দ্বিধা করবে না কেউ,’ বলল ইসমাইল।

তখন মাটিতে পড়ে থেকেই রিচার্ড বলল, ‘আমাকে নিয়ে ভেবো না। তোমার জন্য যেটা ভাল সেটাই করো।’

ইসমাইলের সাথে লোকগুলোর চেহারার দিকে তাকাল র্যাচেল। বই পড়ার মতো পড়ে নিল ওদের মন। অবশ্য এটা সবসময়ই ও পারে। ওদের দেখে বুঝল, ইসমাইল-ই বলুক, ও নিজে বললে ওকে অবশ্যই চলে যেতে দেবে ওরা। কিন্তু আসলেই রিচার্ডকে খুন করতে ওদের হাত কাঁপবে না। তাই রিচার্ডের প্রাণ ওর কাজের ওপর নির্ভর করছে বুঝে নেটিভদের ও বলল, ‘ইবুবেসির ভৃত্যরা, সর্দার ডোরিয়োকে দাঁড়া করাও।’

ইসমাইলের দিকে না তাকিয়েই র্যাচেলের হুকুম তামিল করল ওরা। দাঁড় করিয়েছে রিচার্ডকে। বাইরে চলে গেল ইসমাইল। তখন কয়েকজন লোক র্যাচেলের সাথে রেখে ইসমাইলের পেছন পেছন বাগানে চলে গেল বাকিরা। এই মুহূর্তে ওদিক থেকে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজ আসছে। তবে কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। এটুকুই কেবল র্যাচেল বুঝল যে, ইসমাইল ওর লোকদের কিছু একটা করতে বলেছে কিন্তু সেটা মানতে নারাজ ওরা। তাই ভীষণ রেগে গিয়ে ওদের শাপ-শাপান্ত করছে ইসমাইল। হঠাৎ ভেসে এল বন্দুকের গুলির আওয়াজ, সাথে তীব্র যন্ত্রণাকাতর চিৎকার। বোঝাই যাচ্ছে, হুকুম না মানায় সর্দার লোকটিকে গুলি করেছে ইসমাইল। মাটিতে পড়ে গেছে সে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে তার চেহারা। এই সেই লোক যে ইসমাইলকে কুকুর সংক্রান্ত ষটনাটা বলেছিল।

ওদিকে প্রচণ্ড আতঙ্কে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে র্যাচেল। ও ভাবছে রিচার্ডকেই বুঝি কিছু করে বসেছে ইসমাইল।

তখন বাইরে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘দুশ্চিন্তা করবেন না, ইনকোসাজানা, সর্দার ডোরিয়োর কিছু হয়নি। নিশ্চিত থাকুন, আমাদের তরফ থেকে ওর কিছুই হবে না। ওকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব আমরা। আর এদিকের ঘটনা হচ্ছে, হুকুম না মানায় আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে ইবুবেসি। তবে তারপরও সাদা সর্দারকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের কারণে তার কোন বিপদ হবে না। আপনার ঘোড়াটা প্রস্তুত। আপনি দ্রুত করে আসুন, জুলা। নইলে আমাদের আরো লোক মেরে ফেলবে ইবুবেসি।’

বের হয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল র্যাচেল। রিচার্ডকে আগেই ঘোড়ায় উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পিছমোড়ায় করে বাঁধা ওর হাত। পা-ও চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনল

রিচার্ড বলছে, ‘আমি কিছুই করতে পারছি না। সাবধানে থেকো, র্যাচেল। মনে রেখো আমাদেরও সময় আসবে।’

বিড়বিড় করে র্যাচেল বলল, ‘হ্যাঁ, আমাদের সময় আসবে আর ওরটা শেষ হবে।’

র্যাচেল শুনতে পেল বহু কিছু ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইসমাইল, অনেক কিছুই বলছে। কিন্তু ওসবে কান দিল না র্যাচেল। ওর মাথা ফাঁকা হয়ে আছে। ও কেবল এতটুকুই অনুভব করল, অনেক লম্বা একটা সময় ধরে যাচ্ছেই ওরা, যাচ্ছেই। র্যাচেলের ক্লান্ত ঘোড়াটা একসময় থামল। পিছলে ঘোড়া থেকে নেমে এল র্যাচেল। কিন্তু হাঁটার শক্তিও ওর নেই। এক মহিলার সহায়তায় ঘরে নেয়া হয়েছে ওকে। র্যাচেলের শুধু এটুকুই মনে আছে যে, মহিলাটি ওকে স্পর্শ করতে খুব ভয় পাচ্ছিল। ঘরে ঢোকার পর আর কিছু মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও।

র্যাচেলের ঘুম ভাঙল পরদিন। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, কাফ্রি পদ্ধতিতে বানানো মাটির একটা ঘরে আছে ও। মাটি দিয়ে বানানো হলেও ঘরটা বেশ বড় ও মজবুত। অন্দর সজ্জায় ইউরোপিয়ান আবহ ফোটানোর চেষ্টা স্পষ্ট। ঘরে এমনকী কাঠের তৈরি চেয়ার টেবিলও আছে। ছোট একটা জানালাও আছে। তাতে ঝুলছে নলখাগড়া বুনে বানানো পর্দা। ঘর থেকে ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য মাথার ওপর আছে দেড়ফুট ব্যাসের গোলাকার একটা স্মোক হোল। সেটা দিয়ে রোদ ঢুকেছে ঘরে।

অর্থাৎ এখন দিনের মধ্যভাগ। ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে রাতের স্মৃতি ফিরে এল ওর। মরে যেতে ইচ্ছে করছে র্যাচেলের। পাশেই রাখা আছে অ্যাসেগাইটা। ওটা তুলে নিল, ধারাল প্রান্তটা স্পর্শ করে দেখল ও। ইচ্ছে বুকে বসিয়ে দেবে। তখন ও ভাবল রিচার্ড তো বেঁচে আছে, তাহলে ও কেন মরবে। তার ওপর আত্মহত্যা মহাপাপ। কাজেই উঠে বসল ও। টেবিলের ওপর কিছু

খাবার আর একটা গ্লাসে মাঠা রাখা আছে। জোর করে ওসব খেল
 র্যাচেল। তারপর আবিষ্কার করল ঘরের এক কোণে একটা কাঠের
 বোলে পানি রাখা আছে। ও দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক-আশাক
 ঠিক করে নিল ও। বোলের পাশে চিরুনিও রাখা আছে একটা।
 সদ্যবহার করল সেটার। তারপর গেল দরজার কাছে। সেটা
 বাইরে থেকে লাগানো নেই দেখে দরজা খুলে বের হয়ে এল ও।
 মজবুত একটা পাথুরে দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটাকে ঘিরে।
 দেয়ালে কাঠের তৈরি শক্ত-পোক্ত একটা দরজা আছে। তবে সেটা
 বাইরে থেকে বন্ধ। উঠান লেপা হয়েছে পিঁপড়ের টিবির মাটি
 দিয়ে। সেটাকে আবার পলিশ করে নেটিভদের প্রচলিত রীতি
 অনুযায়ী কালো করে তোলা হয়েছে। দেয়ালের ঘেরের ভেতর
 ক্রালের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক গাছ। সেটার ছায়ায়
 একটা বেঞ্চ পাতা। করার কিছু না থাকায় ওটাতেই গিয়ে বসল
 র্যাচেল। কিছুক্ষণ পর দরজার বোল্ট সরে গেল। অর্থাৎ নজর
 রাখা হয়েছে ওর ওপর। ওকে জাগতে দেখে এখন লোক আসছে
 ভেতরে।

ভেতরে এল ইসমাইল। ওর দিকে তাকিয়ে র্যাচেল ভাবল
 এই লোকটিই ওর বাবা-মায়ের খুনি। কষ্ট ওকে কাবু করতে
 পারছে না। বরং ওর সমগ্র অস্তিত্ব দখল করে নিচ্ছে শীতল রাগ।
 আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেও ইসমাইলের চেহারা
 অপরাধবোধ খুব একটা লুকানো থাকছে না। অপর দিকে অনড়
 বসে আছে র্যাচেল। উম্মণনগ্নলোভে বিচার শুরু করার সময়
 যেমন থাকত ঠিক তেমন। একেবারে নির্বিকার।

হ্যাট খুলে র্যাচেলকে বাউ করল ইসমাইল। কিন্তু কোন
 জবাব দিল না র্যাচেল। তারপর ইসমাইল নিজেই বলা শুরু
 করল, 'এখন তোমাকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছে। আশা করি রাতে
 ভাল ঘুমিয়েছ। তোমাকে নিয়ে একটু চিন্তায়ই ছিলাম আমি।

কারণ, একে তো বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়েছ তার ওপর ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তোমার সাথে। তবে এর একটা ব্যাখ্যা আছে আমার কাছে। আসলে যা হয়েছে তাতে আমাকে দোষ দেয়া যাবে না। ওই মূর্খ জুলুগুলোই আত্মহের আতিশয্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে।’ প্রতিটা বাক্যের শেষে একবার করে থামল ইসমাইল। আশা, কোন একটা জবাব বুঝি দেবে র্যাচেল। কিন্তু ওর মুখে কথাই ফুটল না। শেষে ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেল ও।

এমন সময় অ্যাসেগাইটা হাতে তুলে নিল র্যাচেল। ব্লেডটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘কার রক্ত লেগে আছে এতে, আপনার?’

‘সামান্য একটু, হ্যাঁ, আমারই রক্ত। তোমার বাবা যে কাফ্রি গর্দভটাকে গুলি করেছে, দুর্ঘটনাবশত ওর হাত থেকেই ছুটে এসে আমার গায়ে লেগেছিল এই অ্যাসেগাইটার ফলা,’ চেহারা তৈরি হওয়া ক্ষতটা দেখিয়ে সাফাই দিল ইসমাইল।

বেঞ্চের পায়ায় ফলার রক্ত লাগা জায়গাটা ঘষতে শুরু করল র্যাচেল। এই দেখে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল ইসমাইল। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে র্যাচেলকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী করছ?’

হাতের কাজ থামিয়ে র্যাচেল বলল, ‘আমি চাই না আপনার রক্ত আমাকে কলুষিত করুক। এমনকী মরে যাওয়ার সময়ও না,’ বলে আবার ফলা ঘষায় মন দিল র্যাচেল।

আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ইসমাইল। ‘মরে যাওয়া মানে? কী বোঝাতে চাইছ, খুলে বলো তো?’

‘জুলুদের জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। ওরা আমার কথা বোঝে। আর ওদের জিজ্ঞেস করার সময় না পেলে ওপারি গিয়ে আমার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবেন।’

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইসমাইলের চেহারা। বহু কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক করল সে। বলল, ‘ওঝাগিরি বাদ থাক, কাজের কথায়

আসি। যা বলছিলাম, তোমার বাবা-মায়ের মৃত্যুতে আমার কোন হাত নেই। বরং ওদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছি আমি...

‘তাই? তাহলে আপনার পেছনে ওদের দু’জনকে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে দেখছি কেন? কেন তারা আপনাকে দোষী বলছে?’ শান্ত কণ্ঠে বলল র্যাচেল।

ভীষণ চমকে উঠল ইসমাইল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিক দেখল একবার। তারপর বলল, ‘আমি কাফ্রি বোকা নই। ওসব আবোল তাবোল বলে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। আমার দিকে তাকাও, র্যাচেল। তুমি নিজেও জানো আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি। বারবার তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আরো বেড়েছে। আমাকে তুমি বিয়ে করবে?’

‘গতরাতেই বলেছি, ক’দিনের মধ্যেই আপনি মারা পড়বেন। কাজেই এখন বিয়ে নিয়ে অযথা মাথা না ঘামিয়ে পাপ যা যা করেছেন সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবেন তা ভাবুন।’

‘আমি জানি, র্যাচেল, তুমি ভাল ভবিষ্যৎ বক্তা...’

মাঝখানে বলে উঠল র্যাচেল, ‘নোয়িও খুব ভাল ভবিষ্যৎ বলতে পারে। জুলুদের ব্যবহার করে ওর বাবা-মাকে খুন করিয়েছেন আপনি। আপনার মনে আছে, সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সেয়াপির একটা কথা আপনাকে জানিয়েছিল ও?’

‘মনে আছে মানে! ওর শয়তানির কথা কি কখনো ভুলতে পারব আমি? তোমার মতো ও-ও এক জাদুকরী কণ্ঠে ওর আত্মাটা মনে হয় অনেক বেশি কালো। ওকে জুলুগ্যাও না নিলে কখনোই তোমার নাগাল পেতাম না আমি,’ বলল ইসমাইল।

‘ও ফিরে আসছে, মি. ইসমাইল। অকস্মাৎ, আমি নিশ্চিত নই যে আপনাকে “বিদায়” বলার সময় ও পাবে কিনা।’

‘তুমি বলছ, অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যাবু আমি। কিন্তু আমি

একটুও ভয় পাচ্ছি না। আর তোমার কথা যদি ঠিক বলে ধরেও নিই, তাহলে আসলেই কথা বলে নষ্ট করার সময় আমার নেই। কখন বিয়ের পিঁড়িতে বসছ, বল।’

‘কখনোই না,’ সাথে সাথেই বলল র্যাচেল, ‘এই জনমে বা অন্য কোন জনমেও না। আপনার দিকে তাকালেই শিউরে উঠি আমি। মনে হয় পায়ের ওপর দিয়ে বুঝি একটা সাপ চলে গেল। আপনার হাতে তাকালেই তাতে রক্তের লাল দাগ দেখি আমি। নোয়ির বাবা মা, আমার বাবা মা, আরো অনেকের রক্ত লেগে আছে আপনার হাতে। এটাই আমার উত্তর।’

মুহূর্তখানেক র্যাচেলের দিকে তাকিয়ে রইল ইসমাইল। তারপর বলল, ‘ভুলে যাচ্ছ, যা আমি কেড়ে নিতে পারি, সেটাই ভদ্রভাবে চাইছি। এখানে আমার “মহিলারা” ছাড়া আর কেউ তোমার কথা শুনতে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। র্যাচেল ডাভ, তুমি এখন আমার মুঠোর ভেতর।’

কথাটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পাওয়ার কথা র্যাচেলের। কিন্তু ইসমাইলকে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল র্যাচেল। আকাশে উড়ন্ত একটা ঈগল দেখিয়ে র্যাচেল বলল, ‘ওই ঈগলটা আপনার হাত থেকে যতটা নিরাপদ তারচেয়ে বেশি নিরাপদ আমি। আর আমার দিকে আপনি একটা আঙুল তোলারও অনেক আগেই আত্মহত্যার হাজারটা উপায় খুঁজে নিতে পারি আমি। কিন্তু কথা সেটা না। কুথা হচ্ছে, ওসব কিছু দেখার সময় আপনি পাবেন না।’

নীরব হয়ে গেল ইসমাইল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তারপর যখন মুখ খুলল, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলল ও। ‘বললে, আমাকে তুমি ঘৃণা করো র্যাচেল। এ নিশ্চয়ই ওই অভিশপ্ত লোক ডোরিয়োর জন্য। ও কিন্তু আমার হাতের মুঠোয়। এবার তোমাকে এসপার-ওসপার একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। হয়

আমার বৌ হবে, নয়তো ড্যারিয়েন মরবে। বুঝেছ?

এবার সত্যিই ভয় পেল র্যাচেল। কথা বললে ভয়টা প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই চুপ করেই রইল ও।

ইসমাইল বলে চলেছে, ‘অনেক ঝামেলা গেছে তোমার ওপর দিয়ে। তুমিও ক্লান্ত, বুঝতে পারছ না কী বলবে। যদিও তোমার বিশ্বাস আমিই তোমার বাবা-মাকে খুন করিয়েছি, কিন্তু সেটাও সত্য নয়। তাই আমার প্রতি তোমার ঘৃণা অমূলক। বিয়ের জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে, অনেক কাজ সামলাতে হবে। তাই চিন্তা ভাবনা করার জন্য তিন দিন সময় দিচ্ছি তোমায়। এর পরই মরবে ড্যারিয়েন। তারপর দেখব, আসলেই তুমি আমার মুঠোয় আছ কি নেই! ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে লাভ হবে না। অনেক ঝুঁকি নিয়েছি। আরো দুয়েকটা ঝুঁকি নিলে তাতে নতুন করে কিছু আসবে যাবে না। ইত্যবসরে রিচার্ড ভালই থাকবে। যাক, এখন আর তোমাকে প্রেম-প্রেম কথা বলে বিরক্ত করব না। ওর জন্য পরে অনেক সময় পাব।’

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। বর্শাটা তুলে গেট দেখিয়ে দিল। বলল শুধু, ‘যান।’

‘চলে যাচ্ছি। আমার “মহিলারা” চেষ্টা করবে এই অ-জায়গায় যতটা সম্ভব তোমাকে আরামে রাখতে। কিছু লাগলে ওদের বোলো,’ বলে বেরিয়ে গেল ইসমাইল। পেছনে বোল্ট এঁটে বন্ধ করে দিল গেট।

BanglaBook.org

ষোলো

বদ লোকটা চলে গেলে পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল র্যাচেল। আফসোস করতে লাগল, কেন যে জুলু সৈন্যদের দুয়েকজনকে সাথে আনল না। ওদের সামনে এমন ধৃষ্টতা দেখাতে মোটেও সাহস পেত না ইসমাইল। তারপর ভাবতে বসল, কেন তিনদিন সময় দিল সে। সম্ভবত বুঝেছে ঈগলের উদাহরণটা আসলেও সত্য। তাই রিচার্ডের প্রাণের ওপর হুমকি দিয়ে ওকে কাবু করতে চায় সে। হয়তো নিরুপায় হলে তা-ই করবে ইসমাইল। হয়তো সে ভেবেছে তিনদিন এসব চিন্তা করে দুর্বল হয়ে যাবে র্যাচেল।

এসব যখন ভাবছে ফটক খুলে গেল। উঠানে প্রবেশ করল তিনজন মহিলা। সসম্মানে র্যাচেলকে সালাম করে জানাল ঘর পরিষ্কার করতে পাঠানো হয়েছে ওদের। ওদের ভাল করে খেয়াল করল র্যাচেল। দু'জন সুদর্শনা কাফ্রি তরুণী আর একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এই মহিলাটিকে এখন আর আকর্ষণীয় বলা যাবে না। চেহারায় ফুটে আছে কেমন একটা দুঃখী ভাব। সে-ই জানাল ওরা সবাই ইবুবেসির স্ত্রী। আর তার নাম মামি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ সেরে বেরিয়ে এল ওরা। বলল জুলার জন্য খাবার আনতে যাবে তারা। তখন র্যাচেল বলল যে, ওর জন্য তিনজনের কষ্ট করার দরকার নেই। খাবার নিয়ে মামি একা এলেই চলবে। র্যাচেলকে স্যালুট করে ওরা চলে গেল।

বলে গেল র্যাচেলের হুকুম পালিত হবে।

স্পষ্টতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে তরুণী দু'জন। কারণ ওকে ভয় পাচ্ছিল সবাই। র্যাচেলের ইনকোসাজানা নাম ওদের কাছেও পৌঁছেছে। জানে ওই নামের প্রকৃত অর্থ কী।

এক ঘণ্টা পরে খাবার নিয়ে এল মামি। প্রায় সবই খেল র্যাচেল। কারণ ওর মন বলছে সামনে শক্তি দরকার হবে। খেতে খেতেই মাটিতে বসে থাকা মামির সাথে কথা বলল ও। জানতে পারল মামিই ইসমাইলের প্রথম বৌ। কিন্তু কখনোই স্ত্রী হিসেবে ওকে মূল্যায়ন করেনি ইসমাইল। সমস্ত নিয়ম কানুন অগ্রাহ্য করে দাসীর মতো আচরণ করেছে মামির সাথে। এমনকী ওর গবাদি পশু ছিনিয়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছে ইসমাইলের অন্য বৌদের। তাই ইসমাইলকে মোটেও পছন্দ করে না সে। সাদা লোকের বৌ হতে পেয়ে একসময় গর্বিত ছিল মামি। কিন্তু এখন মনে হয় এই লোকের চেহারা কোনদিন না দেখলেই ভাল হতো।

ব্যস, ওকে পেয়ে গেছে র্যাচেল। কিন্তু এখনি মামিকে কিছু বলল না র্যাচেল। কেবল বলল, রাতে মামি ওর সাথে থাকলে খুব খুশি হবে র্যাচেল। কারণ একা থাকা ওর নিয়ম না। শুনে মামি জানাল যে ইবুবেসি অনুমতি দিলে সানন্দে থাকতে রাজি সে। সাথে অবশ্য এটাও বলল যে আসলে এত বড় সম্মানের পাত্রী সে না।

মামিকে থাকার অনুমতি দিল ইসমাইল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসমাইল ভাবল মামিকে বিশ্বাস করতে পারে সে। তাই র্যাচেলের ওপর গুপ্তচরগিরি করতে বলে দিল সে। কিন্তু র্যাচেলের সাথে কথা বলার সময় ওকে কথাটা জানিয়ে দিল মামি।

তখন র্যাচেল বলল ইনকোসাজানার বিরুদ্ধে কিছু করলে স্বর্গের অভিশাপ এসে পড়বে মামির ওপর।

মামিও বলল যে, এটা সে খুব ভাল করেই জানে। বানিয়ে-

টানিয়ে ইসমাইলকে কিছু একটা বলে দিলেই হবে। নানা কথা বলে মামিকেই মুখ খুলতে উৎসাহ দিল র্যাচেল। তাতে কাজও হলো। কিছু খবর জানতে পারল র্যাচেল। যেমন পুরো মাফুটি বসতির সর্দার হচ্ছে ইসমাইল। এখানে ষাট থেকে সত্তর ঘর লোক বাস করে। তবে ইনকোসাজানা ও সাদা সর্দার ডোরিয়াকে এখানে বন্দি করে রাখা নিয়ে ওরা সবাই বিব্রত ও বেশ ভয়ের মধ্যেই আছে। কারণ ওরা ভাল করে জানে ইনকোসাজানা যেখানে যাবে জুলুরাও সেখানে যাবে। মাফুটির অধিবাসীরা নিজেরাও জুলু। তাই ওরা ভাল করেই জানে জুলু সৈন্য আগমনের পরিণাম কী হতে পারে। এমনকী “চিৎকারকারীর” মৃত্যু নিয়েও ওরা ভীষণ অশ্বস্তিতে আছে। ওদের ধারণা, এই মৃত্যুর পেছনে কোন না কোনভাবে ইবুবেসির ইন্ধন আছে। সর্দার ডোরিয়াকে এখানে বন্দি করে রাখতেও ওদের আপত্তি ছিল, বিশেষত সে যখন ওদের কোন ক্ষতি করেনি। উপরন্তু, ইনকোসাজানার নিরাপত্তার ছায়ায় আছে সে। কিন্তু ইবুবেসির ভয়ে বাধ্য হয়েছে তারা। কারণ কথা না শুনলে গবাদি পশু তাড়িয়ে দিতে পারে ইবুবেসি, এমনকী প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে। এর নমুনা র্যাচেল নিজেই দেখে এসেছে। রামাহ-তে একজনকে মেরে ফেলেছে সে। তবে কোন কারণে ভয়ে আছে ইবুবেসি। মাফুটির পাথুরে প্রাচীর ক্রমেই শক্ত করছে সে। টাউনের সবাইকেই এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। শিশু বৃদ্ধ কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। ইসমাইলের অতীত-বর্তমান নিয়ে আরো অনেক কথা জানল র্যাচেল। তারপর মামিকে অনুরোধ করল, যদি পারে ডোরিয়োর কাছে যেন একটা খবর পৌঁছে দেয় সে। সেটা হচ্ছে, “র্যাচেল সুস্থ আছে, ভাল আছে। খুব দেখে-শুনে পা ফেলতে হবে ডোরিয়াকে। আর ওরা দু’জনেই ভীষণ বিপদে আছে।” এর বেশি কিছু বলতে সাহস পেল না। কারণ ধরা পড়লে মামিকে

পিটিয়েই হয়তো পেটের কথা বের করে আশবে ইসমাইল।
এরপর আর কিছু বলার না থাকায় শুয়ে পড়ল র্যাচেল।

পরের দিনটাও একইভাবে কাটল। গাছের ছায়ায় বসে
থেকেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিল র্যাচেল। সন্ধ্যায় মামি
এসে জানাল কড়া প্রহরা থাকায় ডোরিয়োর কুঁড়ের কাছে যেতে
পারেনি সে। আর প্রাচীর শক্তিশালী করার কাজে আরো গতি
এনেছে ইসমাইল। এমনকী ওর নিজের বৌদেরও কাজে লাগিয়ে
দিয়েছে। এভাবেই কেটে গেল সেই দিনটা।

পরবর্তী দিন দিবাংগত রাতে আবার এল মামি। জানাল ক্লান্ত
প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ডোরিয়োর কুঁড়েতে পৌঁছে গেছিল সে।
দেখেছে হাত বাঁধা অবস্থায় উঠানে পায়চারি করছে সাদা সর্দার।
ব্রেডার ক্লোকর দিয়ে কথা বলে তার কাছে র্যাচেলের বার্তা পৌঁছে
দিয়েছে মামি। আগ্রহ নিয়ে র্যাচেলের বার্তা শুনেছে সে। খবর
পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে র্যাচেলকে। আর বলতে
বলেছে যে, সে নিজেও সুস্থ আছে। তবে তার মন খুব অশান্ত।
ভবিষ্যতে কী হবে কেউ জানে না। সেটা পুরোই ঈশ্বরের হাতে।
মানসিক শক্তি ধরে রাখতে বলেছে সে। তবে এরপরই প্রহরী
জেগে যাওয়ায় ওখানে আর থাকতে পারেনি মামি। চলে এসেছে।
আরেকটা খবর হচ্ছে, সেদিন বিকেলে এক ছোকরা রাখালকে
পাঠানো হয়েছিল বাইরে চরে বেড়ানো কিছু গরু জড়ো করতে।
ইবুবেসিকে কিছু খবর দিয়েছে সে। সেগুলো নিজ কানে শুনে
এসেছে মামি।

ছেলেটা বলেছে যে, সে যখন গরু জড়ো করছিল তখন এক
জুলু আসে তার কাছে। জুলু লোকটির সাজ পোশাক দেখেই
ছেলেটা আন্দাজ করেছে বিরাট বড় কোশ সর্দার সে। তবে
লোকটি একা এসেছিল। দেখে মনে হয়েছে অনেক পথ হাঁটায়
ভীষণ ক্লান্ত সে। লোকটি জিজ্ঞেস করে যে, ইনকোসাজানা আর

সাদা সর্দার ডোরিয়ো মাফুটিতে বন্দি হয়ে আছে, কথাটা সত্য কিনা। উত্তর দিতে ছেলেটি দ্বিধা করায় হুমকি দিয়ে সে বলে সত্য কথা না বললে বর্শা দিয়ে ওকে ফুটো করে হতপিণ্ড বের করে আনবে সে। লোকটি আরো বলে যে, সে রামাহ হয়ে এসেছে। নানান অদ্ভুত ঘটনা দেখে এসেছে সে। কাজেই জানে তার ধারণা সত্য। তবুও প্রশ্ন করেছে নিশ্চিত হতে। ওখানে মরণোন্মুখ এক লোক তার কাছে সবই বলে দিয়েছে। তারপর ইসমাইলকে দেবার জন্য ছেলেটিকে একটা বার্তা দিয়েছে সে। সেটা হচ্ছে:

‘ইবুবেসিকে বলবে তার সমস্ত অপকর্মের কথা আমি জানি। যদি ইনকোসাজানার একটুও ক্ষতি হয় বা সাদা সর্দার ডোরিয়োর এক ফোঁটা রক্তও ঝরে তাহলে মাফুটি টাউনের জীবিত সবাইকে ধ্বংস করে ফেলব আমি। এমনকী একটা ইঁদুরও রেহাই পাবে না। ইবুবেসিকে আরো বলবে, তার পালাবার উপায় নেই। চিৎকারকারীর শিষ্যরা ফিরে এসেছে। মাফুটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তারা।’

ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছিল, কে এই বার্তা দিয়েছে। জবাবে জুলুটি বলেছে, ‘আমি কালো ঝাড়ের শিং, আমি মহান হাতির ঝুঁড়, আমি জুলু রাজা ডিনগানের মুখ।’ এই বলে ফিরতি পথ ধরে জুলুটি। ছেলেটির মুখে যেমন শুনেছে সেই মোতাবেক লোকটির চেহারার বর্ণনা দিল আমি।

র্যাচেল বুঝল জুলুটি টাম্বুসা ছাড়া আর কেউ না।

ওদিকে ইসমাইল ওর লোকদের বলেছে, জুলুটি রাজার মুখ নয়। কারণ রাজার দূত কখনো একা আসে না। কিন্তু মাফুটিবাসীরা ওর কথা বিশ্বাস করেনি। এমিকে ওরা পড়েছে মহাবিপদে। কারণ সবাই চাইছে পালাতে। কিন্তু টাউন ছেড়ে বের হলেই কাফ্রি পাহারাদারদের হাতে গিয়ে পড়বে ওরা। আর থেকে গেলে ডিনগানের দূতের মৃত্যু হুমকি। কী করবে কেউ বুঝতে

পারছে না। উভয়সঙ্কটে পড়েছে ওরা।

তখন র্যাচেল বলল, মাফুটিবাসীরা তাহলে ওকে আর ডোরিয়াকে জুলুদের হাতে বা উপকূলের সাদা লোকদের হাতে তুলে দিচ্ছে না কেন? তাহলেই তো ওরা নিরাপদ হয়ে যায়।

জবাবে মামি বলল যে, ইবুবেসির কাছে বন্দুক আর প্রচুর গুলি আছে। ওরা কিছু করতে গেলেই নির্বিচারে গুলি করে মারবে ওদের। ওঁদিকে জুলুরা যদি দেখে ইনকোসাজানা ওদের সাথে, তাহলে জুলুরাও ওদের মারবে। আর আজ সকালে ইবুবেসি বলে পাঠিয়েছে যে, র্যাচেলকে দেয়া তার প্রস্তাবের জবাব নিতে আগামীকাল এখানে আসবে সে।

র্যাচেলের স্বস্তি চলে গেছে। যদিও নিজেকে নিয়ে ও ভাবে না। কিন্তু রিচার্ডের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে ইসমাইল। সেটাই ঝুঁকি ভয়। র্যাচেল ভাবছে, ‘ইশ্, এর মধ্যেই যদি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসত টাম্বুসা।’ কিন্তু র্যাচেল জানে, তা হবার নয়। সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে টাম্বুসার অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে যাবে। একমাত্র ভরসা ইসমাইলের নিজের লোকেরাই যদি বিদ্রোহ করে। কিন্তু তা-ও সম্ভবত হবে না। কারণ ইসমাইলকে ভীষণ ভয় করে মাফুটিবাসীরা। র্যাচেল বুঝতে পারছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই এখন ওর করার নেই। ভাগ্যে যা আছে, তা-ই হবে।

নিজের ঘরে একা বসে আছে ইসমাইল। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে সে। চিন্তিত, ভীষণ চিন্তিত। এই অস্থায়ী ওকে দেখতে পেলে একটু হয়তো স্বস্তি পেত র্যাচেল। অনিমনেই দাড়ি টেনে তুলছে সে। খানিক পানি মিশিয়ে রাম গিলছে। কিন্তু এই আগুনের মতো তরলটাও ওকে শান্তি দিতে পারছে না। ইসমাইল নিজেই ভাবছে, র্যাচেলকে পাওয়ার ইচ্ছাটা পাগলামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তারপরও, বেঁচে থাকতে ওকে পাওয়ার আশা ত্যাগ

করতে পারবে না ইসমাইল। কিন্তু কথা হচ্ছে বেশি জোর খাটাতে গেলে র্যাচেলই আত্মহত্যা করে বসতে পারে। সেটাই বড় ভয়। র্যাচেল শপথ করে বলেছে ইসমাইলের বৌ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ওর জন্য ভাল। শপথ ভাঙার মেয়ে র্যাচেল না। মেয়েটা ওকে ঘৃণাও করে। ইসমাইলেরও জানা আছে যে সেটা বিনা কারণে না। এখন একটাই উপায় আছে, সেটা হচ্ছে রিচার্ড ড্যারিয়েনের নাম করে র্যাচেলকে চাপ দেয়া। কারণ বদমাশটাকে ভালবাসে মেয়েটা। হয়তো ওর কথা বলেই র্যাচেলকে মচকানো সম্ভব।

কিন্তু এ পথেও বিরাট বাধা আছে। সেটা হচ্ছে ডিনগানের শপথ। শপথ করে রাজা বলেছে, ড্যারিয়েনের রক্ত ঝরলে ইসমাইলকে ধ্বংস করে ফেলবে রাজা। রাজাও নিজের কথার নড়চড় করে না। ওদিকে রাখাল ছোকরাটার সাথে যে জুলুর দেখা হয়েছে একই কথা শুনিয়ে গেছে সে-ও। সুতরাং ইসমাইল ভাল করেই বুঝতে পারছে যে, বাঁচতে হলে ড্যারিয়েনের রক্ত ঝরানো চলবে না। আজ হোক বা কাল, জুলু সৈন্যরা যে আসবেই তাতেও ইসমাইলের মনে কোন সন্দেহ নেই। র্যাচেলকে দিয়ে কোনভাবে জুলুদের হয়তো বুঝ দেয়ানো যাবে যে, স্বেচ্ছায় ওর স্ত্রী হয়েছে সে। কিন্তু ড্যারিয়েনের মৃত্যুর কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব না। তাই অখ্যাত এক ওঝা বুড়ির সহায়তায় “ড্যারিয়েন” সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বের করেছে সে।

গলায় নির্জলা রাম ঢেলে দিল ইসমাইল তারপর দোরগোড়ায় গিয়ে কাউকে ডাকল। ইসমাইল ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই দরজায় উদয় হলো চেহারায় হাজারখানেক ভাঁজ পড়া এক বুড়ি। চুলের সাথে ঝুলছে মাছের স্নাডার। আর গায়ে প্যাঁচানো সাপের চামড়া দিয়ে বানানো মুচা। সাজ-পোশাকের বাহারেই বোঝা যাচ্ছে মহিলাটি অবশ্যই জাদুকরী বা ওঝা।

‘ওষুধটা বানিয়েছ, মা?’ প্রশ্ন করল ইসমাইল।

‘হ্যাঁ, ইবুবেসি, বানিয়েছি। এই জিনিস কেবল আমিই বানাতে পারি। দারুণ কাজের জিনিস আমার ওষুধ। এর দাম অনেকগুলো গরু। তা, ওষুধটার জন্য কয়টা গরু যেন দেবেন বলেছিলেন, ইবুবেসি? ছয়টা গরু, তাই না?’ আত্মহের সুরে প্রশ্ন করল ওয়া মহিলাটি।

‘না, তিনটা। তবে তোমার ওষুধ যদি আমার চাহিদা মোতাবেক কাজ করে তাহলে আরো তিনটা গরু দেব। এখন বলো, জিনিসটা কাজ করে কীভাবে?’ প্রশ্ন করল ইসমাইল।

‘ওষুধটা খাওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শরীর মৃতদেহের মতো নিখর, শীতল হয়ে যাবে। এমনকী চিকিৎসকেরাও বলতে পারবে না, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। এক থেকে সর্বোচ্চ তিন দিন এই অবস্থায় কাটবে। তারপর আবার “বেঁচে” উঠবে সে। ধীরে ধীরে শক্তিও ফিরে পাবে। কিন্তু স্মৃতি ফিরবে না। পুরো এক চাঁদ (অর্থাৎ এক মাস) অতিক্রম হওয়ার আগে আগের কিছুই মনে করতে পারবে না সে। এমনকী স্মৃতি ফিরে পেলেও ওই এক মাসের কিছুই তার মনে থাকবে না। ওই সময়টায় একটা সদ্যোজাত শিশুর মতো হয়ে থাকবে সে। সবকিছুই তাকে হাতে ধরে শেখাতে হবে।’

‘মিথ্যে বলছ, মা। এমন ওষুধের কথা আমি কেন, কেউই কখনো শোনেনি।’

‘শোনেনি কারণ ওষুধটা আমি ছাড়া আর কেউ বানাতে পারে না। আর আমার আগে পারত কেবল আমার দাদি। সে-ই আমাকে শিখিয়ে গেছে। আপনি ভয় না পেলে এর কার্যকারিতার নমুনা চাক্ষুষ দেখাতে পারি। ওই যে আপনার কুকুরটা শুয়ে আছে, ডাকুন ওটাকে। দুধে মিশিয়ে ওটাকে খাওয়াচ্ছি, দেখুন।’

কুকুরটাকে ডাক দিতে দ্বিধা করছে ইসমাইল, কারণ ওটাকে

খুব পছন্দ করে সে। ভয় পাচ্ছে ওটা যদি আসলেই মরে যায়। কিন্তু শেষে ডাকল ও। কুকুরটা এসে ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। বুড়ি ওঝা দুধে একটু ওষুধ মিশিয়ে খেতে দিল কুকুরটাকে। কিন্তু দুধের গন্ধ ঠুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল কুকুরটা। বুড়ি তখন ইসমাইলকে বলল, ‘কুকুরটা আমাকে দেখতে পারে না। দু’দিন আগে কামড় দিয়েছে আমাকে। ও আমার হাত থেকে খাবে না। আপনি দিন, খেয়ে নেবে।’

তখন কুকুরটার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দুধটা সামনে দিল ইসমাইল। নির্দিধায় পুরো দুধটুকু খেয়ে ফেলল কুকুরটা।

চকচক করছে বুড়ি ওঝার চোখ জোড়া। খুশিতে ডগমগ করতে করতে সে বলল, ‘শয়তান জানোয়ার, আর কখনো ওটা আমাকে কামড়াতে আসবে না। লম্বা সময়ের জন্য আমাকে ভুলে যাবি তুই। দেখুন, ইবুবেসি, দেখুন।’

মহিলাটি কথাটা বলতে বলতেই কুঁই করে আর্তনাদ করে উঠল জানোয়ারটা। দু’কদম এগিয়ে এসে ইসমাইলের হাত চেটে দিতে গেল কিন্তু পারল না, মাটিতে পড়ে গেল। এক গড়ান দিয়েই নিখর হয়ে গেল কুকুরটা। একদম মৃতবৎ পড়ে রইল মাটিতে।

রেগে গেছে ইসমাইল। ‘ডাইনি বুড়ি, কুকুরটাকে পছন্দ করতাম আমি, ওটাকে মেরে ফেললে?’

‘না, ইবুবেসি, মারিনি। কিন্তু যাকে আপনি সত্যিই ভাষাধীন তাকে কেন এই ওষুধ দিতে চান? যাক, ভয় পাবেন না, কুকুরটা মরেনি। খুব সামান্য ওষুধ দিয়েছি। কাল সকালবেলাই হেঁটে চলে বেড়াবে এটা। তবে কাউকে চিনবে না। কিন্তু এই ওষুধটা কার ওপর প্রয়োগ করবেন, ইবুবেসি? লেডি জুনির ওপর? তার ওপর কিন্তু ওষুধটা কাজ না-ও করতে পারে। কারণ খুবই শক্তিশালী সে। তার ক্ষতি করা সম্ভব না।’

‘ধুর, বোকা বুড়ি, তুমি কি ভাবছ যে, ইনকোসাজানার ওপর এসব কৌশল খাটাব আমি?’

‘তাকে তো আপনি বিয়ে করতে চান, তাই না? কিন্তু আমার মনে হয় এতে লেডি জুলার সম্মতি নেই। তার মানে, ওষুধটা তাহলে সাদা সর্দার ডোরিয়োর জন্য? যাক, ওসব আপনার মাথা ব্যথা। তবে ওষুধটার দাম হিসেবে আমাকে ছয়টা গরু দেবেন বলেছেন, ইবুবেসি। ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অপরাধে মরতে বসেছিলাম একবার, তখন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। তাই আপনার প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে দুটো কথা বলছি, শুনুন। সর্দার ডোরিয়োর ওপর ওষুধটা প্রয়োগ করবেন না।’

‘কেন নয়, বুড়ি? ওষুধটা কি তাকে মেরে ফেলবে?’

‘না, যেমনটা বলেছি ঠিক তেমনই কাজ করবে আমার ওষুধ। কিন্তু আপনাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি। স্বপ্নে ইনকোসাজানা আর এই সর্দার ডোরিয়োও ছিল। দেখেছি ওরা খুব খারাপভাবে আপনার মৃত্যু ডেকে এনেছে। একটু বুদ্ধি খাটান, ইবুবেসি। ইনকোসাজানা আপনার জন্য না। ডোরিয়ো আর লেডি জুলা, দু’জনকেই মুক্ত করে দিন।’

‘পারব না, ওঝার বেটি। পাথরের সামনে পড়ে নদীর গতি কি রুদ্ধ হয়? সাগরের টানে ছুটে আসা স্রোত কি উজানের দিকে ফিরতে পারে? পারে না। আমার অবস্থাও ওই স্রোতের মতো। আর সাগরের মতো আমাকে ডাকছে জুলা। এই ডাক উপেক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব না। ওর জন্য যদি মরতেও হয়, তা-ই সই। র্যাচেলকে ছাড়া বুড়ো হওয়ার চেয়ে ওকে পিঠে গিয়ে মরে যাওয়াও ভাল,’ বলল ইসমাইল।

‘বুঝেছি। আপনার মতো মানুষ আগেও দেখেছি। নারী, পুরুষ দুই দলই। কোন না কোন অন্যায়ের শাস্তি দিতে তাদের ভেতর খারাপ আত্মা ঢুকিয়ে দেয়া হয়। স্বয়ং ইনকোসাজানা

অথবা যেসব শক্তি তাকে পাহারা দেয়, তারাই আপনার ভেতর অমন একটা খারাপ আত্মা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন আমি যত যা-ই বলি, যতই সতর্ক করি, কোন কাজ হবে না। এই পথেই আপনাকে হাঁটতে হবে। তবে ওপারে যখন আমাদের দেখা হবে, বলবেন না যেন আগে থেকে আপনাকে সাবধান করিনি আমি। হ্যাঁ, ইবুবেসি, আমার মন বলছে খুব শীঘ্রিই ওপারে যাব আমরা। দিন, আমার গরুগুলো বুঝিয়ে দিন। যদিও আমার মন বলছে গরুগুলোকে আমি দোহন করতে পারব না, জুলুরাই ওগুলোর দুধ দোহন করবে। হ্যাঁ, বাতাসে জুলুদের গন্ধ পাচ্ছি আমি,’ কোঁচকানো নাকটা বাতাসে উঁচু করে হাউণ্ডের মতো গন্ধ শুঁকে বলল বুড়ি ওঝা। তারপর বলল, ‘ইনকোসাজানা আর ডোরিয়ো একে অপরের অংশ। তাই তাদের ছেড়ে দিলেই ভাল করতেন ইবুবেসি। আর হ্যাঁ, আপনার কুকুরটাও সর্কালে হাঁটবে। তবে কাউকে চিনবে না। আপনাকেও না। আশা করি আমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া গরুগুলো বয়স্ক হবে না, দুটোর বেশি বাচ্চা ওগুলোর হয়নি।

‘আর, ইবুবেসি, ওষুধটার কোন রঙ বা গন্ধ নেই। তাই দুধ, পানি বা যে কোন কিছুতেই মেশাতে পারবেন। বিদায়, ইবুবেসি। শুভরাত্রি,’ বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল বুড়ি।

মহিলাটি চলে যেতেই আবার রাম ঢেলে গ্লাস ভরে নিল ইসমাইল। গলায় ঢেলে দিল বেশ খানিকটা। ঘরে একাকী বসে আছে ইসমাইল। কুকুরটাও পড়ে আছে মড়ার মতো। মরেই গেছে হয়তো। ওটার মাথায় চাটি দিল একবার, কিন্তু কুকুরটা নড়ল না। একটা পা তুলল ও, সেটাও ঝপ করে পড়ে গেল। দৃশ্যটা ইসমাইলের মনের ওপর ভীষণ চাপ দিচ্ছে। ওরও এখন মনে হচ্ছে দিন কয়েকের মধ্যেই দুনিয়ার মায়া ছাড়বে ও। নিজের পাপগুলোও ইসমাইলের খুব ভাল করেই মনে আছে। একে একে

সেগুলো ভেসে উঠল ওর মনের চোখে। ও জানে কৃতকর্মের ফলের জন্য ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো কতটা কঠিন হবে ওর জন্য। ডাভ পরিবারের কথাই ধরা যাক। পবিত্র মানুষ ছিল তারা। বিশ্বাস করত ঈশ্বর আর পরকালে। নিজেদের সুখের কথা তারা কোন দিন ভাবেনি। আজীবন অন্যদের শান্তির জন্য কাজ করে গেছে। সেই পবিত্র মানুষ দু'জনেরই রক্ত লেগে আছে ওর হাতে। ওদের সাথে দেখা হওয়াটাও ইসমাইলের জন্য সুখকর হবে না। উঠানে বসে র্যাচেল বলেছিল ইসমাইলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ইসমাইলেরও এখন মনে হচ্ছে, এই ঘরেই আছে তারা। হঠাৎই মনে হলো, ওর সামনে দিয়ে যেন ছুটে গেল একটা ভৌতিক কাঠামো। অবশ্যই মানবাকৃতির কাঠামো সেটি। এবং তার কপালে যেন কেরি আঁকা দেখেছে ও। আর ঝুঁকে যখন কুকুরটাকে দেখতে গেল, মনে হলো, একটা মহিলা যেন ওর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। দৃশ্যটা এতই স্পষ্ট যে, তার নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটটাও দেখেছে ইসমাইল। আর সহ্য হচ্ছে না। ইসমাইলের মনে চাইল তখনই ছুটে বের হয়ে যেতে। সোজা র্যাচেলের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, র্যাচেল কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এই গভীর রাতে র্যাচেলের ঘরে গেলে হয় ওকে খুন করে ফেলবে র্যাচেল, নয়তো নিজেই আত্মহত্যা করে বসবে। কিন্তু ঘরেও থাকতে পারছে না ইসমাইল। অসহ্য লাগছে। তাই সিদ্ধান্ত নিল যে, কথা অনুযায়ী পরদিন সকালের জন্যই অপেক্ষা করবে ইসমাইল। এখন যাবে দেয়াল ও প্রহরা পরীক্ষা করতে। কোন প্রহরী ঘুমিয়ে পড়লে কপালে খারাবী আছে ওর।

সকাল হয়েছে। দেয়াল ঘেরা প্রাঙ্গণে বসে আছে র্যাচেল। ওর মনে আছে আজই ওর সিদ্ধান্ত জানতে আসবে ইসমাইল। এতদিন পর্যন্ত র্যাচেল ভেবেছে কোন একটা উপায় বের হবেই। জুলুরা

চলে আসতে পারে, মাফুটির লোকজনেরা ইসমাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে, এমনকী ইসমাইলও তার মন পরিবর্তন করতে পারে। বা হয়তো অলৌকিক কিছুই ঘটবে, মুক্তি পাবে ও। কিন্তু মামির আনা খবর শুনে সব আশা উবে গেছে। টাউনের কিছু সর্দারের সাথে কথা বলে মামি জেনেছে, খুবই সতর্ক অবস্থায় আছে তারা। কিন্তু কেউ কিছু করার সাহস পাচ্ছে না। কারণ উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছে ইসমাইল। ওর মানসিক অবস্থা এখন যেমন, তাতে কেউ এমনকী মুখ খুললেও তাকে মেরে ফেলবে সে। ওদিকে ইসমাইলকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যদি মাফুটি ছেড়ে বের হয়ও, জুলুদের হাতে মারা সে পড়বেই। কারণ মাফুটির বাসিন্দাদের হাতেই বন্দি হয়ে আছে ইনকোসাজানা। তবে স্কাউটরা খবর এনেছে, এখন পর্যন্ত আশপাশে কোথাও জুলুদের দেখা পাওয়া যায়নি। এদিকে ইসমাইলও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মামির মাধ্যমেই খবর পাঠিয়েছে, র্যাচেলের জবাব জানতে সকালেই আসবে সে। সাথে ড্যারিয়েনকেও নিয়ে আসবে।

র্যাচেল কিছুই ভাবতে পারছে না। কেবল প্রার্থনা করছে ইসমাইল যেন না আসে। কিন্তু ও নিজেও জানে, তা হবার নয়। সময় চলে এসেছে। দেয়ালের বাইরে থেকে ভেসে এল অনেকগুলো কণ্ঠের হৈচৈয়ের আওয়াজ। সাথে একটা কুকুরের হিংস্র ডাক। এদের মধ্যে ইসমাইলের গলাও শুনতে পেল র্যাচেল। সাথে-সাথে ওর হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর জ্বলছে। গেল এবং পরমুহূর্তেই শুরু হলো তার ঘোড়দৌড়।

শুনতে পেল ইসমাইল কাউকে বলছে, ‘ধরো, ধরে বেঁধে ফেলো কুকুরটাকে। বদমাশটা কাউকেই চিনছে না।’ কুকুরের ঘেউঘেউ কমে গেল। অর্থাৎ ওটাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এর পরই খুলে গেল পাথরের দেয়ালের ফটক। প্রথমে

ভেতরে ঢুকল ইসমাইল। ওর চেহারা য ফুটে আছে রাত্রি জাগরণের ছাপ। চোখের চারদিক কালো হয়ে আছে। হাতে ডাবল ব্যারেলড্ বন্দুক। চেহারা কাঠিন্য ফোটাতে চাইলেও হাতের কম্পন লুকাতে পারছে না সে। ইসমাইলের পেছনে ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল রিচার্ড। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পায়েও চামড়ার রশি বাঁধা। ফলে ধীর কদমে হাঁটতে পারবে কেবল। ছোট্ট প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু চারজন বর্শাধারী লোক পাহারা দিচ্ছে ওকে। এক পলকে রিচার্ডকে দেখল র্যাচেল। ওর চেহারা ক্লান্তি থাকলেও ভয়ের ছাপ নেই। ইসমাইলের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল, ‘তুমি ঠিক আছ, রিচার্ড?’

‘হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ, র্যাচেল?’

‘শরীর ভাল। কিন্তু মন খুব খারাপ।’

ধমক্ উঠল ইসমাইল। বলল, কথা না থামালে রিচার্ডের কপালে খারাবী আছে। তারপর হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে নিজেই বাউ করল র্যাচেলকে। ইংরেজিতে বলল, ‘আমার কথা রেখেছি, র্যাচেল। তিন দিন সময় দিয়েছিলাম, তিন দিন পরেই এসেছি। তোমার সিদ্ধান্ত জানাও।’

‘কী সিদ্ধান্ত জানাব?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘ভুলে গেছ? তোমার স্মৃতিশক্তি তো খুবই দুর্বল দেখছি। তবে, ভুল করার বিলাসিতা আমার সইবে না। আর তোমার বন্ধুও হয়তো সবকিছু সরাসরি জানাটাই পছন্দ করবে। সিদ্ধান্ত জানাবে যে, আজ আমাকে তুমি বিয়ে করবে কিনা। আমাকে বিয়ে না করলে তোমার এই বন্ধুটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। উপরন্তু পাহারাদারকে মেরে পালাতে চেয়েছিল সে। কাজেই ওকে মেরে দখল করব তোমাকে।’

অবাস্তব অভিযোগ শুনে রাগে কাঁপতে শুরু করল রিচার্ড। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘কাপুরুষ, শয়তান, আমার হাতটা শুধু

যদি খোলা থাকত...’

‘তোমার হাত, পা দুটোই বাঁধা। কাজেই তড়পিয়ো না। লেডি কী বলে সেটা শোনো,’ বলল ইসমাইল।

প্রায় আত্ননাদ করে উঠল র্যাচেল, ‘ওহ, রিচার্ড, তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। বলতে পারো এখন কী করব আমি?’

‘বলার আছেটা কী? কিন্তু এ কেমন প্রশ্ন করছ? এখানে কেবল আমার নয় তোমার জীবনের প্রশ্নও জড়িত। নিজের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। বদমাশটা আমাকে মেরে ফেললেও তুমি নত হয়ো না। আর আমার জন্য যদি খুব বেশি মায়া লাগে তো আমার পথ ধরে তুমিও ওপারে চলে এসো। জীবন নদীর ওপারেই আবার মিলিত হব আমরা।’

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল র্যাচেল। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, ‘হ্যাঁ, তোমার জন্য আমার মায়া আছে রিচার্ড। এমনকী তোমার নিজের চেয়েও অনেক অনেক বেশি। শুনুন, ইসমাইল, রিচার্ড ড্যারিয়েনের কাছে আমি শপথ করেছি, যা কখনো ভাঙা সম্ভব না। নিজের প্রাণের জন্য আমাকে বলি দিতে চায় না রিচার্ড। তেমনি আমিও ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। আমার বাবা-মায়ের মতো ওকেও মেরে ফেলুন। তারপর ওর মৃত্যুর খবর পেলে আমিও ওদের সাথে যোগ দেব।’

প্রচণ্ড রাগে ইসমাইলের চেহারা সাদা হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ও বলল, ‘বেশ, তোমার কথাই থাকুক ট্রাইল। রিচার্ড মরবে। আমি যদি তোমাকে না পাই, আর কাউকে পেতে দেব না। মরে গিয়ে দেখ পরকালে ওকে পাও কিনা। কোন প্রার্থনা ট্রার্থনা করার থাকলে করে নাও, ড্যারিয়েন,’ বলতে বলতে বন্দুক কক করল ইসমাইল।

এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা চললেও এবার জুলু ভাষায় র্যাচেল বলল, ‘মাফুটির লোকেরা, আমার ও রাজা ডিনগানের নিরাপত্তার

ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া সাদা সর্দার ডোরিয়োকঁ খুন করতে যাচ্ছে ইবুবেসি। যদি তার রক্ত ঝরে, তো মনে রেখো, আজ হোক বা কাল, তোমাদের রক্তও ঝরবে। ঝরবে তোমাদের স্ত্রী সন্তানদের রক্তও। কারণ সর্দারের অপরাধ মানে তার সমস্ত অনুসারীদের অপরাধ।’

এবার তারা ইসমাইলকে বাধা দিতে মুখ খুলল। জবাবে কথা খরচ না করে রিচার্ডের দিকে বন্দুক তুলল ইসমাইল। র্যাচেলের মনে হলো সময় স্থির হয়ে গেছে। মুহূর্তটাকে মনে হলো বছরের সমান। দম বন্দ করে রিচার্ডের গায়ে গুলি লাগার অপেক্ষায় রইল ও। কিন্তু তখনি হস্তক্ষেপ করল কালোদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী লোকটি। ঠেলা দিয়ে বন্দুকের ব্যারেলটাকে উর্ধ্বমুখী করে দিল সৈ। ট্রিগার টানার ইচ্ছা ইসমাইলের থাকুক বা না থাকুক, ধাক্কা লেগে ট্রিগারে চাপ পড়েই গেল। বুম করে বিস্ফোরিত হলো এক ব্যারেলের গুলি।

ইসমাইলকে উপহাস করে রিচার্ড বলল, ‘গুলিটা বেশি উপর দিয়ে চলে গেছে। অন্য ব্যারেল ট্রাই করো।’

ইসমাইল হয়তো গুলি করত। কিন্তু পারল না কেবল চার কালো প্রহরীর জন্য। ওর আর রিচার্ডের মধ্যে এসে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়াল তারা। বলল যে, সাদা সর্দারের রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের ওপর ইনকোসাজানার অভিশাপ ডেকে আনতে দেবে না তারা।

অবস্থাদৃষ্টে ইসমাইল সিদ্ধান্ত নিল, এই যাত্রা বন্দুক সারিয়ে নেয়াই ভাল। বলল, ‘তা-ই হোক। আপাতত দু’জনেই মুক্তি পাচ্ছ। তবে চিরতরে নয়। লোকটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আর, র্যাচেল, তিন ঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোমায়। তিন ঘণ্টা পর আমি আসবে। তিন ঘণ্টার মধ্যেই ওকে দিয়ে যদি ইতিবাচক খবর না পাঠাও তাহলে ড্যারিয়েনের মৃতদেহ দেখবে। তারপর বাকি সব দেখব আমি।’

কাতরে উঠল রিচার্ড, ‘র্যাচেল, শপথ করো, অমন কোন খবর তুমি পাঠাবে না। শপথ করো, র্যাচেল।’

রেগে বোম হয়ে থাকা ইসমাইল ছুটে গেল রিচার্ডকে ঘুষি মারতে। কিন্তু রিচার্ড আগেই ওকে এগুতে দেখে ফেলেছে। হাত বাঁধা থাকায় সবচেয়ে সহজ কাজটাই করল রিচার্ড। মাথা নামিয়ে নিল ও। ঘুষির তোড়ে ভারসাম্য হারিয়ে ইসমাইল যখন ওর যথেষ্ট কাছে চলে এল সর্বশক্তিতে মাথা দিয়েই আঘাত করল রিচার্ড। ইসমাইলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি রাখে রিচার্ড। কাজেই ওর ধাক্কা ইসমাইলের সামলাতে পারার কথা না। পারলও না সে। আছড়ে পড়ল মাটিতে। দম আঁকড়ে এল ওর।

রিচার্ড বলে চলেছে, ‘শপথ করো, র্যাচেল। নয়তো জীবিত বা মৃত, কোন অবস্থায়ই তোমাকে ক্ষমা করব না আমি।’

মৃদু কণ্ঠে র্যাচেল বলল, ‘শপথ করলাম।’

কষ্ট করে দু’পা এগিয়ে গেল রিচার্ড। চুমু খেল র্যাচেলের কপালে। র্যাচেলও ওকে পাল্টা চুমু খেল। আর কোন কথা হলো না। এটাই ওদের বিদায় সম্ভাষণ।

মাটি থেকে উঠতে ইসমাইলকে সাহায্য করল দু’জন কাফ্রি। আর বাকি দু’জন পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রিচার্ডকে। রিচার্ড ওদের বাধা দিল না। ফটকে দাঁড়িয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল কেবল। চোখাচোখি হলো দু’জনের। একা পড়ে রইল র্যাচেল।

BanglaBook.org

সতেরো

কিছুক্ষণ পরে এল মামি। বলল, ইবুবেসি তাকে বলে পাঠিয়েছে, ইনকোসাজানার নাকি দূতের প্রয়োজন হবে। তাই এসেছে সে।

র্যাচেল ওকে বলল ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে। কিছু করতে হলে পড়বে জানাবে। কিন্তু কিছুই করল না র্যাচেল। গাছতলায় নিশ্চল ধসে রইল। দেখতে দেখতে চলে গেল তিন ঘণ্টা সময়। ফটকের বোল্ট সরানোর শব্দ হলো। কে এসেছে, দেখতে এগিয়ে গেল মামি। ফিরে এসে বলল, ফটকে ইবুবেসি দাঁড়িয়ে আছে। জানতে চাইছে ইনকোসাজানার কী বলার আছে।

শপথের কথা মনে করে র্যাচেল বলল, ‘কিছুই বলার নেই।’ শুনতে পেল ফটক বন্ধ হয়ে গেল, বাইরে থেকে আবার বোল্ট লাগিয়ে দেয়া হলো।

সারা এলাকা জুড়ে নেমে এল সুগভীর নীরবতা। বাইরে থেকেও কোন আওয়াজ আসছে না। মানুষের তো না-ই, কোন পশুরও না। র্যাচেলের মনে হচ্ছে নিজের ডানা দিয়ে পুরো এলাকা ঢেকে রেখেছে মৃত্যুর ফেরেশতা। রিচার্ডের কী হলো এই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে র্যাচেল। ভয় পাচ্ছে ও, ভীষণ ভয়। ভয়ে পুরো শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর। ওদিকে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। র্যাচেলের মনের মতো, ঘোলাটে হয়ে গেছে আকাশটাও। কয়েক মুহূর্ত পর মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বের হয়ে এল সন্ধ্যার

লালচে ডুবন্ত সূর্য। সেই লালিমায় মনে হতে লাগল বুঝি আগুন ধরে গেছে সবকিছুতে। র্যাচেলের মনে হলো, এটাই ইঙ্গিত। আসলেই আগুন লাগবে। এবং সেটা ঘটবে খুবই শীঘ্রি। ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সবকিছু। র্যাচেল এসব চিন্তা করছে, ঠিক তখনই খুলে গেল ফটক। দেখা গেল ঢাল দিয়ে তৈরি একটা খাটিয়ায় করে কাউকে বা কিছু একটা বয়ে নিয়ে এসেছে আটজন নেটিভ। তাকে বা জিনিসটাকে চামড়ার কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। খাটিয়াটা র্যাচেলের সামনে নামিয়ে রাখা হলো। একজন নেটিভ এগিয়ে এসে কম্বল সরাল। প্রকাশ পেল রিচার্ড ড্যারিয়েনের মুখ।

লোকটি অপরাধী কণ্ঠে বলল, ‘একে দেখানোর জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছে ইবুবেসি। বোঝাতে চেয়েছে যে কথা দিলে সেটা রাখে সে। আমাদের বলে দিয়েছে, ‘পরে আপনার সাথে দেখা করতে আসবে ইবুবেসি।’

রিচার্ডকে মৃত মানুষের মতোই দেখাচ্ছে। দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর। হৃৎস্পন্দন নেই।

নেটিভ লোকটি বলল, ‘সর্দারের গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই, ইনকোসাজানা।’

‘কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? ও মরে যাবে আর আমি ওর আত্মাকে যেতে দেখব না- তা হতে পারে না,’ বলল র্যাচেল।

‘উনি খুব পিপাসার্ত ছিলেন। পানি খেয়েই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন,’ জবাব দিল এতোক্ষণ ধরে কথা বলতে থাকা নেটিভ লোকটি।

‘আচ্ছা, তা-ই! বিষ দিয়ে খুন করেছে। কিন্তু আমার কাছে তো বিষ নেই। দেখে যাও, মামি, বিষ খাইয়ে ডোরিয়াকে খুন করেছে ইবুবেসি।’

মামি ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল, বেরিয়ে এসেই মরা কান্না জুড়ে দিল সে, ‘মাফুটির দিন শেষ। শেষ এখানকার বাকি সবার

দিন। প্রতিশোধ আসছে! স্বর্গের প্রতিশোধ! লাল হয়ে যাবে, সব রক্তে লাল হয়ে যাবে। মাফুটিবাসীরা, নিষ্পাপের রক্তের দাগ লেগেছে তোমাদের হাতে। ইনকোসাজানার অভিশাপ পড়েছে, বর্শা নিয়ে আসছে জুলুরা। জংলী জানোয়ার, নিশাচর ইবুবেসি, তোর ওপর শোধ নেবে সবাই। তোর কারণে আমরাও মরব। পালাও, মাফুটিবাসীরা, পালাও। পারলে এই মৃতদেহটিও নিয়ে যাও। নয়তো তোমাদের কৃতকর্মের সাক্ষী হয়ে রইবে সে। এমন জায়গায় একে কবর দাও, যেখানে কোন মানুষের নজর না যায়। আঁধার থাকতেই পালাও। আমিও পালাব, ইনকোসাজানা, এখনি পালিয়ে যাব এখান থেকে,’ বলতে বলতেই খোলা ফটক দিয়ে বাইরে চলে গেল মামি।

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রায়। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ হচ্ছে, নিনাদের সুরে পরস্পরকে ধমক দিচ্ছে মেঘপুঞ্জ।

রিচার্ডকে বহনকারী এক নেটিভ বলল, ‘একে ফেলেই পালাই, চলো।’

‘না, মামি ঠিকই বলেছে।’ একে ফেলে রাখা যাবে না। তাহলে মৃতদেহটা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়ে যাবে,’ বলল দ্বিতীয় একজন।

তৃতীয় আরেকজন বলল, ‘মনে আছে, সেই জুলু কী বলেছিল? বলেছিল, এই সাদা সর্দারের কোন ক্ষতি হলে আমাদের কাউকে জীবিত ছাড়বে না। এমনকী মাফুটির একটা ইদুরও জীবিত থাকবে না। লাশটা নিয়ে চলো লুকিয়ে ফেলি কোথাও। পথে ইবুবেসিকে পেলে ওকে বর্শা মারব। না পেলে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব। স্বর্গই যা করার করবে। স্বর্গই প্রতিশোধ নেবে তার ওপর।’

রিচার্ডকে তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল লোকগুলো। অবশ্য ফটকের দরজায় বাইরে থেকে খিল লাগাতে ভুলল না। অন্ধকার

নেমে এল ধরার বুকে ।

র্যাচেলের মুখ থেকে বের হলো, 'এবার সত্যিই একা হয়ে গেছি আমি।' খুব শান্তস্বরে বলা কথাগুলো ওর নিজের কানেই বজ্রধ্বনির মতো বাজতে লাগল। ঠিক তখন কিছু একটা হয়ে গেল র্যাচেলের মাথার ভেতর! বদলে গেল সব। সমস্ত ভয়-ডর ছেড়ে গেল। হঠাৎ যেন নিজের ভেতর অন্যরকম একটা শক্তি অনুভব করল ও। হেসে উঠল হা হা করে। হাসতেই থাকল। হাসির আওয়াজে যেন ভরে উঠল আকাশ বাতাস। খুব ক্ষুধা পেল ওর। ঘরে টেবিলের ওপর খাবার রাখা ছিল। হামলে পড়ল ওগুলোর ওপর। বুভুক্ষুর মতো খেয়ে ফেলল সব, পানি খেল। নিজেকেই শোনাল, 'মারা যাওয়ার আগে রিচার্ডও পানি খেয়েছে। আমিও পানি খাব তারপর একা হয়ে যাব চিরতরে!'

খাওয়া শেষ। উঠানের দৈর্ঘ্য জুড়ে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুনিয়ে গান ধরল র্যাচেল। ওর মনে হলো ওর সাথে যেন গাইছে সমস্ত মৃত আত্মা। কিন্তু ওর চেয়ে অনেক অদ্ভুত তাদের সুর! সেই সুর এমনকী র্যাচেলকেও স্তম্ভিত করে দিল। আকাশের দিকে তাকাল র্যাচেল। ওর মনে হলো মেঘের মধ্যে যেন ভেসে উঠেছে ইবুবেসির মুখ। বিজলীর ঝলককে মনে হলো যেন শয়তানটার লকলকে জিভ। লোভের গনগনে আগুন দিয়ে 'চেটে দিচ্ছে সব কিছুকে!

উঁচু পাথুরে দেয়াল ঘেরা উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশটিকে বেশি একটা দেখতে পাচ্ছে না র্যাচেল। ভাবল ক্রালের ছাদে উঠলেই আরো ভালভাবে সব দেখা যাবে। এতটুকু পরিশ্রম ছাড়াই ক্রালের ছাদে উঠে পড়ল ও। এক হাতে বর্শা আর অপর হাতে ক্রালের গায়ে বসানো ধাতুর দণ্ডটি ধরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল র্যাচেল। দেখল এদিকেই আসছে ইবুবেসি। আসুক, এখনই হবে ওদের শেষ কথা। তারপর... তারপর মরবে র্যাচেল। মরবে?

পরমুহূর্তেই নিজেকে নিজে বলল, 'না, আত্মহত্যা করব না। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখব কী ঘটে ঘণ্য নিশাচর ইসমাইলের ভাগ্যে।'

ইসমাইলের ভাগ্যে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবে। সেটা র্যাচেলের জানাও ছিল। কিন্তু এখন শত চেষ্টাতেও মনে করতে পারছে না।

ছাদেই দাঁড়িয়ে আছে র্যাচেল। ঘন আর ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। অন্ধকারও জাঁকিয়ে বসেছে। এমনই অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন জীবিত প্রাণীর মতো সেটা চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এরই মধ্যে র্যাচেলের মনে হলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। পূর্ব থেকে আর পশ্চিম থেকে আসছে আওয়াজটা। এরপর আরেকটা শব্দ এল র্যাচেলের কানে। ফটক খোলার শব্দ। খুবই মৃদু। অতি সন্তর্পণে উঠানে প্রবেশ করল কেউ। র্যাচেলের ইন্দ্রিয় এখন যে কোন নেটিভের চেয়েও অনেক বেশি সজাগ হয়ে আছে। পদশব্দেই ও বুঝতে পারল নিঃশব্দ পদচারী মানুষটি নিশাচর ইবুবেসি ছাড়া আর কেউ না। হা হা করে হেসে উঠতে মন চাইছে ওর। কারণ নিশাচর লোকটি ওকে খুঁজছে ঘরে, উঠানে। অথচ র্যাচেল দাঁড়িয়ে আছে ওর মাথার ওপর। তবে নীরবই রইল ও।

উঠানময় হাঁটছে ইবুবেসি। এগিয়ে গেল গাছের নীচের বেঞ্চের কাছে। মৃদু স্পর্শ করল টুলটায়। তারপর নেকড়ে মতো নীরবে ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু সেখানেও র্যাচেল নেই। কুপিতে আগুন দিল ইসমাইল। কিন্তু ঘর শূন্য। আলোটা জ্বলে রেখেই ঘর থেকে বের হয়ে এল সে। মৃদু কণ্ঠে ডাক দিল, 'র্যাচেল, কোথায় তুমি?' কোন উত্তর এল না। নিজেকেই তখন ও শোনাতে লাগল, 'র্যাচেল কি চলে গেল? কাপুরুষ জংলী গাধার দলের কয়েকটা চলে গেছে, জানি। ও-ও কি তবে ওদের সাথে চলে

গেল? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? না সম্ভব না। কড়া প্রহরা আছে চারদিকে। তাহলে কি ও আসলেই আত্মা? তাই আত্মার মতোই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে? আশা করি, ও আত্মা না। আত্মা হলে শয়নে স্বপনে আমাকে তাড়া করে ফিরবে। নাহ, আমাকে জাদু করে ফেলেছে মেয়েটা। নইলে আমাকে এভাবে ঘৃণা করা সত্ত্বেও আমার সবকিছু কেন ওর জন্য বাজী ধরতে যাব? এ নির্ঘাত শয়তানের কাজ। প্রথম থেকেই তা-ই ছিল।’ নিজেকে গুনিয়ে বকবক করতেই থাকল ইসমাইল।

শেষে আর সহ্য করতে পারল না র্যাচেল। কারণ ইসমাইলের সশব্দ চিন্তা চরম উদ্ভটেরও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ছাদে থেকেই ও বলে উঠল, ‘ঠিকই বলেছেন, নিশাচর ইবুবেসি। প্রথম থেকেই আপনার পেছনে আছে শয়তান। শয়তানের পথেই চলেছেন আপনি। তবে পথের শেষটা অবশ্য দূরে নয়। জাহান্নামের দরজার সামনে গিয়েই পথটা শেষ হয়েছে।’

ভৌতিক কণ্ঠের আওয়াজে চমকে উঠল ইবুবেসি। খাবি খেয়ে উঠল সে। চমকে গিয়ে পড়ে গেল বেড়ার ওপর। ‘কে, কে কথা বলে? কোথায় তুমি?’ বাতাসের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ইবুবেসি। কিন্তু কোন উত্তর নেই। তখন ও নিজেই আবার বলল, ‘কণ্ঠটা র্যাচেলের মতো শোনালা। মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে ও। করুক, তা-ও ভাল। বদমাশ ড্যারিয়েনের কাছে যাওয়ার চেয়ে ওর আত্মহত্যা করাও আমার জন্য অনেক ভাল। কিন্তু কথা হচ্ছে, মরে গিয়ে আমার সাথে কথা বলে কী করে?’ কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চলল ইসমাইল। সম্ভবত কুপিটা নিভিয়ে দিতে ঠিক তখনই ঝলসে উঠল বজ্রবিদ্যুৎ। কয়েক সেকেণ্ড ধরে ঝিল সেটার উজ্জ্বল ঝলক। সেই আলোয় ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা র্যাচেলের চোখে ধরা পড়ল, মাফুটি ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে কতগুলো কালো কালো বিন্দু। সন্দেহ নেই, এরা মাফুটির অধিবাসী ও তাদের গবাদি পশু।

পালাচ্ছে তারা। এরপরই দেখল মাফুটির প্রান্ত আর যে বেসিনটায় মাফুটির অবস্থান তার মুখের কাছে ও আশপাশে সাদা অনেকগুলো বিন্দু। নিঃসন্দেহে এরা হচ্ছে জুলু সৈন্য। সাদা বিন্দুগুলো হলো তাদের সাদা রঙ করা ঢাল।

একই সময় বজ্রালোকে র্যাচেলকে দেখে ফেলেছে ইসমাইলও। তবে বাইরের কিছুই তার জানার সুযোগ হয়নি। তাই বলে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা র্যাচেলের চোখে আগুন দেখতেও ভুল হয়নি ওর। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ইসমাইল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল ও। পরে যখন বুঝতে পারল যে, আত্মা নয়, রক্ত মাংসের র্যাচেলই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তখন খানিকটা সাহস ফিরে পেল। বলল, ‘ওখানে দাঁড়িয়ে আছ যে, র্যাচেল? নীচে নেমে এসো, কথা বলি।’

কিন্তু কোন জবাব দিল না র্যাচেল। দেখতে চাইছে ইসমাইল কী করছে। বেশ লম্বা সময় ধরে পুরো ক্রালটাকে ঘিরে হাঁটতে হাঁটতে বকবক করে চলল ইসমাইল। কিন্তু যখন দেখল র্যাচেল নামছেই না, তখন বেপরোয়া হয়ে ছাদে উঠতে গেল সে। অবশ্য ছাদে ওঠাটা তার জন্য র্যাচেলের মতো অত সহজ হলো না। মাঝপথে এসে হাত ছুটে গেল তার। ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ইসমাইল। তবে এতে দমবার পাত্র নয় সে। খড়ের দেয়ালে খামচাখামচি করে ছাদের কাছে উঠেই পড়ল। কিন্তু ছাদের প্রান্তে এসে দেখল ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে র্যাচেলের বর্শার চোখা ফলা। ফলে বাধ্য হয়ে ছাদের কড়ি-বর্গা ধরে ব্যাঙের মতো ওভাবেই ঝুলে রইল সে। ওপরে উঠতে পারছে না বর্শার ভয়ে, আর নীচে নামছে না ওপরে ওঠার পরিশ্রমটা মাটি হবে বলে।

র্যাচেলকে বলল, ‘র্যাচেল, নীচে নেমে এসো। যা করেছি সব তোমার জন্য করেছি, তোমাকে পাওয়ার জন্য করেছি। নেমে

এসো, বলো, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তুমি।’

ইসমাইলের কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠল র্যাচেল। সম্বোধন আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে বলল, ‘রিচার্ড ড্যারিয়েন তোমাকে ক্ষমা করেছে, ইসমাইল? কীসের সাথে বিষ মিশিয়েছিলে? দুধে? বিষটা ভালই ছিল। আমার মনে হচ্ছে বিষটা বুঝি তোমার রক্ত দিয়েই তৈরি। তুমি মরলে বুশম্যানেরা এসে তোমার রক্তে ওদের তীর রাঙিয়ে নেবে, যাতে বড় বড় সাপ এমনকী কুমিরও শিকার করতে পারে।’

ইসমাইল কিছুই বলল না।

র্যাচেল বলে চলেছে, ‘তোমার লোকেরা কি তোমাকে ক্ষমা করেছে, ইবুবেসি? করলে রিচার্ডের দেহ বহনকারী লোকগুলো পালিয়ে গেল কেন? আমার বাবা-মা কি তোমাকে ক্ষমা করেছে? শুনতে পাচ্ছ, কী বলছে ওরা? ঈশ্বরের কাছে আকুতি করে বলছে বিচার চাই, প্রভু। জুলুরা কি তোমাকে ক্ষমা করেছে, ইসমাইল? যারা বলে, বিচার করার ক্ষমতা আছে রাজার আর আছে ইনকোসাজানার? ঘোরো, ঘুরে ওদেরই না হয় প্রশ্ন করো, দেখ, ওরা ক্ষমা করেছে কিনা। ওই যে, পৌছে গেছে জুলুরা,’ ইসমাইলের মাথার ওপর দিয়ে বর্ষা তুলে পেছনটা দেখিয়ে বলল র্যাচেল। ‘ফিরে দেখো, ব্যাঙ কোথাকার। মামলার বাদী হবে স্বয়ং রাজা ডিনগান আর তুমি নিশাচর ইবুবেসি হবে অভিযুক্ত। বিচার করব স্বয়ং আমি, ইনকোসাজানা-ই-জুলা। যারা তোমার হাতে মরেছে, তাদের সবাইকে একে একে ডাকব আমি। তারাই প্রমাণ হাজির করবে। আর বর্ষাধারী জুরিদের হাজির করব সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে। ওই দেখো, বর্ষাধারীরা চলে এসেছে। দেখো, পেছন ফিরে দেখো, ব্যাঙ কোথাকার।’

বজ্রপাতের আলোয় দেখা যাচ্ছে, ফটক খুলে, দেয়াল টপকে পিলপিল করে ভেতরে আসছে জুলু সৈন্যরা। ভয়ানক দৃশ্যটা

দেখে লাফিয়ে মাটিতে নামল ইসমাইল। উদ্দেশ্য বন্দুক হাতে নেবে। কিন্তু ওটা ছোঁয়ার আগেই ওর ঘাড়ের লাফিয়ে পড়ল জুলুরা। ওকে ধরে অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ জুলু ভাষায় বলল, ‘ইনকোসাজানার জয় হোক। নেমে আসুন, জুলা। এই জানোয়ারের বিচার করুন।’

কণ্ঠটা আগেই চিনেছে র্যাচেল। এটা টাম্বুসার গলা। র্যাচেল বলল, ‘টাম্বুসা, ইনকোসাজানা চলে গেছে। ঈগল যেভাবে শিকারের জন্য খরগোশের ওপর ভেসে থাকে, জুলু জাতির মাথার ওপর সেভাবেই ভেসে আছে ইনকোসাজানা। এখানে আছি কেবল আমি, সাদা নারী র্যাচেল, যার ভেতর বাস করত ইনকোসাজানা। জুলু জাতির ওপর ভীষণ রেগে আছে জুলুদের আত্মা। কারণ, জুলুদের হাতে লেগে আছে ইনকোসাজানার বাবা-মায়ের রক্ত। টাম্বুসা, ইবুবেসির হাতে লেগে আছে সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের রক্ত, যাকে ভালবাসত ইনকোসাজানার পার্থিব শরীর। ইনকোসাজানা নিজেকে ইবুবেসির হাতে তুলে দিতে চায়নি বলে সাদা সর্দারকে হত্যা করেছে ইবুবেসি। এই ইবুবেসির হাতে নানাভাবে অনেকবার অপমানিত, নিগৃহীত হয়েছে ইনকোসাজানা। কিন্তু বিপদের সময় ইনকোসাজানা যখন সাহায্য চেয়েছে তখন জুলুদের হাজার হাজার বর্ষার একটাও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বরং, পবিত্র দু’জন মানুষ-ইনকোসাজানার বাবা-মা, তাদেরকে হত্যা করতে ব্যস্ত ছিল জুলুরা। সেই কারণে, টাম্বুসা, পাখির মতো উড়ে চলে গেছে ইনকোসাজানা। পেছনে ফেলে গেছে দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি আর সব হারানোর বেদনায় কাতর আমাকে। তারপরও, টাম্বুসা, ইনকোসাজানা আমার মুখ দিয়ে কথা বলবেন।

‘ইনকোসাজানা বলছে: রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের ওপর মহাবিপদ জুলুরা নিজেরাই ডেকে এনেছে। ইনকোসাজানা আগেই সাবধান করে দিয়েছিল যে তার প্রিয়জনদের রক্ত ঝরলে রক্ত

দিয়েই তার মূল্য চুকাতে হবে। ইনকোসাজানার হুকুম-
ইনকোসাজানা যার ভেতর বাস করত ও যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে
ইবুবেসি সহ ওর মতো সমস্ত জানোয়ারের হাত থেকে নিজেকে
রক্ষা করেছে, তাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সেয়াপির কন্যা
নোয়ির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সে এখন থেকে নোয়ির সাথেই
থাকবে।’

শুনছে আর নীচে দাঁড়ানো সৈন্যরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে ভাবছে
ওরা নিজেরা পাপ করে ইনকোসাজানাকে তো হারিয়েছেই,
উপরন্তু জুলুল্যাণ্ডের ওপর ডেকে এনেছে ইনকোসাজানার
অভিশাপ।

ঝলকে উঠল বজ্রবিদ্যুৎ। সেই আলোয় সবাই দেখল হাত
থেকে বর্শাটা ফেলে দিল র্যাচেল, যেন ওটার আর দরকার নেই
ওর। তারপর দু’হাত ছড়িয়ে দিল দু’দিকে। বাতাসে উড়তে লাগল
ওর এলো চুল। দৃশ্যটা অদ্ভুতই বটে। জুলুদের মনে হতে লাগল,
কোন সাধারণ মানবী সে অবশ্যই নয়। অবশ্যই র্যাচেল হচ্ছে
আত্মা, সমস্ত আত্মাদের রাণী ও!

আবার অন্ধকার নেমে এল। ঘর থেকে কুপি বাতিটা নিয়ে
এল এক জুলু। লোকটা ফিরে এসে দেখল ওদের মাঝেই
দাঁড়িয়ে আছে র্যাচেল। যদিও ওকে ছাদ থেকে নামতে দেখেনি বা
কোন শব্দও শোনেনি কেউ। এমনকী উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা
জুলুরাও না। ওদিকে র্যাচেলের চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে
দেখে ইসমাইল বুঝে নিল ওর ধ্বংস অনিবার্য। র্যাচেলের রোবের
প্রান্ত ধরে ক্ষমা চাইতে গেল ও। ওদিকে ইসমাইল র্যাচেলের
রোবটা স্পর্শ করেছে কি করেনি, র্যাচেল এমন তীক্ষ্ণ চিৎকার
দিয়ে উঠল যে, ইসমাইল তো ইসমাইল, অতি সাহসী জুলুদেরও
আত্মা উড়ে যাওয়ার জোগাড়। তবে জুলুদের অভয় দিল র্যাচেল।

ওদিকে চড়-থাপড় দিয়ে ইসমাইলকে র্যাচেলের রোব থেকে

ছুটিয়ে এনেছে জুলুরা। তারপর হুকুমের জন্য তাকাল ওদের সর্দারের দিকে। সর্দার শুধু হ্যাঁ বললেই স্রেফ ছিঁড়ে ফেলবে ওকে। কিন্তু টাম্বুসা বলল, ‘এখানে কিছু কোরো না। মরার আগে রাজার কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে।’

এবার আসল ভয়টা পেল ইসমাইল। র্যাচেলকে বলল, ‘বাঁচাও, র্যাচেল, আমাকে বাঁচাও। আমি যা-ই করেছি, তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে করেছি। আমার প্রতি এতটা কঠোর হয়ো না। তুমি জানো না, ওরা কী বলছে, অত্যাচার করে মেরে ফেলবে আমাকে।’

জুলু ভাষায় র্যাচেল বলল, ‘না, আমি কঠোর হচ্ছি না। তবে বিচারের ভার আমার নয়, সবার চেয়ে বড় যে বিচারক আকাশে বসে আছে তার হাতেই তোমার বিচারের ভার তুলে দিচ্ছি। কিন্তু বলো তো, তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম আমি? কেন আমার বাবা-মাকে মারতে সৈন্যদের হুকুম করেছিলে? কেন বিষ দিয়ে খুন করলে আমার ভালবাসার মানুষটাকে? কেন আমার থেকে “আমাকে” কেড়ে নিয়ে উন্মাদ করে দিলে আমাকে?’ তারপর টাম্বুসাকে বলল, ‘এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে আমাকে নিয়ে চলো, টাম্বুসা। স্বর্গের প্রতিশোধের আগুনে সব খাক হয়ে যাওয়ার আগেই চলে যাই, চলো। আর এই লোকটিকে যেন আর কখনো আমার দেখতে না হয় সেই ব্যবস্থা করো।’

বৃত্তাকারে র্যাচেলকে ঘিরে এগিয়ে নিয়ে চলল এক দল সৈন্য। মাফুটি থেকে বের হয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা গুহায় আশ্রয় নিল ওরা। কারণ বৃষ্টি এখনও শুরু না হলেও প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস শুরু হয়ে গেছে। মুহূর্মুহঃ বজ্র ঝলঝল করে উঠছে ধরিত্রী। বড় বড় গাছগুলোকে প্রায় গুইয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড বাতাস।

গুহামুখে বসে র্যাচেল তাকিয়ে আছে মাফুটির দিকে। ও জানে না, যেখানে ও বন্দি ছিল সেখানেই গাছের সাথে বেঁধে রাখা

হয়েছে ইসমাইলকে। ভয়ের চোটেই অর্ধেক উন্মাদ হয়ে গেছে ও। মাফুটির একটা বাড়ির ছাদে হঠাৎ আগুন ধরে উঠল। অবশ্য কেউ জানে না, আগুনটা কোন সৈন্যের জ্বালানো নাকি বজ্রপাতের কারণে ধরেছে। এক ছাদে আগুন ধরার পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়াতে লাগল আগুন। শেষে অবস্থা এমন হলো যে, দূর থেকে দেখে মনে হতে লাগল মাফুটি স্রেফ আগুনের একটা চাদর। বেড়াগুলোয়ও আগুন ধরে গেছে। ভেতরে আটকে পড়া লোকগুলো আতঙ্কিত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, কিন্তু বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ দেখা গেল মাফুটির মাঝের চওড়া পথটা দিয়ে ছুটে চলেছে এক লোক। পোশাকে আগুন ধরে যাওয়ায় মশালের মতো জ্বলছে সে। একে চিনে ফৈলল র্যাচেল। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বলল, ‘দেখো, দেখো, ইবুবেসি!’

গেট পর্যন্ত আসতে পারল না ইসমাইল। তার আগেই ওর সামনে ধসে পড়ল একটা জ্বলন্ত বাড়ি। এ যাত্রা কীভাবে যেন বেঁচে গেল ও। অন্যদিকে ছুটতে শুরু করল আবার। বসতির এক পাশে মাটি বেশ খানিকটা উঁচু। কিন্তু তার পরেই পঞ্চাশ ফিট খাড়াই। ওখানে কোন বেড়াও দেয়া হয়নি। এদিকে মাটিতে পা বেঁধে আছড়ে পড়েছে ইসমাইল। মাথার চুলেও আগুন ধরে গেছে ওর। যন্ত্রণা আর সইতে পারল না সে। হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল নিজেকে। আছড়ে পড়ল পঞ্চাশ ফিট নীচে মাটিতে। মাথা ঝগল ইসমাইল ওরফে নিশাচর ওরফে ইবুবেসি। পরদিন সকালে ওখানেই ওকে খুঁজে পেল জুলুরা। ওখানেই কবর দিল।

এভাবেই র্যাচেলের জীবন থেকে বিদায় নিল ইসমাইল নামের অভিশাপ। অবশ্য ইসমাইল একা মরেনি আগুনে মারা গেছে মাফুটির অনেক লোক, সাথে একান্ন জন জুলু। আগুন লাগার সময় মাফুটিতে আটকা পড়েছিল তারা। নিজের লোকদের খবর

নেয়ার পর টান্ধুসার মন্তব্য, ‘ইনকোসাজানার অভিশাপ খুব দ্রুত কাজ করা শুরু করেছে। অবশ্য এমনটাই হবার কথা। কিন্তু আমার ধারণা, এ কেবল শুরু। আসল ঝড় এখনও বাকি।’

একদম ধ্বংস হয়ে গেছে মাফুটি। এর সাবেক অধিবাসীরা কেউ আর ফিরে আসেনি। অন্য কেউও এখানে ঘর বানায়নি। নেটিভরা শপথ করে বলে, ঝড়ের রাতে এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে এখানে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। তখন তার সারা গায়ে আগুন জ্বলতে থাকে। এবং ছুটোছুটির এক পর্যায়ে উত্তরের ক্রিফ থেকে পঞ্চাশ ফুট নীচে লাফিয়ে পড়ে গায়েব হয়ে যায় সে।

আগের গল্পে ফিরে আসি। ঝড় থেমে যাওয়ার পরই নামল বৃষ্টি। স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত নিরেট একটা পর্দার মতো অঝোরে ঝরতে থাকল বৃষ্টি। নিরন্তর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখে গুহায় ঢুকে পড়ল র্যাচেল। জুলুদের আনা ক্যারোস গায়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল বেলা। জেগে উঠেই খাবার চাইল র্যাচেল।

ওই রাতে জুলু সৈন্যরা অবশ্য ঘুমাতে পারেনি। র্যাচেল গুহায় জায়গা পেলেও ওরা কেউ কোন গুহা পায়নি। পাথর বা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাতে কী আর বৃষ্টির প্রচণ্ডতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়? সারা রাতের বৃষ্টির তীব্রতায় ঠাণ্ডায় ওদের সবাই কম বেশি আক্রান্ত হলো। তীব্র ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গেল সবার। এক পর্যায়ে নিউমোনিয়া ধরে ফেলল ওদের। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সারাও গেল কয়েকজন। বাকিদের অবস্থাও খারাপ। কেউ সুস্থ নেই।

পরদিন সকাল। উদার হস্তে উষ্মতা ধিলাতে শুরু করেছে আফ্রিকার তপ্ত সূর্য। ক্যাপ্টেনদের নিয়ে আলোচনা ডাকল টান্ধুসা। প্রশ্ন তুলল, মাফুটি থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকদের ধাওয়া করা

হবে, নাকি সোজা জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া হবে। এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনরা। এক দল বলল মাফুটির লোকদের দেখা হয়ে গেছে। যেহেতু ইবুবেসিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে ওরা, তাই ধরে নেয়া চলে ওরা নির্দোষ। ওদের পিছু ধাওয়া করে লাভ নেই। কিন্তু আরেক দল বলল যে, না, ওরা নির্দোষ নয়। কারণ ইনকোসাজানা আর সর্দার ডোরিয়াকে তুলে আনতে ইবুবেসিকে সাহায্য করেছে ওরা। তার ওপর, সৈন্যদের হাতে মাফুটির কেউ মারা পড়েনি। পাওয়া গেছে কেবল মাফুটিবাসীদের ফেলে যাওয়া কয়েকটা গবাদি পশু। আর ইনকোসাজানাকে উদ্ধার করা গেলেও তার মানসিক ভারসাম্য নেই। তর্ক বিতর্ক চরম রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রস্তাব করা হলো ব্যাপারটা ইনকোসাজানার সামনেই তুলে ধরা হোক। সে যা সিদ্ধান্ত দেয় তা-ই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া হবে। অবশ্য যদি ওদের বক্তব্য বোঝার মতো অবস্থায় ইনকোসাজানা থাকে তাহলেই।

কাজেই একজন লোক নিয়ে র্যাচেলের সামনে গেল টাম্বুসা। সব বলল ওকে। নিশ্চাপ, পাথুরে চোখে কথাগুলো শুনল র্যাচেল। শেষে হঠাৎ বলল, 'নোয়ির কাছে নিয়ে চলো, আমাকে নোয়ির কাছে নিয়ে চলো,' এর বেশি আর একটা কথাও বলল না ও।

ফিরে এসে সৈন্যদের টাম্বুসা বলল, ইনকোসাজানার ইচ্ছা জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হলো ওরা। খুব খারাপভাবে পুড়ে যাওয়া লোকগুলোকে ঢালে করে বয়ে নেয়া হলো। তবে হেঁটেই রওনা হলো র্যাচেল। জল সৈন্যরা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে তাকে ঘিরে একটা মানব দেয়াল তৈরি করে এগিয়ে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে হেঁটেই চলল র্যাচেল। চেহারা বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ পড়ল না। তবে থেকে থেকে হঠাৎ হেসে ওঠে ও। যেন খুব মজার কিছু একটা দেখছে কিন্তু সেটা ও ছাড়া আর কেউ দেখছে না।

র‍্যাচেলকে ওভাবে হাসতে দেখাটা জুলুদের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর। কারণ, মাফুটিতে দাঁড়িয়ে ইনকোসাজানার কথা শুনেছে তারা। জেনেছে, ইনকোসাজানার নিষেধ সত্ত্বেও ওর আপনজনদের রক্ত ঝরেছে, তা-ও জুলুদের হাতে। ফলে জুলুদের ওপর নেমে আসছে বা এসে পড়েছে ইনকোসাজানার অভিশাপ। হয়তো মাফুটিতে আগুন লাগা ছিল তারই আগমনী সংকেত। হয়তো এসব আগাম দেখতে পেয়েই এভাবে হাসছে ইনকোসাজানা। চিন্তাগুলো জুলুদের জন্য মোটেও সুখকর নয়।

দুপুর নাগাদ খাবারের বিরতি নেয়া হলো। আগের মতোই, প্রচুর খেল র‍্যাচেল। তবে নিজেকে ও ফিরে পেয়েছে বলা যাবে না। খাবার শেষ হতেই বাফেলো নদীর দিকে এগুল ওরা। কিন্তু ওখানে পৌঁছে দেখল গত রাতের ভারী বৃষ্টির কল্যাণে ভীষণ ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী। এখন নদী পার হওয়া মোটেও নিরাপদ না। কাজেই ওরা সিদ্ধান্ত নিল এখানেই রাতের জন্য ক্যাম্প করা হবে। জুলুরা নিজেরা নিজেরা বলাবলি করছে এই যাত্রায় দুর্ভাগ্য ওদের ছাড়ছেই না। অবশ্য এমনটা যে হবে সেটা ওরাও আগেই অনুমান করেছে। কারণ জুলুদের ধারণা, মাফুটির অধিবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়নি বলেই ওদের ওপর নাখোশ ইনকোসাজানা। ফলে দুর্ভাগ্য ওদের পিছু ছাড়ছে না। জুলুরা জানে না আরো অনেক দুর্ভাগ্য আসা বাকি।

কিছু সৈন্য ডালপালা আর লতাপাতা কাটছে। ওসব দিয়ে র‍্যাচেলের জন্য আজ রাতের মতো চলনসই একটা কুঁড়ে বানানো হবে। শূন্য দৃষ্টিতে ওসব দেখছে র‍্যাচেল। হঠাৎই পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠল ও। তারপর নদীর পাড়ের দিকে তীর গতিতে ছুট দিল। পাড়ে পৌঁছে রোবটা গুলে ফেলল তারপর জুলুদের কেউ ওর ধারে কাছে আসার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল স্রোতের ভেতর। সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল অপর পাড়ের

উদ্দেশে। কিন্তু শক্তিশালী স্রোত ওকে টেনে নিয়ে চলল ভাটির দিকে। সাঁতরে কুলিয়ে উঠতে পারছে না র্যাচেল।

এদিকে র্যাচেলকে ওভাবে লাফিয়ে পড়তে দেখে আগেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল টাম্বুসার। এবার র্যাচেল মারা পড়তে পারে ভেবে আতঙ্কে পাগল হবার দশা হলো ওর। সবাইকে চিৎকার করে বলল, ‘ইনকোসাজানা যেদিকে গেছে আমাদেরও সেদিকেই যেতে হবে। তাতে মৃত্যু হলে তা-ই সই।’

জুলুরাও সম্মত হলো। একজন আরেকজনের হাত ধরে ধরে মানব শিকল বানাল। এভাবে একের পর এক রেজিমেন্ট নেমে পড়ল পানিতে।

ওদিকে সাঁতরে চলেছে র্যাচেল। ওর মাথায় পাগলামি ভর করেছে সেটা আগেই বলেছি। উন্মাদসুলভ শক্তি এসে গেছে ওর ভেতর। ফলে, কোন নারীর পক্ষে যা অস্বাভাবিক কঠিন অনায়াসেই তা করে ফেলল র্যাচেল।

কাদা-গোলা ঘোলা পানির এক একটা ঢেউ আছড়ে পড়ে র্যাচেলের ওপর, তলিয়ে যায় ও। জুলুরা সমন্বরে হায় হায় করে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার ভেসে উঠতে দেখা যায় র্যাচেলের সোনালী চুল। একবার র্যাচেলকে প্রায় মাড়িয়েই চলে গেল একটা ভাসমান গাছের গুঁড়ি। সবাই ভাবল এবার শেষ। আর বাঁচার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু ভেসে উঠল র্যাচেল। তীব্র স্রোতের টানে একটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়তে পড়তেও কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল ও। স্রোতের বিরুদ্ধে আরো কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর পায়ের নীচে মাটি পেল র্যাচেল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠেও পড়ল অপর পাড়ে। পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জুলুদের দিকে। কী বিপদ যে পার করে এসেছে তা ওর মাথায়ই নেই।

ওদিকে মানব শিকলের রূপে স্রোতের সাথে যুদ্ধ করে এগুতে

চেষ্টা করছে জুলুরা। যদিও ওপাড়েই আছে ওরা এখনও। ওদের ক'জন বলছে, 'একজন' মহিলা যদি ওপাড়ে চলে যেতে পারে আমরাও অবশ্যই পারব।'।

প্রতিবাদ করে আরেকজন বলল, 'গাধা, ভেবেছিস আর দশটা মহিলার মতো জুলা কোন সাধারণ নারী? সে হচ্ছে আত্মা, সাক্ষাৎ মৃত্যুও তাকে ছুঁতে ভয় পায়। সে পারলেই আমরা নদী পার হতে পারব ভাবছিস কেন?'

মানব শিকল নদীর মাঝখানে পৌঁছে গেছে প্রায়। ঠিক তখনই র্যাচেলের মতো ওরাও স্রোতের টানে পড়ে গেল। হার মানল মানব শিকল। হাত ছুটে গেল ওদের। ভেসে গেল বেশ ক'জন। প্রাণ হারিয়েছে তারা। কারণ, জুলুদের কয়েকজনই মাত্র সাঁতার কাটতে জানে। পরপর তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তারপর দু'ক্ষ সাঁতারুদের সামনে পাঠানো হলো। শিকলের মাথায় চলে গেল ওরা। তারপর বিরাট একটা সাপের মতো মোচড় খেতে থাকা মানব শিকলের একজন অপরজনকে ধরে ধরে নদী থেকে উঠে এলো সবাই। অসুস্থদের অবশ্য ওপাড়েই রেখে আসা হয়েছে। সেই সাথে তাদের দেখাশোনা ও গবাদি পশু রক্ষার জন্য ক'জন তরুণকেও ওপাড়ে রেখে আসা হয়েছে।

জুলুরা অনেক লোক হারিয়েছে। কেউ ভেসে গেছে স্রোতের টানে, কেউ আবার পাথরে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। তবে ওসব নিয়ে খোরাই মাথা ঘামাচ্ছে ওরা। এপাড়ে এসে জুলাকে খুঁজে পেয়েছে তাতেই ওরা খুশি। জুলাকে না পেলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওদেরকে ব্যর্থতার লজ্জা বয়ে বেড়াতে হতো। কতজন লোক হারিয়েছে তা শুনে "জুলার" কাছে রিপোর্ট করল টাম্বুসা। প্রথমে র্যাচেলের চোখে সামান্য একটু কষ্টের আভাস দেখা গেলেও পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এল সেই নিষ্করণ আবেগহীন পাথুরে দৃষ্টি। ও বলে উঠল, 'এই দায় আমার না, কখনোই

আমার না। এই দায় জুলুদেরই কারণ আগে রক্তপাত করেছে ইনকোসাজানার সন্তান জুলুরা। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ঝরেছে। আরো ঝরবে,’ বলে হঠাৎ উন্মাদসুলভ হাসিতে ফেটে পড়ল র্যাচেল।

অপরাধী সুরে নিচু কণ্ঠে টাম্বুসা বলল, ‘সত্য কথা, রাণী। জানোয়ার ইবুবেসি যেমন তার অপকর্মের মূল্য চুকিয়েছে, জুলু জাতিকেও তাদের কৃতকর্মের মূল্য চুকাতে হবে।’

সেদিন আর এগুল না জুলুরা। নদীর পাড়েই ক্যাম্প করল, কুঁড়ে বানানো হলো র্যাচেলের জন্য। তার পাশেই জ্বালানো হলো বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড। আগুনের পাশে বসে ভেজা কাপড় শুকিয়ে নিল র্যাচেল। তবে এখনও আগের মতোই নির্বিকার। মনে হচ্ছে যেন কিছুই ওর ক্ষতি করতে পারবে না। যেমনটা পারেনি স্রোতস্বিনী বাফেলো নদী।

সৈন্যরাও নিজেদের জন্য আগুন জ্বালল। ওষুধ আর খাবারের জন্য কয়েকজন ছুটে গেল পার্শ্ববর্তী গ্রামে। সেই সাথে কয়েকজন গেল অদূরবর্তী পাহাড়ের চূড়ায়। আগুনের সাহায্যে পাহাড় থেকে পাহাড়ে সংকেত পাঠিয়ে রাজার কাছে আজকের ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর জানাল তারা।

আঠারো

রাতে নদীর পাড়েই ঘুমাল র্যাচেল ও জুলু সৈন্যরা। এই রাতে

আরো চারজন লোক হারিয়েছে জুলুরা। নদী পেরুবার সময় পাথরে আছড়ে আহত হওয়া দু'জন লোক মারা গেছে। আর রাতে সিংহ তুলে নিয়ে গেছে দু'জনকে। বাকিদের বেশিরভাগও অসুস্থ বোধ করছে। সকাল নাগাদ আশপাশের ক্রালগুলো থেকে প্রচুর খাবার আর ওষুধ এসে পৌঁছল। সেই সাথে র্যাচেলের সেবার জন্য এল উচ্চ বংশজাত কয়েকটি তরুণী। কিন্তু ওদের বা খাবার-দাবারের দিকে জ্রক্ষিপ-মাত্রও করল না র্যাচেল। কেবল প্রশ্ন করল, 'সেয়াপির মেয়ে নোয়ি কোথায়? আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো।'

আবার শুরু হলো পথ চলা। আগের মতোই সৈন্যদের ঘেরের ভেতর থেকে পথ চলল র্যাচেল। সেই রাতে পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প করল জুলুরা। পাহাড়ের ওপর এক ক্রালে ঘুমাল র্যাচেল। পরদিন সকালে রাজার দূতের দেখা পেল ওরা। মধুর মধুর কথা শোনাল সে। আবেগশূন্য নিস্ত্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দূতের কথা শুনল র্যাচেল। তারপর তাকে সহ বাকি সবাইকে আতঙ্কিত করে দিয়ে হা হা করে উন্মাদের মতো হেসে উঠল। দূত লোকটা দুর্লভ সাদা বানরের চামড়ার একটা আলখেল্লা নিয়ে এসেছে। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল র্যাচেল। মানসিক ভারসাম্য খোয়ালেও ওর কাপড় চোপড় যে বদলানো দরকার সেটা বুঝতে পেরেছে র্যাচেল।

উর্বর একটা এলাকার ওপর দিয়ে চলেছে র্যাচেল ও জুলুদের বহর। এমন সময় পেছনে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল তারা। দেখল, খুব দ্রুত দিগন্ত ছেয়ে ফেলল অদ্ভুত আকৃতির মেঘ।

ওরা বুঝতে পারেনি, ওটা আসলে মেঘ নহি, মেঘের আকারে ধেয়ে আসা বিরাট বড় পঙ্গপালের দল। ক্ষুধার্ত পঙ্গপালগুলো পথে সবুজ যা কিছুই পেল মুহূর্তেই সব খেয়ে শেষ করে ফেলল। যে এলাকার ওপর দিয়েই পঙ্গপাল পার হুলো সেখানকার গাছে

কেবল ডাল ছাড়া আর কিছুই রইল না। শস্যের কথা বলাই বাহুল্য। ওসবের এক দানাও কোথাও অবশিষ্ট নেই। রয়ে গেল কেবল আত্নাদরত, ক্রন্দনরত মহিলারা। ওরা খুব ভাল করেই অনুভব করছে পরবর্তী শীতটা ওদের না খেয়েই কাটাতে হবে। সন্তানরা বাঁচবে কিনা ঈশ্বর মালুম।

ফসল শেষ করার পর শুরু হলো আরেক মহা আপদ। যেখানে সেখানে পড়ে মরতে শুরু করল পতঙ্গগুলো। ফলে খুব দ্রুতই দূষিত হয়ে উঠল বাতাস। এত বেশি পরিমাণে ওগুলো মারা পড়ল যে নদ-নদীর পানিও দূষিত হয়ে গেল। অবধারিতভাবে আবির্ভাব ঘটল মহামারীর। এবার ইনকোসাজানার কাছে ছুটে এল সবাই। প্রার্থনা জানাতে লাগল যেন অভিশাপ তুলে নেয় সে।

কিন্তু ওদের প্রার্থনার জবাবে কেবল একটা কথাই আউড়ে গেল অপ্রকৃতিস্থ র্যাচেল, ‘আমার কোন দোষ নেই, জুলুরা ইনকোসাজানার আপন লোকের রক্ত বইয়েছে। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ আর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জুলুদের ওপর। কারণ পবিত্র রক্ত বইয়েছে জুলুরা,’ ভয় পেয়ে চলে গেল লোকগুলো।

রাজার ক্রালের দিকে এগিয়ে চলল র্যাচেলদের বহর। সারা পথে পড়ে থাকতে দেখা গেল মৃত পঙ্গপাল। পচা গন্ধে আকাশ বাতাস সবই যেন দূষিত হয়ে উঠেছে। একসময় রাজার ক্রাল উমগুনগুনালোভুর কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পথে দেখে এসেছে প্রধান সড়কের জায়গায় জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে মৃত পঙ্গপাল। হাতের কাছে খুব বেশি সরঞ্জাম না থাকায় সৈনিকদের ঢালে করে বয়ে আনা হচ্ছে আরো মৃত পঙ্গপাল। ঘর-বাড়ির ছনের চাল থেকে আঁচড়ে নামানো হচ্ছে মৃত, প্রায় মৃত পোকা। ক্রমেই বড় হচ্ছে স্তূপ। যে ক’টা বেঁচে আছে সেগুলোকে পিষে মারার চেষ্টা করছে সৈন্যরা। মহিলা আর বাচ্চারাও আতঙ্কিত হয়ে

এলোমেলো ছোটোছুটি করছে, চেষ্টা করছে চুল থেকে আঁচড়ে পোকাগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে।

শেষ বিকেল নাগাদ উমগুনগুনলোভুতে পৌছে গেল র্যাচেলদের বহর। প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল র্যাচেল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করা হয়েছে। যাতে লোকে ভাবে ফিরে এসেছে তাদের ইনকোসাজানা, ফলে আর “ভয়ের” কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। টিলার ওপর র্যাচেল আগে যে ক্রালে ছিল ওখানেই নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওখানে র্যাচেলকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছিল ওর আগের পরিচারিকা মহিলাগুলোই। সাদর উষ্ণতায় র্যাচেলকে বরণ করে নিল তারা। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ র্যাচেল ওদের কাউকে চিনতেই পারল না।

ঘুমিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিল ও। জুলুরাও ওকে আর টানাটানি করেনি, কারণ ওরা ধরেই নিয়েছে যে, ক্লান্ত ইনকোসাজানার এখনই রাজার সাথে দেখা করার মতো শক্তি নেই। তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, র্যাচেলের সাথে দেখা করার আগে ঘটনাক্রম সম্বন্ধে টাম্বুসার বিস্তারিত রিপোর্ট নিজ কানে শুনতে চায় রাজা ডিনগান।

পরদিন সকাল। পুলের পাড়ে বসে আছে র্যাচেল। স্বপ্নে এই পুলের পানিতেই রিচার্ডের আসার দৃশ্য আগাম দেখেছিল র্যাচেল। যা হোক, একজন লোক নিয়ে হাজির হয়েছে টাম্বুসা। বলাই যে ওকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে এসেছে সে। নিশ্চুপ হয়ে শুনল কেবল র্যাচেল। হ্যাঁ না কিছুই বলল না। তবে এগিয়ে গেল। টাম্বুসা ওকে পালকিতে চড়তে বললে অস্বীকৃতি জানিয়ে র্যাচেল বলল যে হেঁটেই যাবে ও।

মৃত পঙ্গপালে ভরে থাকা রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে হেঁটে রাজার ক্রাল ইনটুনকুলুতে ঢুকল ও। ইন্দুনা

পরিবেষ্টিত হয়ে যথাস্থানে বসে আছে ডিনগান। ইন্দুনারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বায়াতে দিল র্যাচেলকে। কিন্তু র্যাচেলের চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। জুলুদের সালাম খেয়ালই করেনি ও। উঠানে একটা টুল রাখা হয়েছে ওর জন্য। সোজা ওখানে গিয়ে বসে পড়ল র্যাচেল। তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। ডিনগানকে খুবই দুঃখী এবং একই সঙ্গে ভীত দেখাচ্ছে। ভীত কণ্ঠেই রিপোর্ট করতে বলল টাম্বুসাকে।

পথ যাত্রার গল্পের বর্ণনা দিয়ে শুরু করল টাম্বুসা। সবাইকে শোনাল, কীভাবে নদীর পাড়ে পৌঁছুল ওরা। তারপর ড্যারিয়েনকে সাথে নিয়ে র্যাচেলের একা নদী পার হওয়া, পরদিন রামাহ-তে টাম্বুসাকে একা যেতে হুকুম করা, ওখানে পৌঁছে জুলু সৈন্য, চিৎকারকারী ও তার স্ত্রীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া, তারপর বাগানে ইবুবেসির মুমূর্ষু সৈন্যের সাথে দেখা হওয়ার কথাও বলল। বলল, মুমূর্ষু লোকটিই নিশ্চিত করেছে যে, সাদা সর্দার ডোরিয়ো ও ইনকোসাজানাকে ধরে নিয়ে গেছে ইবুবেসি। মাফুটিতে গিয়ে তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে টাম্বুসা। তারপর রাখাল ছেলেকে দিয়ে ইবুবেসির কাছে রাজার হুমকি পাঠিয়েছে সেটাও বলল ও। সেই সাথে বলল র্যাচেলকে বন্দি করে রাখা ক্রালে কী কী দেখেছে সেগুলো। তারপর বলল আগুনে পুড়ে ইবুবেসির মর্মান্তিক মৃত্যু, বাফেলো নদী পাড়ি দেয়ার রোমহর্ষক গল্প, তারপর এখানে ফিরতি পথের বিস্তারিত বর্ণনা। তার রেজিমেন্টের একের পর এক দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া; আগুন, কষ্ট আর অসুস্থতার শিকার হওয়া, সিংহের মুখে সৈন্য হারানো আর সব শেষে সবিস্তারে বলল পঙ্গপালের আক্রমণে জুলুদের বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা। শেষ হলো টাম্বুসার গল্প। গল্পের আগ্রহ ও উদ্বেগের সাথে টাম্বুসার প্রতিবেদন শুনল ইন্দুনারা।

এরপর ইন্দুনাদের সামনে উপস্থিত করা হলো দড়ি বাঁধা

কয়েকজন জুলু সৈনিক ও ক্যাপ্টেনকে । এদের হাতেই খুন হয়ে গিয়েছিল র্যাচেলের বাবা-মা । ডিনগানের হুকুমে এই পক্ষও মুখ খুলল । আত্মপক্ষ সমর্থন করে ওরা বলল যে, ওদেরকে হুকুম করা হয়েছিল ইবুবেসির হুকুম যেন ওরা বিনা প্রশ্নে, বিনা তর্কে পালন করে । তা-ই করেছে ওরা । আর চিৎকারকারী যে মারা গেছে সেটাও ইচ্ছাকৃত ছিল না । দুর্ঘটনাবশত হয়ে গেছে । তদুপরি ওরা এখন বুঝতে পারছে যে, ইবুবেসি আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে তার ইচ্ছামতো ওদেরকে ব্যবহার করবে । ওদেরকে দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে ইনকোসাজানাকে ।

এই পক্ষের কথা শেষ হওয়া মাত্রই উঠে দাঁড়াল ডিনগান । প্রচণ্ড রেগে গেছে সে । বন্দি সৈন্যদের ওপরই এবার রাগ ঝাড়বে । কারণ এই নির্বোধ ক'জন জুলুর জন্যই আজ পুরো জুলু জাতিকে 'ডুখতে হচ্ছে' । উপরন্তু ইনকোসাজানার আশীর্বাদ সরে গিয়ে নেমে এসেছে তার অভিশাপ । রাজা তৎক্ষণাৎ এই জুলুদের মৃত্যুদণ্ড জারি করল । অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হবে এদের । একই সঙ্গে টাম্বুসার ক্যাপ্টেনদের মধ্যে যারা মাফুটির লোকদের ধাওয়া করে হত্যা করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে তাদের প্রত্যেকেরও মৃত্যুদণ্ড দিল রাজা । সাথে সাথে ওদের ধরতে ছুটতে শুরু করল জল্লাদরা ।

এবার মুখ খুলল র্যাচেল । এতক্ষণ মনেই হয়নি যে কোন কিছু শুনেছে ও । কিন্তু রাজার রায় শুনে ও বলল, 'ওদের ছেড়ে দাও । স্বর্গ যখন প্রতিশোধ নেবে, কাউকে ছাড়বে না ।' এই অযথা রক্তপাতের প্রয়োজন নেই । আর যারা ইনকোসাজানার আত্মাকে দূরে সরতে বাধ্য করেছে, তাদের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করতে চাই না আমি । রামাহ-তে সৈন্য পাঠিয়েছিল কে? যারা আমাকে জন্ম দিয়েছে তাদের কাছে কেন গিয়েছিল জুলু সৈন্যরা? গিয়েছিল কারণ, মালিক হুকুম করলে কুকুর যেমন হামলে পড়ে, ওরাও ছিল

ঠিক তেমন। মালিকের হুকুম মানা কুকুর। ওদের মুক্তি দাও।
নইলে জুলুদের ওপর আরো রক্তের দায় এসে পড়বে।’

কেঁপে উঠল ডিনগান। কারণ তার হুকুমেই সৈন্যরা গিয়েছিল
রামাহ-তে। এবং ইনকোসাজানার যে সেই কথাটা অজানা নেই
র্যাচেলের কথা শুনে সেটাও তার বোঝা হয়ে গেছে। রাজা এবার
বলল, ‘ঠিক আছে, ওরা মুক্ত। তবে এই দেশের মাটিতে ওদের
আর জায়গা নেই।’

কৃতজ্ঞ চিন্তে বিদায় নিল লোকগুলো। ওরা ইনটুনকুলুর গেট
পার হতেই অন্য কিছু লোক ফটক পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। এই
লোকগুলো এতই রুগ্ন ও ক্লিষ্ট যে, চামড়া ফুটো করে বের হয়ে
আসতে চাইছে ওদের গায়ের হাড়। মনে হচ্ছে এক দুই দিন নয়,
বছরের পর বছর না খেয়ে আছে এরা। আর ওদের হাতের পুরু
চামড়ার ঢালগুলোয় এত ছিদ্র যে, দেখে মনে হচ্ছে ইঁদুরে খেয়ে
ফেলেছে ওগুলো। মাটিতে আছড়ে পড়ে চিকন স্বরে অতিকষ্টে
রাজাকে সালাম জানাল লোকগুলো।

রাগত স্বরে রাজা প্রশ্ন করল, ‘এই কঙ্কালগুলো কারা?’

ওই দলের মুখপাত্র বলল, ‘রাজা, আমরা আপনার নোবাম্বে,
নদওয়েঙ্গে আর ইসাঙ্গু রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন। বহু দূরের এক
গোত্রের সর্দার মাডাকু আর ওর গোত্রের সবাইকে হত্যা করতে
আমাদের পাঠিয়েছিলেন আপনি। ওরা জলাভূমিতে বিরাট এক
নদীর পাড়ে বাস করে। সেই নদীটা সাগরে গিয়ে মিশেছে।
আমাদের যাওয়ার খবর পেয়ে নৌকা, ভেলায় করে নদী আর
নলখাগড়ার জলায় পালিয়ে যায় ওরা। নলখাগড়ার মধ্যেই আমরা
ওদের পিছু নিই। কিন্তু নলখাগড়ার গোলকধাঁসায় বারবার পথ
হারিয়ে ফেলি। পথে ওদের অ্যাম্বুশের মধ্যে পড়ে যাই
অনেকবার। ওভাবে অনেক লোক হারিয়েছি আমরা। আর জলার
পানিতে ডুবেও অনেকে মারা গেছে। শেষদিকে এসে খাওয়ার

মতো কিছুই পাইনি। তখন বাধ্য হয়ে ঢালের চামড়া খেয়ে ঢালের ওপর শুয়ে কোনরকমে দিন পার করেছি। একেক বারে শ'য়ে শ'য়ে লোক হারিয়েছি আমরা। তারপরও আক্রমণে গেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পেরেছি আমরা মাত্র এই দশজন।’

প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে ডিনগান। তিন তিনটি রেজিমেণ্ট হারিয়েছে সে।

কিন্তু ওদের গল্প শুনে হা হা করে হেসে উঠল ব্যাচেল। বলল, ‘আগেই বলেছি, স্বর্গ যখন প্রতিশোধ নেবে রক্তের বন্যা বইতে থাকবে

‘সত্যি কথা,’ বলছে ডিনগান, ‘খুব দ্রুত আমাদের ওপর অভিশাপ নেমে আসছে।’ তারপর ক্লিষ্ট লোকগুলোর দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলল, ‘কাপুরুষ হুঁদুরের দল, লড়াই করতে জানিস না তোরা! তোদের ভাগ্য ভাল যে কালো হাতি (চাকা) জীবিত নেই। থাকলে না মরা পর্যন্ত ঢালগুলো খেতে বাধ্য করত তোদের। যা, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।’

চলে গেল ক্যাপ্টেনরা।

এবার গেটের গার্ডকে ঠেলে ধাক্কিয়ে ভেতরে এল ইয়া মোটা এক লোক। দরদর করে এর চোখ থেকে পানি ঝরছে। অবশ্য এটা কুস্তীরাক্ষণও হতে পারে। কারণ মেকি কান্না করায় জুলুদের মতো ওস্তাদ খুঁজে পাওয়া ভার।

এই লোকটির সাথে প্রতি সপ্তাহান্তেই কথা বলে ডিনগান। কখনো কখনো আরো তাড়াতাড়ি। তাই রাজা খুব ভাল করেই জানে লোকটি কে।

রাজা প্রশ্ন করল, ‘কী হয়েছে, মোভো? এভাবে আমার সভায় ঢুকলে কেন?’

লোকটি বলল, ‘ক্ষমা করুন, রাজা। খুব খারাপ খবর নিয়ে এসেছি। এতই খারাপ যে, ফটকের-প্রহরীদের ঠেলে ভেতরে

আসতে বাধ্য হয়েছি।’

গুণ্ডিয়ে উঠে রাজা বলল, ‘খারাপ খবর বহনকারীরা দেখছি সবচেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে! কান্না থামাও, বলো কী হয়েছে।’

‘ও, শত্রু খাদক, ও, দুনিয়া কাঁপানো রাজা, বিশাল ক্ষতিতে পড়ে গেছেন আপনি। মানে আপনার গবাদি পশুর পাল ক্ষতিতে পড়েছে। রাজকীয় পাল, বাঁকা শিংওয়ালা সাদা গরুর পালের ওপর গজবের মতো এক অসুখ নাজিল হয়েছে। হাজারের মতো সাদা গরু মারা গেছে। আরো অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখনি কিছু করা না গেলে রাজকীয় গরুর পাল বলে আর কিছু থাকবে না,’ বলেই ভাঁ করে কেঁদে ফেলল মোভো নামের লোকটি।

রাগের চোটে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিনগান্ন। হাতের বর্শার হাতলটা ধাঁই করে বসিয়ে দিল লোকটার মাথায়। এত জোরে সে মেরেছে যে, আঘাতের প্রচণ্ডতায় হাতলটাই দু’টুকরো হয়ে গেছে। চিৎকার করে রাজা বলল, ‘মোটা গর্দভ কোথাকার, আমার গরুর কী করেছিস তুই? বন্, জলদি বন্, নয়তো ওগুলোর ওপর কালো জাদু করার অপরাধে তোর জান নিয়ে নেব।’

মাথা ডলতে ডলতে বহু কষ্টে উঠে বসল মোভো। কাতরে উঠে বলল, ‘মোটা হওয়া কি অপরাধ, রাজা? আমার চেয়ে মোটা লোকও তো এখানে আছে।’ (স্পষ্টতই তার ইঙ্গিত রাজার দিকে।) ‘আপনার হাজার গরু ঢালের চামড়া হয়ে গেছে সেটা আমার দোষ হবে কেন?’

‘আমার প্রশ্নের জবাব দিবি, নাকি এবার ডাঙার বদলে বর্শার ফলাটাই বসিয়ে দেব তোর বুকে? কী করেছিস আমার গরুর?’

‘আমি কিছুই করিনি, রাজা। ওই জানোয়ারগুলো ঘাসের বদলে রান্নাসের মতো কেবল পঙ্গপাল খেয়েছে। তারপর মুখে ফেনা এসে মাটিতে আছড়ে পড়ে পা দাপাতে দাপাতে মারা

গেছে। আর ওগুলোরই বা দোষ কী, কোথাও তো ঘাস নেই। পঙ্গপালের দল সব সাবাড় করে দিয়েছে। ঘাস না পেয়ে অভিশপ্ত পোকাগুলোকেই খেয়েছে গরুগুলো। কাজেই, রাজা, দোষ আমার নয়। দোষ যদি কাউকে দিতেই হয় তো স্বর্গকে দিন। হয়তো কোন দুষ্ট জাদুকর স্বর্গকে রাগিয়ে দিয়েছে। তারই পরিণতি এই দুর্ঘটনা। আগে কখনোই এমন কিছু ঘটতে দেখেনি জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসীরা।’

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল র্যাচেল। বলল, ‘কী, বলিনি, স্বর্গ যখন শোধ নেবে কাউকেই ছাড়বে না? বৃষ্টির মতো শাপ নামছে, ডিনগান। প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে রাজার ওপর, সাধারণ জনগণের ওপর, সৈন্যদের ওপর, শস্যের ওপর, গবাদি পশুর ওপর, প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছে পুরো জুলুল্যাণ্ড। কেন? কারণ নিষেধ করা সত্ত্বেও ইনকোসাজানার আত্মায় রক্ত ঝরিয়েছে আমাজুলুরা। অথচ তাদের আপন সন্তান হিসেবে ভালবাসত ইনকোসাজানা।’

‘সত্যি কথা, লেডি। কিন্তু চাবুকের আঘাত তো আমাদের খেতেই হচ্ছে, বারবার এই কথাটা মনে করিয়ে আমাদের কষ্ট কেন বাড়িয়ে দিচ্ছেন?’

‘মোভো, তোর কথা শেষ হয়েছে?’

‘না, রাজা। একই অসুখে দেদার মারা পড়ছে আশপাশের সমস্ত ক্রালের গরু। গরুগুলোকে খেয়ে ফেলা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী শীতটা সবাইকে না খেয়ে কাটিতে হবে। ফসল নেই, মাংস নেই অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ আসছে।’

‘আরো কিছু বলবি, মোভো?’

‘হ্যাঁ, রাজা। আমি গবাদি পশুর প্রধান রক্ষক বিধায় অন্যান্য রাজকীয় পালের খবর নিয়ে আমার কাছেই দূত এসেছে। জানিয়েছে, দুই দিনের পথ দূরের অন্যান্য রাজকীয় পালেও পোকার আক্রমণ হয়েছে। তবে ওদের কথা ঠিকভাবে বুঝে

থাকলে ওই পালগুলোতে ভিন্ন জাতের পোকার আক্রমণ হয়েছে। আর, বলতে ভুলে গেছি...’

এবার চিৎকার করে উঠল রাজা, ‘এই কে আছিস, এই ব্যাটাকে থামা। আর ওর যত গরু আছে সব এনে আমার পালে যুক্ত কর।’

সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু’জন অ্যাটেনডেন্ট। বিনা বাক্যব্যয়ে পেটাতে শুরু করল মোভোকে। ঠেলে গেটের দিকে নিয়ে চলল তাকে। কিন্তু ফটকে পৌঁছার আগেই মুচড়ে নিজেকে একবার ছাড়িয়ে নিল মোভো। সত্যিকারের কান্না কাঁদছে সে এবার। ডিনগানকে সে বলল, ‘লাভ নেই, রাজা। আমার গরু সব আগেই মারা গেছে। ওগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে চামড়াগুলো ঢাল প্রস্তুতকারকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।’

এরপর ঠেলে মোভোকে গেটের বাইরে ‘বের করে দেয়া হলো।

বিমর্ষ হয়ে অধোবদনে বসে আছে রাজা আর তার ইন্দুনারা। ভাবছে, ইনকোসাজানার বাহন এই “মেয়েটির” বয়ে আনা অভিশাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কীভাবে। মুহূর্তখানেক নীরবে কাটল। তারপর সভায় হাজির হলো আরেকজন সংবাদবাহক।

রাজা বলল, ‘তুইও যদি খারাপ সংবাদ এনেছিস তো তোকে খুন করব আমি।’

সংবাদ বাহক লোকটি বলল, ‘না, রাজা। খারাপ কিছু নয়। আমি কেবল এই সংবাদ এনেছি যে, বাইরে একদল দূত অপেক্ষা করছে।’

রাজার উদ্বেগাকুল প্রশ্ন, ‘কারা ওরা? আমাদের দূত?’

‘না, রাজা। তারা ভূত জাতির রাণীর পাঠানো দূত। কিছুদিন আগে সেয়াপির মেয়ে নোয়িকে পাঠিয়েছিলেন এদের খোঁজে।’

‘মনে আছে। ভেতরে আসতে বল ওদের।’

লম্বা কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষার পর খুলে “গেল দরবারে প্রবেশের ফটক। প্রথমে ভেতরে এল সাদা রোব পরিহিতা নোয়ি। পথ যাত্রায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে বটে তবে আগের মতোই সুন্দরী। ওর সাথে ভেতরে ঢুকল আরো চারজন লোক। আক্ষরিক অর্থেই দানবীয় শরীর ওদের। তবে গায়ে পোশাক বলতে আছে কেবল কোমর জড়িয়ে থাকা সামান্য একটু মুচা (মুচা: চামড়া দিয়ে তৈরি নেংটির আদি আফ্রিকান সংস্করণ)। ওদের বাহু ও পা জড়িয়ে আছে তামার তৈরি বিভিন্ন রকম অলংকার, কান থেকেও ঝুলছে বিরাটাকার রিং তবে হাতে ধরে আছে বিরাটাকার বর্শা। এরপর একই রকম দেখতে বিশালদেহী বেয়ারারা বয়ে নিয়ে এল তিনটা পালকি। পালকির পর্দা নামানো ও খুব শক্তভাবে বাঁধা। এদের সাথে পরিষদের উঠানে প্রবেশ করল পঞ্চাশজন সৈন্যের এক দল—দেহরক্ষী। ধীর পদক্ষেপে ইন্দুনাদের দিকে এগুল অদ্ভুত চেহারার রক্ষীদল। লোকগুলোর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইন্দুনারা। কারণ এত বিশালদেহী মানুষ ওরা আগে আর কখনো দেখেনি। সোজা রাজার সামনে গিয়ে পালকি নামিয়ে রাখল তারা।

এবার উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। ওর দিকে এগিয়ে এল নোয়ি। সামনে এসে কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দু’জনে। তারপর বুকে বসে র্যাচেলের রোবের প্রান্তে চুমু খেল নোয়ি। কিন্তু র্যাচেল ওকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক যেভাবে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহময়ী মা।

‘কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি, নোয়ি? তোমাকে অনেক খুঁজেছি,’ বলল র্যাচেল।

‘আমি তো আপনার কাজেই গিয়েছিলমি!’ র্যাচেলের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল নোয়ি, ‘আপনার মনে নেই?’

‘না, নোয়ি, আমার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে তোমাকে খুঁজেছি আমি। আমার আত্মা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, নোয়ি।’

‘আমার লোকেরা আমাকে বলেছে এই কথা। কিন্তু বিশ্বাস করিনি আমি। এখন তো দেখছি, সবই সত্য! যাক, নিশ্চিত থাকুন। আমার জাতির লোকেরা এসেছে আমার সাথে। তারাই আপনার আত্মাকে ফিরিয়ে আনবে। তবে সেজন্য আপনাকে হয়তো একটু ঘুরতে হবে। এখন শান্ত হয়ে বসে ওদের কথা শুনুন।’

বসতে বসতে র্যাচেল বলল, ‘তোমাকে দেখতে পেয়েছি, নোয়ি, তাতেই আমার শান্তি ফিরে এসেছে।’

এবার রাজা মুখ খুলল। ‘দূত কোথায়? কাউকেই তো দেখছি না।’

জবাবে নোয়ি বলল, ‘এখুনি দেখবেন, রাজা।’

নোয়ির ইশারায় কয়েকজন “দানব” এগিয়ে গিয়ে পালকির পর্দা তুলে দিল। একই সাথে এগিয়ে গেল আরো ক’জন দানব। বাঁশ দিয়ে বানানো বড়সড় ছাতা খুলল তারা। জুলুরা আগে কখনো ছাতা দেখেনি।

রেগে গিয়ে রাজা প্রশ্ন করল, ‘এসব কী ধরনের অস্ত্র? জানো না, রাজার সামনে অস্ত্র নিয়ে হাজির হওয়া নিষেধ?’

‘এই অস্ত্র সূর্যের বিরুদ্ধে, রাজা, মানুষের বিরুদ্ধে নয়। আমার জাতির লোকেরা সূর্যের আলো অপছন্দ করে,’ বলল নোয়ি।

অবাক কণ্ঠে রাজা প্রশ্ন করল, ‘কেমন জাদুকর ওরা যে সূর্যের আলো অপছন্দ করে?’ এরপর থেমে গেল রাজা। কারণ প্রথম পালকি থেকে বের হয়ে আসছে একজন।

পালকি থেকে বের হওয়া মানুষটি ছোটখাট একজন লোক।

লম্বায় টেনেটুনে সর্বোচ্চ চার ফিট। গায়ের চামড়া একদম ফ্যাকাসে। লম্বা চুলগুলোও সব সাদা। তবে তার চোখ দুটো দেখার মত! প্যাঁচার মতো বড় বড় এবং গোল। আলোয় বের হয়ে চোখ পিটপিট করতে থাকল সে। নোয়ির মতো সে-ও সাদা রোব পরে আছে। যা হোক, পালকি থেকে বের হয়েছে সে। তার মাথার ওপর ছাতা ধরার জন্য লাফিয়ে সামনে বাড়ল এক ছাতাধারী দানব। কিন্তু তাড়াহুড়ায় পালকির গায়ে ধাক্কা মেরে বসল সে। অত বড় শরীরের ধাক্কায় পালকিটা নড়ে উঠে ধাক্কা দিল ফ্যাকাসে ত্বকের ছোট মানুষটিকে। প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সে। দানবটি তখন যথাসম্ভব সাবধানতার সাথে দ্রুত এগিয়ে তাকে ধরে ফেলল। এই কাজ করতে গিয়ে হাত থেকে ছাতাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে। সাথে সাথে হাত তুলে সূর্যের তীব্র আলো থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করল বামুন লোকটি।

এদিকে সেজদার ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে গেছে দানব। বারবার মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বিজাতীয় ভাষায় কী যেন বলে চলেছে সে। আচার আচরণে মনে হচ্ছে কৃত “অপরাধের” জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে। জবাবে রাগত স্বরে অদ্ভুত ভাষায় কী যেন বলল বামুন লোকটি। রাজার কানে সেই কথাগুলো শোনাল ফণা তোলা সাপের হিসহিসানির মতো।

ওদিকে ছোট্ট একটা বামুনের সামনে অমন দানবাকৃতির একটা মানুষ এভাবে মাথা নোয়াচ্ছে দেখে যারপরনাই বিস্মিত রাজা ডিনগান। তার দৃষ্টিতে “বামুনটাকে” মেরে ফেলার জন্য দানবের একটা চড়ই যথেষ্ট। রাজার বিস্ময় বাঁধ মানছে না। নোয়িকে সে প্রশ্ন করেই বসল যে, লোকটা কী বলছে। সে কি এই লোকটিকে মেরে ফেলতে হুকুম করছে?

জবাবে নোয়ি বলল, ‘না, রাজা। আমার জাতির লোকেরা রক্তপাত ঘণা করে। সৈন্যটিকে সে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে,

আগেও আরো অনেক অপরাধ করেছে সে। সেই কারণে সৈন্যটিকে অভিশাপ দিয়ে সে বলেছে, জীবন বৃক্ষ থেকে তার প্রাণের পত্রটি ঝরে গেছে। বাড়ির মুখ সে আর দেখতে পাবে না।’

‘তাহলে, ও কি মারা যাবে?’ প্রশ্ন করল ডিনগান।

‘অবশ্যই। যার ওপরই ভূত জাতির কারো অভিশাপ পড়ে, নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয়ে যায় সে। তদুপর, এই লোকটি আসলেই অপরাধী। এখানে আসার পথে সামান্য খাবারের জন্য নিজের এক সঙ্গীকে খুন করেছে সে।’

অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে রাজা বলল, ‘ভারি অদ্ভুত। তবে ওদের জানিয়ে দियो যে, আমার ওপর যেন কোন অভিশাপ না দেয়। অভিশাপ দিলে এত রক্ত ওরা দেখবে যা ওদের পুরো জাতিও কখনো দেখেনি।’

‘রাজা, এভাবে বলবেন না। ভূত জাতির মহান ব্যক্তিকে হুমকি দেয়া মারাত্মক বোকামি ছাড়া কিছু না। কারণ, যে ভাষা ওরা বোঝে না সেই ভাষার কথাও কেমন করে যেন ওরা বুঝে ফেলে,’ শান্ত স্বরে বলল নোয়ি।

‘ও-ও! ভুলে যাও কী বলেছি। ওদের জানাও, যে আমার সমস্যার জন্য ওদেরকে এতদূরে টেনে আনতে হওয়ায় আমি সত্যিই দুঃখিত।’

ওদিকে অন্য দুই পালকি থেকেও আরো দু’জন বামুন বেরিয়ে এসেছে। চেহারা সুরতে তিনজনকে আলাদা করার উপায় নেই। এমনকী পোশাকও এক। রাজার সামনে বিছানো পাটির ওপর রাজা ও কাউন্সিলের মুখোমুখি বসল তিনজন। তাদের দানবাকৃতির ভৃত্যরা বাম হাতে ছাতা ধরে আর ডান হাতে ডালপালার হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে থাকল তিনজনকে। ওদিকে রাজা বা তার ইন্দুনাদের প্রতি এই তিনজনের কোন মনোযোগ আছে বলে মনে হ’লো না। গভীর দৃষ্টিতে র্যাচেলকে

পর্যবেক্ষণ করল তারা। তারপর এক ভৃত্যকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল সর্বপ্রথমে পালকি থেকে নামা বামুন পুরোহিতটি। তখন এগিয়ে গেল আরেক ভৃত্য। গিয়ে ছাতা ধরল র্যাচেলের মাথার ওপর।

অদ্ভুত ঘটনাটা দেখে নোয়িকে প্রশ্ন করল ডিনগান, ‘এটা কী হলো? ইনকোসাজানা তো বাদুড় নয় যে, রোদ ভয় পাবে।’

‘গত কয়েক দিনে লেডির ওপর দিয়ে যে ঝড় ঝাপ্টা গেছে সেটা ভূত জাতির পুরোহিতরা বুঝতে পেরেছে। নানা দুর্ঘটনায় তার মন অসংলগ্ন ও রাগান্বিত হয়ে আছে। তাই পুরোহিতরা ওর মাথায় বৃক্ষজাতির জ্ঞানের ছায়া তুলে ধরেছেন যেন তার মন শান্ত হয়,’ বলল নোয়ি।

‘ইনকোসাজানার সাথে কী হয়েছে না হয়েছে সেটা এই লোক জনিল কেমন করে?’ প্রশ্ন করল ডিনগান।

জবাবে নীরবে একবার কাঁধ ঝাঁকল কেবল নোয়ি।

এক পুরোহিতের ইশারায় তাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে পলিশ করা কাঠের বাটি রাখল এক ভৃত্য। তারপর ছোট একটা মটকা থেকে পানি ঢেলে কানায় কানায় ভরে দিল বাটি তিনটা।

দৃশ্যটা দেখে খানিক অবাক হলো রাজা। তার অহমেও আঘাত লেগেছে। নোয়িকে সে বলল, ‘পুরোহিতেরা যদি তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে তো নিজেদের বয়ে আনা পানি খাওয়ার দরকার কী! আমি কি এতই গরীব যে ওদের তৃষ্ণা মেটাতে পারব না? ওই পানি ফেলে দিতে বলো। পুরোহিতদের জন্য ক্রিয়ার পরিবেশন করতে বলছি।’

‘এটা পানি নয়, রাজা। তাদের আত্ম জ্ঞানের জন্য সবসময়ই তৃষ্ণার্ত হলেও শরীর পিপাসার্ত নয়। ভোরের আলো ফোটার আগে বিশেষ এক গাছের পাতা থেকে সংগৃহীত শিশির। এই

শিশিরে তারা সত্যের প্রতিফলন দেখতে পায়।’

‘তাহলে তো বলতে হয়, ইনকোসাজানাও ওদের পরিবারেরই একজন। সাদা সর্দার ডোরিয়োর আগমনের দৃশ্যও সে পুলের পানিতেই দেখেছিল,’ বলল ডিনগান।

‘হয়তো তা-ই, হয়তো না, কে জানে। তবে সত্য যা-ই হোক, পুরোহিতেরা সেটা দেখতে পাবে,’ বলল নোয়ি।

ব্যস, নীরব হয়ে গেল চারদিক। লম্বা একটা সময় ধরে পিন-পতন নীরবতা বজায় রইল। সময়টা এতই লম্বা যে, নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হলো রাজা ও তার ইন্দুনারা। ওরা যেন অনুভব করছে, ওদের হৃৎপিণ্ডের শিরায় টোকা দিচ্ছে কেউ! তারপর একসময় মুখ তুলল তারা। তিনজন একই সাথে মাথা উঁচু করল। তারপর প্যাচার মতো বিরাট চোখ তুলে তিনজন তাকাল তাদের প্রত্যেকের দিকে। এবং অবাক কাণ্ড-একই সময়, একই সাথে, একই সুরে তিনজন তিনজনকে প্রশ্ন করল, ‘কী দেখেছ, পুরোহিত?’

মুখ খুলল পালকি থেকে সবার আগে নামা পুরোহিত। তার ভাষাটা এমন, যেন পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হিসহিসানো ভাষায় বলা কথাগুলো ভাষান্তর করে রাজাকে শোনাতে থাকল নোয়ি। পুরোহিত বলছে, ‘একটা ঝাঁড়ে টানা ঘর (ওয়াগন) দেখতে পাচ্ছি। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু’জন তরুণী। তাদের একজন কালো; সে তুমি, নোয়ি। আর অন্যজন শ্বেতাঙ্গ। সে ওইখানে বসা, জুলুরা যাকে বলে ইনকোসাজানা। তারা দু’জনেই বাতাসে ছুঁড়ে দিল তাদের মাথা থেকে তোলা একটা করে চুল। কালো চুলটা নীচে পড়ে গেল। কিন্তু সোনালীটি উড়ে চলল আরো ওপরে। কারণ সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা আত্মা, সেয়্যাপির আত্মা সে। তাকে হত্যা করেছে জুলুরা। চুলটাকে উড়িয়ে নিয়ে আরো উত্তরে বৃক্ষমাতার কাছে পৌঁছে দিল

সে। সেই সাথে দিল বিশেষ একটা বার্তা।’

এই কথায় সায় দিয়ে ইতিবাচকভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে একই সুরে বাকি দুই পুরোহিত বলল, ‘হ্যাঁ, চুলের সাথে বার্তাও দিয়েছে সেয়াপি।’

এরপর পাতা দিয়ে মুড়ে সুন্দরভাবে প্যাকেট করা ছোট একটা বাস্র বের করল এক পুরোহিত। নোয়িকে প্যাকেটটা নিতে ইশারা করে সে বলল, ‘এবার আমরা জানব, আসলেই এই শ্বেতাজিনীর অন্তর্দৃষ্টি আছে কি না। এটা তার হাতে দাও। দিয়ে জিজ্ঞেস করো কী আছে এর ভেতর?’

স্বপ্নহস্তের মতো হাত বাড়িয়ে দিল র্যাচেল। প্যাকেটটা হাতে নিল বটে কিন্তু ওটার দিকে না তাকিয়েই বলল, ‘এতে আছে অনেক অনেক পাতা। আর পাতাগুলোর নীচে রাখা আছে আমার মাথার একটা চুল। চুলটায় তিনটা গিঁঠ দেয়া আছে। তিনটা মহা বিপদের প্রতীক সেগুলো।’

এবার বামুন পুরোহিত নোয়িকে বলল, ‘খুলে দেখো।’

প্যাকেট খুলে দেখা গেল ঘটনা সত্য। র্যাচেলের চুলের সাথে মিলিয়ে দেখা গেল সেটা আসলেই ওর মাথার চুল। প্রথমে রাজাকে তারপর ইন্দুনাদের দেখানো হলো সেটা। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখল ওরা। কী বলবে বুঝতে পারছে না। সবাইকে দেখানোর পর প্যাকেটটা গুছিয়ে বামুন পুরোহিতের হাতে সেটা ফিরিয়ে দিল নোয়ি।

এরপর মাঝখানে বসে থাকা বামুন তার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী দেখলে তুমি, পুরোহিত?’

শিশির ভরা পাত্রের দিকে আরেকবার তাকিয়ে সে বলল, ‘এই জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি। এখানে রাজা ও তার ইন্দুনারা কথা বলছে এক শ্বেতাজ লোকের সাথে। লোকটার চেহারা বাজ পাখির মতো, তার দৃষ্টিতে ফুটে আছে স্পষ্ট ধূর্ততা। তারা এক

ধর্মপ্রচারক ও তার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসার মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করছে। একটা ঘরের ভেতর ওই ধর্মপ্রচারক ও তার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি। ওখানে জুলু সৈন্যরাও আছে। শয়তানি চোখওয়ালা শয়তান সাদা মানুষের প্ররোচনায় ধর্মপ্রচারককে হত্যা করল জুলুরা। অবশ্য বিছানায় পড়ে থেকেই মারা গেছে তার স্ত্রী। আর লোকটি নিজে মরার আগে একজন জুলুকে মেরে মরেছে। ধোঁয়া বের হওয়া লোহার লম্বা নল দিয়ে জুলুটাকে মেরেছে সে।’

গুণ্ডিয়ে উঠল ডিনগান। কিন্তু তার দিকে বামুন লোকটি বিন্দুমাত্র নজর দিল না। বরং তৃতীয় বামুনকে সে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কী দেখলে, পুরোহিত?’

তৃতীয় বামুন তখন বলল, ‘আমি দেখেছি, একটা কুঁড়ের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওখানে বসে থাকা শ্বেতাঙ্গ তরুণী। তবে তার আত্মা তাকে ছেড়ে গেছে। তার হাতে একটা বর্শা ধরা। আর নীচে দাঁড়িয়ে আছে সেই শয়তানি দৃষ্টিওয়ালা সাদা লোক। তবে তাকে ধরে ফেলেছে জুলুরা। ওদের হাতে বন্দি হয়ে আছে সে। মেয়েটির মন পড়তে পারছি আমি। সে বলছে, রক্তপাত হয়েছে।’ বলতে বলতে একবার কেঁপে উঠল লোকটি। ‘ইনকোসাজানার নিষেধ সত্ত্বেও রক্তপাত করেছে জুলু জাতি। তাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনছে সে। হ্যাঁ, সেগুলোও দেখতে পাচ্ছি। আগুন লেগে মারা গেছে অনেক, অনেক লোক। রেগে থাকা এক নদী খেয়ে ফেলেছে অনেককে। ‘উপকূল’ এলাকা থেকে পঙ্গপালের দল ডেকে আনল ইনকোসাজানার রাগান্বিত আত্মা। সেগুলোর হাতে হাত ধরে এল দুর্ভোগ। প্লেগ ছড়িয়ে পড়ছে গবাদি পশুর পালে। আর দেখতে পাচ্ছি একটা অস্পষ্ট ভৌতিক স্বপ্ন। এ দেশের ওপর আরো দুর্ভাগ্য টেনে আনছে সে। উড়ে আসছে শীতের এলাকার ওপর দিয়ে। তার মাথাটা একটা কঙ্কালের খুলির মতো। তার নাম দুর্ভিক্ষ।’

এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল বামুন পুরোহিত। তারপর তিন পুরোহিত একসাথে ঝুঁকল, একসাথে তুলে নিল শিশিরের পানি ভরা পাত্র তিনটা। পাত্রগুলোর পানি মাটিতে ফেলে দিতে দিতে তিনজন একত্রে বলে উঠল, ‘খাও, মাটি, পানি খাও। আর আমাদের দেখা দৃশ্যগুলোর স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখো তোমার ভেতর।’

খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ডিনগানের ইন্দুনারা। কারণ জাদুকর তাদেরও আছে। কিন্তু এভাবে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়ার মতো জাদু তাদের কারোই জানা নেই। ফলে ভয়ও পেয়েছে তারা।

ওদিকে মাথা নিচু করে বসে আছে ডিনগান। হঠাৎ মাথা তুলে, রুম্ব হাসিতে ফেটে পড়ল সে। বামুন পুরোহিতদের বলল, ‘কেশ কলা-কৌশল জানো তোমরা, ছোট্ট মানুষ। তোমাদের দানবাকৃতির মানুষ, পালকি, ডালপালা আর পানির পাত্র দিয়ে ভালই খেল দেখালে। কথাটা এই জন্য বলেছি যে, নোয়ি অথবা অন্য যে কারো কাছ থেকে এসব জেনে নিতে পারো তোমরা। এখন, তোমরা যদি সত্যিই জাদুকর হও তাহলে ইনকোসাজানার ধাঁধার অর্থ শোনাও আমাদের। তোমাদের পানির পাত্রে দেখাও তার মনের কথা। নয়তো, আর দশটা প্রতারকের ভাগ্যে যা জোটে অর্থাৎ লাখি, চড়-চাপড়; পাওনা হিসেবে ওগুলোই পরিশোধ করে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে তোমাদের। আর হ্যাঁ, তোমাদের কার কী নাম সেটা জানাও।’

রাজার কথা ওদেরকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিল নোয়ি। সাথে সাথে এক ছাতার নীচে চলে এল তিনজনে। স্থানিক পরামর্শ করে আগের জায়গায় ফিরে গেল তারা। তারপর মুখ খুলল একজন। এ সেই বামুন যে পালকি থেকে নেমে তার সৈন্যকে অভিশাপ দিয়েছিল। সে বলল, ‘আমার নাম এডো, আমার ডানে বসা

পুরোহিতের নাম পানি আর বামের পুরোহিতের নাম হানা। আমরা বৃক্ষজাতির সন্তান। এই জাতির অপর দুটি নাম ধূসর জাতি ও ভূত জাতি। এই জাতির উচ্চস্থানীয় পুরোহিত আমরা। আমাজুলুদের মতো বর্ষার শক্তিতে নয়, আমরা রাজ্য শাসন করি “স্বপ্ন” আর “দৃশ্য” দেখে পাওয়া জ্ঞানের আলো দিয়ে। আমরা ভূতের রাজা, আমাদের এমনকী ভূতেরাও মান্য করে। আমরা মৃতদের প্রভু, মানুষের মন পড়তে পারায় দক্ষ। এসবই হচ্ছে আমাদের নাম, উপাধি ও পরিচয়, জুলু রাজা। আমরা এখানে এসেছি কারণ আমাদের রক্তের এক মেয়েকে দিয়ে বৃক্ষমাতার কানে অদ্ধুত একটা গল্প পাঠিয়েছেন আপনি। এমন একজনের গল্প বলে পাঠিয়েছেন যার সম্বন্ধে আগে থেকেই আমরা জানতাম। তবে চোখে দেখার কৌতূহল ছিল,’ বলতে বলতে তিনজনই বাউ করল র্যাচেলকে। ‘আর আমরা অবশ্যই আপনার ধাঁধার জবাব দেব। কিন্তু তার আগে আমাদের পারিশ্রমিক ঠিক করা হোক।’

‘কী চাও তোমরা, ভূত জাতির লোক? দেখতেই পাচ্ছ গবাদি পশু এখন আমাদের নেই বললেই চলে। আর তোমাদের দেখেই মনে হচ্ছে, নারী জাতির প্রতি তোমাদের কোন আগ্রহ নেই। তাহলে কী চাও তোমরা? কী দিতে পারি তোমাদের?’ প্রশ্ন করল ডিনগান।

লম্বা নখওয়ালা আঙুল তুলে র্যাচেলকে দেখিয়ে এডো বলল, ‘ওই যে বসে আছে সাদা লেডি, তাকেই আমরা চাই। তার আত্মা ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে বাস করছে। এখন আমরা চাই তার শরীরটাকে নিয়ে গিয়ে আত্মার কাছে পৌঁছে দিতে যাতে আবার একত্রিত হতে পারে তারা।’

প্রতিবাদী গুঞ্জন উঠল ইন্দুনাদের ভেতর। কিন্তু রাজা বলল, ‘একসময় আমরাও চেয়েছি, ইনকোসাজানা যার ভেতর বাস করে তাকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে। কিন্তু সব ওলটপালট

হয়ে গেছে। সৌভাগ্যের বদলে অভিশাপ বয়ে এনেছে সে। যদি শরীর আর আত্মা আবার একত্রিত হয়, তাহলে আমাদের মাথার ওপর ঝুলে থাকা অভিশাপ হয়তো উঠে যাবে। কিন্তু তারপরও, স্বেচ্ছায় তার নিজের মুখনিঃসৃত সম্মতি ছাড়া তাকে কারো হাতে সোপর্দ করা আমার দ্বারা সম্ভব না। তদুপরি, আগে ওই ধাঁধার জবাব দাও, তারপর পাওনা পরিশোধের প্রশ্ন। ন্যায্য বলেছি?’

‘পুরোপুরি ন্যায্য। বলুন, রাজা, কী জানতে চান। আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করব,’ বলল এডো।

এবার রাজা যাকে ডাকল দেখা গেল তার একটা হাত পোড়া। বলা বাহুল্য, সে হচ্ছে মোপো। রাজার কাছেই বসা সে। সবই সে খেয়াল করছিল এতক্ষণ, কিন্তু নিজ থেকে কিছুই বলছিল না। রাজা তাকে বলল, ‘সামনে এসো, মোপো। শোনাও তোমার গল্প।’

কাজেই উঠে দাঁড়াল মোপো। বলল যে, জুলু জাতির ইতিহাসে কেবল মাত্র সেই দেখেছে ইনকোসাজানা-ই-জুলাকে। তা-ও “মহান কালো রাজা, যে চলে গেছে” তার আমলে। কীভাবে দেখেছে সেটাও বলল (নাড়া দ্য লিলি দ্রষ্টব্য)। তারপর বলল খেতান্স তরুণী র্যাচেলের সম্বন্ধে ইবুবেসির বলা গল্পের কথা। নিজের আত্মার শক্তির পরিচয় দিয়ে লুকিয়ে রাখা নোয়িকে মুহূর্তে খুঁজে বের করে ফেলার ঘটনা, জুলুদের সমস্যার কথা ইনকোসাজানার সন্মানে তুলে ধরার কথা আর বলল উদ্ধার কথার কথা, যেটা এই জায়গার ওপর এসে নেই হয়ে গেছে। এটারও কোন অর্থ কেউ বলতে পারেনি। এরপর জুলুদেরকে র্যাচেল যে জবাব দিয়েছিল সেটাও পুরোহিতদের হুবহু শোনাল মোপো। এবং নিজের বক্তব্যের সাথে নতুন কিছু যুক্ত বা বিযুক্ত করতে ইনকোসাজানার অস্বীকৃতির কথা বলতেও ভুলল না।

মোপো থামার পর চোখ খুলে পিটপিট করে তাকাল তিন

বামুন পুরোহিত। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা। পুরোহিত এডো বলল, ‘রাজার মুখ হয়ে কথা বলা মাকেদামার সন্তান মোপো বা উমবোপো, কোন সন্দেহ নেই দুয়েকটা কথা বলতে ভুলে গেছ তুমি। সেদিন তোমার মুখের ওপর রোব ফেলে কানে কানে কিছু একটা বলেছিল ইনকোসাজানা। সেটা মনে হয় তুমি ভুলেই গেছ। কেন সেই কথা বললে না, রাজার মুখ?’

দাঁত কিড়মিড় করে কটমটিয়ে এডোর দিকে তাকাল মোপো। বলল, ‘এই গল্পের সাথে ওই ঘটনার কোন যোগ নেই। সেটা ছিল আমার মৃত্যু নিয়ে বলা কথা। ওসবের প্রতি আপনাদের গুরুত্ব না দিলেও চলবে।’

তিন পুরোহিত পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর তিনজনই তিনজনকে বলল, ‘শুনে রাখো, পুরোহিতরা, মোপো বলছে, ওই কথাগুলো ছিল তার নিজের মৃত্যু নিয়ে। এই গল্পের সাথে নাকি ওই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই,’ বলে মৃদু হেসে আবার চোখ মুদল তিনজনই। মনে হতে লাগল আবার বুঝি ঘুমের ঘোরে চলে গেছে তারা।

মোপোর বলা শেষ। ইন্দুনাদের কাউন্সিলের ভেতর চলে গেল সে। নেকড়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুরোহিতদের দিকে।

রাজা বলল, ‘আমার ইন্দুনার কথা শুনেছ তোমরা। এখন সত্যিই যদি তোমরা জ্ঞানী হও তাহলে ইনকোসাজানার বক্তব্য আর আমার মাথার ওপর তারা ভেঙে পড়ার অর্থ কী তা বুঝো।’

মাথা তুলল তিন পুরোহিত। পরস্পরের সাথে পরামর্শ করল মুহূর্তখানেক। তারপর মুখ খুল এডো। বলল, ‘এই মাথা এমনকী আমাদের জন্যও বেশ কঠিন।’

হা হা করে উপহাসের হাসি হাসল ডিনগান। তারপর রাগত স্বরে বলল, ‘তা-ই ভেবেছিলাম আমি, তা-ই ভেবেছিলাম। আর দশটা সাধারণ ওঝার মতো তোমরাও চারদিক থেকে ছয়টা গল্প

শোনো, তারপর দশদিকে বলে বেড়াও সেই কথাগুলোই। ভাব দেখাও যেন স্বর্গ থেকে বিরাট কোন সংবাদ আবিষ্কার করেছ। বলো তাহলে, চাবকে তোমাদের রক্তাক্ত করে আমার টাউন থেকে বের করে দেব না কেন?’

রক্তের কথা শুনে একটু কেঁপে উঠল পুরোহিতরা। তবে তারপরই হেসে উঠল এডো। অসুস্থ, অস্বস্তিকর ও ভয়ানক হাসি ফুটল তার মুখে। রাজাকে সে জবাব দিল, ‘একটু নরম হোন, রাজা, দয়া করে ভদ্র আচরণ করুন। আমরা তো ক’জন গরীব প্রতারক ছাড়া কিছু না। তবে আপনার ধাঁধার জবাব দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করব আমরা। বা বলতে পারেন চেষ্টা করবে আমাদের আরেকজন, চতুর্থজন। রাজার জন্য নতুন বোল আনো, বড় বোল। লাল রাজার জন্য লাল বোল। শিশির ঢেলে কানায় কানায় পূরণ করে দাও সেটা।’

পুরোহিতের কথা শুনে এগিয়ে এল এক ভৃত্য। তার কাঁধে বিরাট এক মটকা আর হাতে পলিশ করা লাল কাঠের বেশ বড় একটা চকচকে বোল। সেটাকে হাতে তুলে নিল এডো। অপর এক গার্ড শিশিরের পানি ঢেলে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল পাত্রটা। তিন মাথা এক হয়ে পানিটার দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ল তিন পুরোহিত। তারপর নোয়িকে বলল বোলটা ইনকোসাজানার সামনে নিয়ে যেতে। এডো বলল যে, ‘পানিটায় ইনকোসাজানা কিছু দেখতে পায় কিনা দেখো।’

শিশির ভরা বোলটা হাতে নিল র্যাচেল। প্রথমে ওর চেহারা নির্বিকারই থাকল। শূন্য দৃষ্টিতে পানিতে তাকিয়ে সুইল ও। কিন্তু তারপর থেকেই একের পর এক ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল ওর চেহারায়। দ্রুত নড়তে শুরু করল চোখ দুটো। তারপরই চেহারায় ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ।

পুরোহিত এডো প্রশ্ন করল, ‘কিছু দেখছেন, লেডি?’

‘হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এসব কি আমার বলতেই হবে?’

‘না, না। পানির ওপর তিনবার শ্বাস নিন। ভালভাবে দেখার চেষ্টা করুন, লেডি। দেখা হলে বোলটা তুলে দিন রাজার হাতে। হয়তো সে-ও কিছু দেখতে পাবে।’

শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় র্যাচেলকে দেখাল ঘোর লাগা মানুষের মতো। রাজার হাঁটুর ওপর শিশির ভরা বোলটা রেখে এসে নিজের টুলে বসে পড়ল র্যাচেল।

এডো বলে উঠল, ‘তাকান, রাজা, দেখুন। ওই পানিতেই দেখতে পাবেন ইনকোসাজানার ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ।’

এমন রাগত দৃষ্টিতে বোলের পানির দিকে রাজা তাকাল যে, দর্শকমাত্রই মনে করবে জাদুকরদের নোংরা কোন কৌশল ধরেই ফেলেছে রাজা। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চেহারার পরিবর্তন এল। বলল, ‘কালো রাজার মাথার শপথ, দেখতে পাচ্ছি সাদা আর কালো লোকেরা লড়াই করছে এই ক্রালে! লড়াইয়ে জিতছে জুলুরা। হ্যাঁ, জুলুরা জিতে গেল। আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। আমরাই জিতব। এটাই ইনকোসাজানার ধাঁধার জবাব,’ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল রাজা ডিনগান। উল্লাস করে উঠল ইন্দুনারাও।

হাসি ফুটল এডোর ঠোঁটেও। সে বলল, ‘আরেকবার দেখুন, রাজা।’

বোলের পানির দিকে তাকিয়ে কালো হয়ে গেল রাজার মুখ। সে বলল, ‘আগুন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আগুন লেগেছে এই ক্রালে। আগুনে জ্বলছে উমণ্ডনগুদ্রলোভু, আমার রাজ্যীয় ক্রালে আগুন লেগে গেছে, সাদা লোকেরা আগুন দিচ্ছে এখানে। ঘোড়ায় চেপে চলে গেল তারা,’ বলে মুখ তুলল রাজা।

‘আবার দেখুন, রাজা, বলুন কী দেখছেন,’ আবারও বলল এডো।

অনিচ্ছুকভাবে কিন্তু অনেকটা যেন বাধ্য হয়ে আবার পানির

দিকে তাকাল ডিনগান। বলল, ‘একটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের চূড়ার আকৃতি বসে থাকা নারীমূর্তির মতো। তার ভাঁজ করা দুই হাঁটুর মাঝে একটা গুহার মুখ দেখছি। ওই গুহার মেঝেতে নিখর পড়ে আছে দুটো দেহ। একটা মেয়েকে দেখছি। খুবই সুন্দরী সে। আর অপর দেহটি বড়সড় একজন লোকের।’

রাজার এই কথাটা শুনে মুখ তুলে তাকাল মোপো। কিন্তু কেউ লক্ষ করার আগেই দ্রুত আবার দৃষ্টি নামিয়েও নিল। ‘এই ঘটনা অবশ্য তিন পুরোহিত আর নোয়ি ছাড়া আর কেউ খেয়াল করল না। ওদিকে রাজা বলে চলেছে, ‘গুহা থেকে বের হয়ে এল মোটা একজন লোক। একে খুব ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অভুক্ত অবস্থায় অনেক দিন কাটিয়েছে সে। না, না, লোকটা আহত। দু’জন যোদ্ধা এসে ধরল তাকে। তাদের একজন বলশালী, কাম্বা চওড়া লোক। আর অপরজন অপেক্ষাকৃত খাটো। মোটা লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গেল ওরা। ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে। তবে ওদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোর চেহারার সামনে কেমন একটা ঘোলাটে পর্দা পড়ে আছে তাই ওদের চেহারাও দেখতে পাচ্ছি না। মোটা মানুষটির চেহারাও কুয়াশায় আবৃত। মোটা মানুষটিকে টেনে কিনারায় নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওখান থেকে নীচে ফেলে দিল ওরা। আহ! ওই তো কুয়াশা সরে গেছে, আরেহ! ওটা তো আমার চেহারা, মোটা মানুষটি আমি!’

পিন-পতন নীরবতা নেমে এল চারদিকে।

তিন পুরোহিত পরস্পরকে ডেকে বলল, ‘পুরোহিত, রাজা বলল, নিজের চেহারা দেখেছে সে। তাহলে কি ইনকোসাজানার মুখনিঃসৃত বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে? রাজা কি তাহলে সত্যিই ক্লিফ থেকে পড়ে মরবে? রাজার মাথার ওপর তারা ভেঙে পড়ার অর্থ কি এ-ই?’

তিন পুরোহিত সম্মতিসূচকভাবে ওপর-নীচ মাথা দুলিয়ে স্মিত হাসল একবার।

কিন্তু রাজার মুখের হাসি মুছে গেছে। প্রচণ্ড রাগে পাগল হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাথে উঠে দাঁড়াল ইন্দুনা আর তার কাউন্সিলের ওঝারাও। তবে বসেই রইল মাকেদামার পুত্র মোপো। তার দৃষ্টি মাটির দিকে। ওদিকে ডিনগান লাফিয়ে ওঠায় তার কোলের ওপর রাখা লাল বোলটার সমস্ত পানি গিয়ে পড়ল তার সামনে বসে থাকা র্যাচেলের গায়ে। দাঁড়িয়ে পুরোহিতদের গালিগালাজ করতে থাকল রাজা। ‘হুকুম করল’, এই মুহূর্তে তাদেরকে জুলুল্যাণ্ডের মাটি ত্যাগ করতে। বারংবার অভিশাপ দিল ওদের, হুমকির পর হুমকি দিল।

রাজার রাগ পড়ে গিয়ে ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসেই রইল তিন পুরোহিত। রাজার মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পর এডো বলল, ‘গাছের পাতা থেকে নেয়া শিশির সাদা লেডির গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছে মহান রাজা। তাহলে এই নারী তো এখন বৃক্ষজাতির অধিকারে যাবে, তাই না, পুরোহিতরা?’

হেসে ফেলে মাথা নুইয়ে সম্মতি দিল বাকি দুই বামুন পুরোহিত। উঠে দাঁড়াল পুরোহিত এডো। এবং যখন সে মুখ খুলল তার কণ্ঠে ফুটে উঠল নতুন সুর। হুকুমের ভঙ্গিতে দৃষ্ট, কঠোর স্বরে সে বলল, ‘শোনো সবাই। অনেক, অনেক রক্ত ঝরিয়েছে তোমাদের রাজা। তবে জেনে রেখো, তোমাদের রাজা রক্তের সমুদ্রে ছোট্ট একটা বুদবুদের চেয়ে বড় কিছু না। খুনিই খুন হবে। বর্ষা নিষ্ফলকারীর দিকেই ফিরবে বর্ষার ফলা। প্রাণহীন পাথুরে দেয়াল যেমন প্রার্থনার জবাব দিতে পারে না, তেমনি নিষ্ফল হবে তার সমস্ত প্রার্থনা। যার হাতের মেরামত পড়বে, সে...’

মাঝখানে কথা বলল ছাত্রের নীচে বসে থাকা অপর দুই বামুন পুরোহিত। তারা বলল, ‘হত্যাকারীর মুখ কুয়াশায় ঢাকা ছিল,

পুরোহিত এডো।’

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে এডো বলে চলল, ‘হ্যাঁ, কুয়াশায় মুখ ঢাকা হত্যাকারীর হাতেই মারা পড়বে মৃত্যুর সওদাগর এই রাজা। এটাই সত্য, এটাই যথার্থ। বৃক্ষমাতার ডিক্রি অনুসারে আপনার ধাঁধার জবাব দেয়া হয়েছে, আমাজুলুদের রাজা। যথাসময়ে এসব ঘটনা ঘটবে। এখন আপনার এই দরিদ্র ভৃত্যদেরকে তাদের মজুরী হিসেবে ওই সাদা লেডিকে বুঝিয়ে দিন। আমরা এই দেশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তার আত্মা, তার মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম ইতিমধ্যেই শিশিরের পানিতে আপনাকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।’

রীতিমতো হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গিতে ডিনগান বলল, ‘নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। জুলুল্যাণ্ডের জন্য খারাপ ছাড়া ভাল কিছু আনেনি নৈমিষি আর এই শ্বেতাস্ত্র মেয়ে।’

কিছু আপত্তি করল কাউন্সিলের এক ইন্দুনা। বলল, ‘ইনকোসাজানার নিজের সম্মতি ছাড়া তাকে জাদুকরদের হাতে কীভাবে তুলে দেবেন রাজা?’

তখন এক পুরোহিতের ইশারায় এগিয়ে গেল নোয়ি। র্যাচেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল। তারপর র্যাচেল বলল, ‘নোয়ি যেখানে যাবে, সেখানেই যাব আমি।’ কাজেই র্যাচেলের হাতে ধরে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল নোয়ি। ওদের পেছনে গেল তিন বামুন পুরোহিত আর সবশেষে তাদের প্রহরীরা।

র্যাচেল ফটকে পৌঁছুতেই রাজার কাউন্সিলের সবাই উঠে দাঁড়াল। শেষ বারের মতো রাজকীয় স্যালুট বুঝতে দিল তাকে। তবে রাজা উঠল না। বসেই রইল সে। বামুন কিল মারল মাটির ওপর।

এভাবেই জুলুদের কাছ থেকে, রাজার কাছ থেকে, রাজকীয়

বাসস্থল থেকে বিদায় নিল তাদের ইনকোসাজানা-ই-জুলা।
ওদিকে পোড়া হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে রইল মোপো।
আফসোসভরে ইনকোসাজানার চলে যাওয়া দেখল সে।

উনিশ

পুরোহিত-ত্রয় ও নোয়ির সাথে উত্তরমুখী যাত্রা শুরু হলো
র্যাচেলের। অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে ওরা। বেশিরভাগ সময়
সফর করছে রাতে। কারণ বৃক্ষজাতির লোকেরা সূর্যের আলো
অপছন্দ করে। পারতপক্ষে দিনের আলোয় চলাফেরা এড়িয়ে চলে
ওরা।

র্যাচেল কখনো কখনো নোয়ির সাথে পালকিতে চড়ে বটে।
কিন্তু হাঁটাই ওর বেশি পছন্দ। অবাক কাণ্ড হচ্ছে, কীভাবে যেন
ওর ভেতর প্রচণ্ড শক্তি চলে এসেছে। এই যে দিনের পর দিন,
সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক নাগাড়ে হেঁটে চলেছে, তাতে একটুও
ক্লান্ত হচ্ছে না র্যাচেল। এমনকী জলাভূমি এলাকায় যেখানে
পুরোহিতদের দানবাকৃতির সৈনিকগুলোও জ্বরে আক্রান্ত হলো
সেখানেও র্যাচেলের কিছুই হলো না।

মনে হচ্ছে, নোয়ির উপস্থিতি ও শারীরিক পরিশ্রম, দুটোই ওর
অশান্ত মানসিক অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে
তারপরও মাঝে মাঝেই পাগলামি পেয়ে বসে ওকে। তখন হঠাৎ
করেই পিলে চমকানো হা হা শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ে র্যাচেল।

এই অট্টহাসি শুনেই ভয়ে কাঁপত জুলুরা। এমনটা হলে পালকি থেকে নেমে আসে পুরোহিত এডো। র্যাচেলের কপালে হাত রেখে কী যেন করে সে। শান্ত হয়ে যায় র্যাচেল, ঘুমিয়ে পড়ে। তবে এই বিশেষ ঘুমের ঘোরে থাকাবস্থায় কোন প্রশ্ন করলে স্বাভাবিকভাবেই তার জবাব দেয় ও। এভাবেই নোয়ির অনুপস্থিতির সময় কী কী ঘটেছিল তার সঠিক তথ্য জোগাড় করেছে নোয়ি। যদিও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছে জুলুরা। নোয়ির কাছে রিচার্ড ড্যারিয়েনের গল্পও বলেছে র্যাচেল। ওকে পাওয়া, তারপর জানোয়ার ইসমাইলের হাতে নিজের পরিশার ও সবশেষে রিচার্ডের মৃত্যুর ঘটনাটাই যে র্যাচেলের অপ্রকৃতিস্থতার মূল কারণ তা বুঝতে নোয়ির আর বাকি রইল না।

বর্তমানের ঘটনা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে খুব খুশি নোয়ি। কারণ র্যাচেলের উন্মাদনা যদি কেউ সারাতে পারে তো তারা হচ্ছে এই বৃক্ষজাতির লোক। খুব ভাল চিকিৎসক ওরা। তাছাড়া র্যাচেলের যা মানসিক অবস্থা, তাতে সাদা বা কালো কেউই ওকে নিজেদের কাছে রাখবে না। আর রাখলেও আমৃত্যু বন্দি করে রাখবে। কাজেই বর্তমানের ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

র্যাচেলকে নিয়ে আগের মতো আবার একা থাকতে চায় নোয়ি। যেখানে কোন পুরোহিতের নজরদারি, ষড়যন্ত্র বা অন্য কোন ঝামেলা থাকবে না। তা না হলে অন্তত পুরোহিত এডোর আওতার বাইরে যেতে চায় নোয়ি। কারণ নোয়ি খেয়াল করেছে, র্যাচেলের ওপর ওর উপস্থিতির ইতিবাচক প্রভাবটাকে ভাল চোখে দেখছে না এডো। সে চায় র্যাচেলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। যাতে ওকে নিজের কাজে লাগাতে পারে প্রথম থেকেই এ-ই চেয়েছে এডো। সেই কারণেই ইনকোসাজানার নাম শুনে বনের ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে লোকারণ্যে এসেছে এই পুরোহিত। তাছাড়া

নিজের জাদু ক্ষমতা দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে এডো। সে চায় ওসব নিজের কাজে লাগাতে। ফলে র্যাচেলকে নিয়ে দিনে দিনে উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠছে নোয়ি।

আরো একটা ঘটনা আছে। বৃক্ষমাতা যাকে বলা হয়, সে নোয়ির বাবার বোন হওয়ার সূত্রে ওর আন্টি হয়। তার নাম নায়া। তবে খুব অল্প সময় ওদের সাথে থাকার কারণে আত্মীয়তার ব্যাপারটা নিয়ে পুরোপুরি খোঁজখবর করেনি বা করতে পারেনি নোয়ি। তবে ঘটনা হচ্ছে বৃক্ষমাতা হিসেবে এই মহিলাটিকে মোটেও পছন্দ করে না এডো। ভেতরে ভেতরে সে পরিকল্পনা করছে বৃক্ষমাতার “বৃক্ষ” মরে গেলে নিজের অনুগত কাউকে শাসকের আসনে বসাবে। সম্ভবত তার ইচ্ছা, র্যাচেলকে ওই আসনে বসানো। কারণ এডোর ধারণা, অপ্রকৃতিস্থ হওয়ায় তার হুকুম বিনা প্রশ্নে পালন করবে র্যাচেল।

এসব জানার কারণে খুব সাবধানে থাকে নোয়ি। উপরন্তু, কেবল এডোই নয় তার দুই সঙ্গী পানি আর হানাও অনায়াসে মানুষের মনের কথা পড়তে পারে। তা সে যে ভাষাতেই কথা বলুক। র্যাচেলকে যথাসম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করে নোয়ি। পারতপক্ষে র্যাচেলের পাশ ছেড়ে কোথাও যায় না। কারণ ওর ভয়, জাদুক্ষমতা প্রয়োগ করে র্যাচেলের মনের বা ইচ্ছাশক্তির দখল নিয়ে নিতে পারে ওরা। র্যাচেলের পাগলামি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলেই কেবল এডোকে র্যাচেলের কপালে হাত রাখতে দেয় নোয়ি। অন্য কাউকে ভুলেও ডাকে না ও।

যা হোক উত্তরমুখী পথ ধরে চলেছে ওরা। জুলুদের এলাকা পার হলো। ওই এলাকার বাসিন্দারা খুব ভাল করেই জানে যে, জুলুরা ইনকোসাজানার প্রিয় মানুষদের রক্ত স্রবিরেছে। তাই রেগে গিয়ে পুরো জুলুল্যাণ্ডের ওপর পঙ্গপাল আর মড়কের অভিশাপ টেনে এনেছে ইনকোসাজানা। তাই তাকে ভীষণ ভয় পায় ওরা।

উপরন্তু তার সাথে আছে ধূসর গাত্রবর্ণের পুরোহিত, যারা এমনকী মহাশক্তিধর রাজা ডিনগানকেও কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছে। তাই ওরা ধরে নিয়েছে এই কাফেলার সামনে পড়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। ফলে যেদিক দিয়েই নোয়িরা গেছে, এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে লোকজন। বসতিতে হয়তো রয়ে গেছে অতি বৃদ্ধ দুয়েকজন। অবশ্য তারা রয়েছে চলৎশক্তিহীন বলেই। অভিশাপ তুলে নেয়ার প্রার্থনা নিয়ে নিজেদের যৎসামান্য যাঁ আছে উপহার হিসেবে তা-ই নিয়ে এসেছে অতি দুঃসাহসী দুয়েকজন। কিন্তু ওসব শোনার মতো মানসিক সুস্থতা ইনকোসাজানার এখন আর নেই।

জুলুল্যাণ্ডের পর শুরু হলো অন্যান্য গোত্রের এলাকা। তাদের বেশির ভাগই বন্য ও যাযাবর। তবে তারাও বৃক্ষজাতির লোকদের ক্ষমতায় ভয় পায়। কাজেই উত্তরগামী এই কাফেলার ওপর কোন ধরনের ঝামেলা এল না। বরং দুয়েকবার ওই সমস্ত জাতির ওঝারাই এল পুরোহিতদের সাহায্য চাইতে। যাদেরকে পছন্দ হলো তাদের জন্য ছোট্ট শিশির পাত্রের দিকে তাকাল পুরোহিতরা, সমাধান দিল তাদের। বাকিদেরকে ফিরিয়ে দিল। অবশ্য পুরোহিতদের আনা শিশিরের সরবরাহ কমে গেছে। ফলে যা আছে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে বলেও সাহায্য প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো ওরা।

এরপর জলাভূমির দেশে প্রবেশ করল র্যাচেলরা। এখানে চারদিকে ছড়িয়ে আছে রোগ-জীবাণুর বীজ। জলাভূমির আঁকে-বাঁকে লুকিয়ে আছে কুমীর আর বিষাক্ত সাপ। তবে এসব থেকে ওদের কোন বিপদ হলো না। কারণ, অসুখ-বিসুখের প্রতিষেধক পুরোহিতদের কাছে আগে থেকেই ছিল। আর অন্যান্য বিপদের জন্য যাদু ও তন্ত্র-মন্ত্রের সহায়তা নিল ওরা। উপরন্তু, কোন পথে যেতে হবে সেটা শিশির পাত্র দেখে আগে থেকেই ঠিক করা

থাকছে। ফলে সবচেয়ে সহজ পথটা ধরেই এগুচ্ছে ওরা। এখন পর্যন্ত এই দলের একজন মাত্র মানুষ মারা গেছে। সে হচ্ছে ডিনগানের ক্রালে থাকতে এডোর অভিশাপপ্রাপ্ত দাস। ওই দিনের পর থেকে ক্রমাগত শুকিয়েই চলেছিল সে। শেষে গিয়ে দেখতে হয়েছিল ঠিক একটা কঙ্কালের মতো। একদিন দেখা গেল প্রাণবায়ু ত্যাগ করেছে সে।

সেদিন অন্য ভৃত্যদের ডেকে মৃতদেহটা দেখিয়ে এডো বলল, ‘দেখ্ সবাই, কী বলেছিলাম আমি? বলেছিলাম বাড়ির মুখ দেখবে না ও। তা-ই হয়েছে। কাজেই যারা ভাবিস মানুষের শক্তি তার শরীর আর বর্শায়, তারা সাবধান হয়ে যা!’

তখন তীব্র বাতাসের মুখে পড়া নলখাগড়ার মতো কাঁপতে থাকল ভৃত্যরা। কুমীরের খাবার হবার জন্য মৃতদেহটা জলায় ফেলে দিতে নির্দেশ দিল এডো।

জলাভূমির পর ঘেসো জমির এলাকায় প্রবেশ করল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পরই দেখা দিল টিলা আর পাহাড়। এখানে প্রচুর সিংহের বাস। তবে পুরোহিতরা ওগুলোকে মোটেও ভয় পেল না। কখনো সিংহের দল বেশি কাছিয়ে এলে বা বেশি বিরক্ত করলে হরিণের মাংসে বিষ প্রয়োগ করে সেগুলো ফেলে রাখা হলো। বিষ মেশানো মাংস খেয়ে প্রচুর সিংহ মারা পড়ল তখন।

এরপরই এল সমতল ভূমি। র্যাচেল যখন কিছু শোনার অবস্থায় এল তখন ওকে নোয়ি জানাল যে, এখান থেকেই শুরু বৃক্ষজাতির লোকদের দেশ। এখানেই বাস করে বিশালদেহী লোকেরা। ওদেরই কিছু অধিবাসীকে পুরোহিতদের সৈন্য ও ভৃত্য হিসেবে ইতিমধ্যেই র্যাচেল দেখেছে। এরা সবাই বৃক্ষজাতির দাস। এই গোত্রের লোকদের নাম “উমকুলু” অর্থাৎ বিশালদেহী। এদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ। যদিও এরা দানবীয় শরীরের অধিকারী কিন্তু আদপে এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

কেউ আক্রমণ না করলে আগ বাড়িয়ে কারো সাথে লড়াই ঝগড়া বাধায় না ওরা। উমকুলুরা মূলত বাস করে পাহাড়ি গুহায়। শত্রুর আক্রমণ বা ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় মুহূর্তেই ওই গুহাগুলোকে অভেদ্য দুর্গ বানিয়ে ফেলা সম্ভব। ফলে ওদের আবাস বেশ নিরাপদ বলা চলে। এদেরকে শাসন করে বৃক্ষজাতির প্রধান-বৃক্ষমাতা। উমকুলুদের আরেকটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বৃক্ষজাতির হয়ে গাছপালার তত্ত্বাবধান করা ও তাদের জন্য খাদ্য সংস্থান করা। কারণ কাজকর্ম করে অনু বস্ত্র সংস্থান করার দিকে কোন মনোযোগ নেই বৃক্ষজাতির মানুষদের। “দৃশ্য” আর “স্বপ্ন” দেখেই বেশিরভাগ সময় কাটে তাদের। আর তাদের কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে জাদুশক্তি দিয়ে উমকুলুদের রক্ষা করে বৃক্ষজাতির ধূসর মানবেরা।

উমকুলুদের এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের প্রায় সমস্ত গ্রাম প্রধানরা এগিয়ে চলল র্যাচেলদের সাথে। এবং প্রতিদিন সকালে সভা বসানো হলো। তাদের সামনে তুলে ধরা হলো এই ক’দিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা, গ্রামের বিভিন্ন বিচার-আচার, সমস্যা ইত্যাদি। পুরোহিতরা তাদের মতো করে বিচার করল সেগুলোর। কাউকে ছেড়ে দিল, কাউকে অভিশাপ দিল। তবে তাদের রায়ে সম্ভ্রষ্ট বা অসম্ভ্রষ্ট যা-ই হোক, তাদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করার সাহসও দেখাল না কেউ। পুরো এলাকার দায়িত্বে থাকা সর্দারকেও পদচ্যুত করল পুরোহিতেরা। আরেকজনকে বসানো হলো তার জায়গায়। এমনকী তারপরও এতদিন পুরোহিতদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়ায় হাঁটু গেঁড়ে বসে তাদেরকে সম্মান ও ধন্যবাদ জানাল সর্বস্ব হারানো ব্যক্তিটি।

নারী চুরি ও হত্যাকাণ্ডের বিচারও করল তারা। তবে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় কাউকেই দেয়া হলো না। হিসহিসে

কণ্ঠে কাউকে কাউকে অভিশাপ দিল এডো। অভিশাপ দিল যে তাদের শরীর আর মন দুটোই ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাবে। আজ হোক বা কাল, মারা সে পড়বেই। কারো অপরাধ খুব বেশি ভয়াবহ হলে তাকে হুকুম করল মরণভূমিতে চলে যেতে। সেখানে খাবার পানি ছাড়া ঘুরে বেড়াবে সে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে মুক্তি দেয় তাকে। কিছু কক্ষাল সদৃশ লোক প্রতিদিনই পুরোহিতদের ক্যাম্প এসে কান্নাকাটি করে। আবেদন নিবেদন করে তাঁদের ওপর আরোপিত অভিশাপ যেন তুলে নেয়া হয়। এরা এলে পরে এদের নিয়ে নিচু স্বরে হাসাহাসি করে এডো আর তার দুই সঙ্গী হানা ও পানি। ওদের আবেদন, ওদের ওপর থেকে অভিশাপ তুলে না নিলে অন্তত বর্ষা দিয়ে ওদের তাৎক্ষণিক মৃত্যু দেয়া হোক। কিন্তু কথাটা শুনেই কেঁপে উঠল ছাতার ছাঁয়ায় বসে থাকা পুরোহিতরা। প্রশ্ন করল, তারা কি পাগল হয়ে গেছে যে, নিজেদের গাছকে অমন ভয়াবহ জিনিস দিয়ে নোংরা করতে চায়?

এক সকালে ক্যাম্প এসে হাজির হলো বেশ কিছু জীবন্ত কক্ষাল। এই দলে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবই আছে। যথারীতি তাদের নিয়ে উপহাস করল পুরোহিতরা। র‍্যাচেলদের প্রহরীদের মধ্যে সম্ভবত ওই লোকগুলোর আত্মীয় কেউ আছে। কারণ দেখা গেল এক দু'দিন তাদের আনাগোনা সহ্য করা হলেও পরে পিটিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হলো। আর তাড়িয়ে দেয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়ল সেই আঘাতকারী প্রহরীরাই।

নলখাগড়ার বেড়ার একটা ঘরে নোয়ি আর র‍্যাচেলের ক্যাম্প। ঘরটা গুটিয়ে নেয়া যায়। সারাটা পক্ষেই এই ঘরে থেকেছে র‍্যাচেল ও নোয়ি। পুরোহিতদের ছাতা তেমন বহন করা হয়েছে তেমনই বহন করা হয়েছে র‍্যাচেলের ক্যাম্প। যা হোক, ওই মানব কক্ষালদের তাড়ানোর দৃশ্যটা দেখেছে র‍্যাচেল। ঘটনাটা ওর মনে দাগ কেটেছে। নোয়িকে জিজ্ঞেস করল কারা ওরা।

কীভাবে আর কেন ওরা এমন হলো?

নোয়ি তখন বলল যে, বৃক্ষমাতার কাছে যাওয়ার সময় একবার এক গ্রামে আশ্রয় নেয় নোয়ি। তখন মাঝ বয়সী এক লোক নোয়ির সৌন্দর্য দেখে দখল করতে চায় ওকে। উদ্দেশ্য বিয়ে করবে নোয়িকে। যদিও সে জানত দূত হিসেবে স্বয়ং বৃক্ষমাতার কাছে যাচ্ছে নোয়ি। তবুও এই ধৃষ্টতা দেখায় সে। আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে দিল নোয়ি। তাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে নোয়ি। কিন্তু ব্যাপারটা বৃক্ষজাতির পুরোহিতের কাছে গোপন থাকেনি। ফলে তার পরিবার সহ তাকে অভিশপ্ত করে পুরোহিতরা। সেই কারণেই আজ ওদের এই করুণ হাল।

অভিশপ্ত পরিবারটিকে র্যাচেল ইশারা করল ওকে অনুসরণ করতে। ঠাঁরপর সোজা চলে গেল পুরোহিতদের কাছে। পুরোহিতরা ওখানে ছাতার ছায়ায় বসে ঢুলছে। তীব্র স্বরে র্যাচেল বলল, 'জেগে ওঠো, পুরোহিত।'

চোখ কচলে সোজা হয়ে বসল তারা। চোখে অবাক দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। জবাবে র্যাচেল বলল, 'এই লোকগুলো অনেক ভুগেছে। তাই হুকুম করছি, এদের মাথার ওপর থেকে অভিশাপের খড়্গ সরানো।'

'হুকুম করছ? কিন্তু আমরা যদি অভিশাপ না সরাই তাহলে কী করবে, সুন্দরী?' অবাক এডো প্রশ্ন করল।

'তাহলে অভিশাপ আমিই সরাব। এবং সেটার প্রভাব নিয়ে ফেলব তোমার মাথার ওপর। তখন ওদের বদলে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরবে তুমি। আমাকে পাগল ভাবছ, পুরোহিত? ভাবো। কিন্তু জেনো, তোমরা জুলুদের চেয়েও খারাপ। ওদের চেয়েও কুটিল তোমরা। তোমরা কষ্ট দিয়ে মানুষ হত্যা করো। হ্যাঁ, আমি পাগল কারণ আমার আত্মা আমাকে ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে জেনে রেখো, আমার মধ্যে নতুন ক্ষমতার জন্ম হয়েছে।

যদিও কীভাবে হয়েছে তা আমিও বলতে পারব না। তবে, যা বললাম করে দেখানোর ক্ষমতা আমার আছে।’

তিন মাথা এক করে কিছুক্ষণ গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করে পরামর্শ করল পুরোহিতরা। তারপর যথারীতি কাঠের বোল আনাল এডো। কী দেখল সে-ই জানে। তবে যা-ই দেখুক সেটা তাকে খুবই অসম্ভব করেছে বোঝা গেল। তারপর মানব কঙ্কালদের বলল, ‘বৃক্ষমাতা তোমাদের ক্ষমা করেছে। টিল দিয়েছে তার বাঁধা গেরোতে। যে অভিশাপের বৃক্ষ সে রোপণ করেছিল তা তুলে নেয়া হয়েছে। ক্ষমা পেয়েছ তোমরা। খাও, শক্তি ফিরে পাবে। চোখ থেকে অন্ধত্বের শাপ তুলে নেয়া হলো। পা থেকে তুলে নেয়া হলো অনির্দিষ্ট ঘুরে বেড়ানোর অভিশাপ। হেসে খেলে বেড়াও, বংশবৃদ্ধি করো। তোমাদের ওপর আরোপিত অভিশাপ আশীর্বাদে রূপান্তরিত করা হলো। এটাই বৃক্ষমাতার ডিক্রি।’

এবার র্যাচেল বলল, ‘না, অভুক্ত লোকেরা, বৃক্ষমাতা নয়, এটা ইনকোসাজানা-ই-জুলার ইচ্ছা। নিজের আত্মা খুইয়েছে ইনকোসাজানা, হারিয়েছে আরো একজনকে। সেই হারানো আত্মাকে খুঁজে পেতে এদেশে এসেছে ইনকোসাজানা।’

এরপরই যেন আবার পাগলামি পেয়ে বসল র্যাচেলকে। আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে হা হা করে বন্য হাসিতে ফেটে পড়ল ও। কিন্তু তা ওই বেচারারা নজরে নিল না। র্যাচেলকে স্পর্শ মানুষ মনে করে ছুটে এল তার দিকে। তবে র্যাচেলকে স্পর্শ করার সাহস তাদের নেই। এমনকী ওর রোবের প্রান্তও না। তাই যেখানে র্যাচেল দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গাটাকেই চুমু খেল লোকগুলো। এর দিন কয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল মানুষগুলো। নোয়ি খেয়াল রেখেছিল ফলে নিশ্চিত হতে পেরেছে।

এদিকে পুরোহিতদের কুটিল শাসনে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে

থাকা উমকুলুদের সবার কাছেই পৌছে গেল এই ঘটনার খবর। সেদিনের পর থেকে ওরা রীতিমতো নিজেদের ভেতর ঘোষণা করে দিল যে, সাধারণ কোন নারী নয় এই সাদা লেডি। বরং ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ আত্মা সে। নইলে একবার যার ওপর বৃক্ষমাতার অভিশাপ পড়ে তা ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। সেই অভিশাপই সে তুলে দিয়েছে। মহা পবিত্র আত্মা না হলে কোনভাবেই তা সম্ভব না। সেদিন থেকে র্যাচেলকে এম্নকী জুলুদের চেয়েও বেশি যত্ন করতে শুরু করল উমকুলুরা।

ওদিকে শাপমুক্তির ঘটনার পর থেকে র্যাচেলের সামনে আর কোন বিচার করল না তিন পুরোহিত। এম্নকী রায়প্রাপ্ত কঙ্কাল সদৃশ কাউকে র্যাচেলের সামনে আসতেও দিল না ওরা। এরই মধ্যে উমকুলু জাতির কয়েকজন মিলে পুরোহিত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু ধরা পড়ে গেল তারা। তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে বেয়ারার বেশে তাদেরকে নিজেদের দেশে নিয়ে চলল পুরোহিতরা। এম্নভাবে ওদের নিল যেন র্যাচেল কিছু টের না পায়। এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৃক্ষজাতির পুরোহিতরাও ভয় পেতে শুরু করেছে র্যাচেলকে।

উমকুলুদের উর্বরা এলাকা পার হয়ে বিশাল এক মরুর প্রান্তে এসে পৌঁছল র্যাচেলদের বহর। উদার হস্তে তাপ বিলিয়ে যাচ্ছে মরুর অতি উজ্জ্বল সূর্য। ফলে কিছুই নেই এখানে। জীবিত প্রাণী বলতে আছে কেবল মরুর কিছু বিষাক্ত সাপ আর ফায়ার স্ক্রিড। রাতে তপ্ত মরু শীতল হয়ে এলে শিকার করতে বের হয় সেগুলো। দানবীয় উমকুলুদের এলাকার পর এটাই হচ্ছে বৃক্ষজাতির দ্বিতীয় প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত পানি আর অভিজ্ঞ গাইড ছাড়া এই মরু পাড়ি দেয়া প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। প্রথমবার এসে নোয়িকেও এখানে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোন অদ্ভুত উপায়ে ওর আগমনের কথা জেনেছে

বৃক্ষমাতা। তারপর ওকে নেয়ার জন্য পাঠিয়েছে পুরোহিত ও প্রহরী। তখনই কেবল ওদের সাথে ওদের দেশে যেতে পেরেছে নোয়ি। তবে জুলুদেরকে ওই দেশে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি। নোয়ি যে সত্যি সত্যি রাজার সংবাদ বৃক্ষজাতির কাছে পৌঁছেছে তার সাক্ষী হতে একজন মাত্র ওঝাকে নোয়ির সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। জুলুরা রয়ে গিয়েছিল উমকুলুদের সাথে। তবে এজন্য একটুও আফসোস করেনি জুলুরা। কারণ ভূত রাজাদের ভৌতিক জাদুর কথা “যথেষ্ট” শুনেছে ওরা। তাই “বিশেষ” কারণে এখানে থেকে যেতে ওদের একটুও আপত্তি ছিল না।

যা হোক, সেদিন পড়ন্ত বিকেলে পশ্চিম দিকে মুখ করে রওনা হলো র্যাচেলদের বহর। তবে এবার আর র্যাচেলকে পায়ে হাঁটার অনুমতি দেয়া হলো না। বলা হলো যে কোন সময় মরুর সাপ কামড়ে দিতে পারে। ফলে নোয়ির সাথে পালকিতে চড়তে হলো ওকে। দানব সদৃশ লোকগুলো পালকি কাঁধে নিয়ে বেশ জোরাল গতিতে ছুটতে শুরু করল। ওদের সাথে বেয়ারা ছিলও প্রচুর। ফলে কিছুক্ষণ পরপরই কাঁধ বদল করে করে চলার গতি বজায় রাখা হলো। প্রত্যেকটা বেয়ারা পিঠে করে বয়ে নিচ্ছে বিশাল বিশাল পানির পাত্র। এর কারণটা বোঝা গেল চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ পর। আসলে মরুর সাদা বালি লবণে ভরা। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের মনে হতে থাকল মরুর বাতাসে শুষ্ক লবণ ভেসে আছে। এই লবণাক্ত পরিবেশে সাধারণ মানুষ চেয়েও তাড়াতাড়ি গলা শুকিয়ে আসে। ফলে প্রচুর পানির সরবরাহ না থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত।

মরুর বুকে চাঁদের আলোর প্রতিফলন সাদা বালুর রূপালী রূপ, আকাশপানে আঙুল তুলে বিদ্রোহী মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাথুরে অবিলিঙ্গ, বহরের বেয়ারাদের পায়ের আঘাতে তৈরি হওয়া

না।’

‘না, ভয় পেয়ো না, লেডি। এ জায়গাটা হচ্ছে অভয়াশ্রম। এখানে তোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা কারো নেই। চলো পুরোহিতের সাথে দেখা করতে হবে। দেখা করলে ওর কাছ থেকে নতুন কোন খবর হয়তো জানতে পারব আমরা,’ বলল নায়া।

একুশ

র্যাচেল আর নোয়িকে নিয়ে এডোর সাথে দেখা করতে গেল নায়া। সূর্যের সরাসরি আলোর বাইরে ছায়ার মধ্যে বড়সড় একটা ব্যাঙের মতো বসে আছে এডো। সাথে এনেছে হানা ও আরো ক’জন পুরোহিতকে। র্যাচেলকে দেখে এডো ছাড়া বাকি সবাই উঠে দাঁড়াল। স্যালুট করল ওকে। তবে নোয়ি ও নায়াকে সম্মান দেখাল না কেউ।

নায়াকে উদ্দেশ্য করে এডো বলল, ‘মৃত্যুগুহার বাইরে কেন তুমি, নায়া? তোমার গাছটা তো পড়ে গেছে। গত রাতে আমরা ক’জন মিলে ওটার ডালগুলো ভেঙে রেখে এসেছি। যাতে কাণ্ডটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে মারা যায়।’

‘আমার গাছ মারা গেলে তবেই মরব আমি, পুরোহিত। তার আগে কিছুতেই নয়। আর মারা যাওয়ার আগে কিছু কাজ আছে আমার সেগুলোও সেরে রেখে যাব।’ আমার গাছের একটা অংশ

গেছে নাকি কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছে। মরতে মরতেও আবার বেঁচে উঠল ও। চোখের সামনে আগের মতোই আকৃতি নিয়েছে একটা শারীরিক কাঠামো। তবে এবার আর আগেরগুলো নয়। এই কাঠামোটাও ধোঁয়ার মতো। কেবল নড়াচড়া করলেই চোখে পড়ে যে কিছু একটা আছে এখানে। তবে এর শরীরটা বিশাল। তার চোখগুলোও দেখতে পারছে র্যাচেল। দানবীয় কাঠামোর অনেক ওপরে সেই চোখগুলো। যেন অনেক ওপর থেকে একটা শিশুর দিকে তাকিয়ে আছে বিশাল এক দানব। কয়েক মুহূর্তেই র্যাচেল অনুভব করল, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বিশাল দেহধারী ধোঁয়াটে কাঠামো।

বড় ভয়ানক সেই চোখ। কিন্তু তবুও খানিক স্বস্তি পাচ্ছে র্যাচেল। অন্তত একাকীত্বের অত্যাচার ওকে সইতে হচ্ছে না। “তারা” অন্তত জীবিত! বিশালদেহী ছায়াগুলোর মধ্যে ততোধিক বিশাল একটা ছায়া ঝুঁকে এল ওর দিকে। নিজের মাথার ভেতর তার কণ্ঠ শুনতে পেল র্যাচেল। সে জিজ্ঞেস করছে, কী এমন হয়েছে যে, সময়ের আগে, আয়ু শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুলোকে হাজির হয়েছে র্যাচেল। র্যাচেলও মনে মনে জবাব দিল যে, যাদের সে ভালবাসত তাদের সবাই মারা গেছে। তাদেরই খুঁজতে এসেছে সে।

সাথে সাথেই মনের কানে র্যাচেল শুনল, সেই কণ্ঠটা লুকুম করছে, ‘র্যাচেলের সাথে সম্পর্কিত সকল মৃতদেরকে ওর সামনে হাজির করো।’

ধূসর হলটার শেষ প্রান্তে খুলে গেল বিশাল এক দরজার পাল্লা। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল উড়ন্ত ধোঁয়াশার মতো অস্পষ্ট এক কাঠামো। দু’হাতে আলগোছে কোলে করে নিয়ে এসেছে এক শিশু বাচ্চা। বাচ্চাটি হচ্ছে পণ্ডা ল্যাণ্ডের উপকূলে সমাহিত করা ওর ছোট্ট ভাই। চোখ খুলে বাচ্চাটা ওকে দেখল এবং র্যাচেলের

ভবিষ্যতও দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু এখন তো দেখছি নিজেকে ফিরে পেয়েছে। কাজেই আমার জন্য তার মস্তিষ্কে কোন স্থান নেই। নিজেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সে। আর এই সব “অপকর্মের” পেছনে আছিস তুই, বেজন্মা নোয়ি।’

নির্বিকার চিণ্ডে নোয়ির উত্তর, ‘হয়তো।’

রাগের চোটে গাছের ডাল চাপড়াতে চাপড়াতে সে বলল, ‘ভেবেছিস, নিজের রক্ত বলে শয়তান বুড়ি নায়া-কে বাঁচাতে পারবি? গাধা, তুই ভুলে গেছিস, ওর গাছ পড়ে গেছে। নায়া বাঁচবে ঠিক ততদিন যতদিন বেঁচে রইবে এই গাছটা। দিনকে দিন এই গাছের রস শুকাবে, একই সাথে শুকাবে বুড়ির গায়ের রক্ত। বুড়ি মরবেই।’

এবার নোয়ি বলল, ‘মৃত্যুতে কী এসে যায়? মৃত্যুর মানে হচ্ছে ~~শরীর~~ গিয়ে পূর্বপুরুষদের ভূতদের সাথে যোগ দেয়া। সেটাই সবার অন্তিম ও চূড়ান্ত গন্তব্য। তবে মৃত্যুর পর আরেকটা বাড়তি কাজ করবে নায়া। আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে ফিরে আসবে এখানে। এসে চেপে বসবে তোমার কাঁধের ওপর, শয়তান পুরোহিত এডো। আমৃত্যু তোমার পেছনে লেগে থাকবে তারা। চূড়ান্ত বিচার দিবসে উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে শাস্তি দেবে না সে।’

নোয়ির অভিধানে মতো “সাবধানবাণী” কানে না নিয়ে উল্টো প্রশ্ন তুলল এডো, ‘তুই তা-ই ভাবছিস? ভাবছিস ওই শ্বেতাঙ্গ রমণীর উপদেষ্টা হয়ে প্রধান পুরোহিতের ~~পদ~~ দখল করবি?’

‘করব কিনা জানি না। কিন্তু যদি করি তো মনে রেখো, সেই সময় তোমার সুখের দিন শেষ হয়ে যাবে, পুরোহিত নামের শয়তান,’ জবাব দিল নোয়ি।

‘না। তা কখনোই হতে দেব না। বৃক্ষজাতির শাসকের

আসনে কোন বেজন্মাকে বসতে দেব না আমি। আমার আছে জাদুর শক্তি, বিশ্বের জ্ঞান আর আছে অগণিত দাস যারা এমনকী তীর ছুঁতেও জানে। ওদের দিয়েই তোকে রক্ষব।’

‘পারলে তা-ই কর, শয়তান কোথাকার,’ রেগে গিয়ে বলল নোয়ি।

‘হ্যাঁ, তা-ই করব। কেবল তোর ওপর নয়, ওই সাদা ডাইনির ওপরও খাটাব আমার শক্তি। এই মরু আর জঙ্গল ঘেরা দেশ থেকে জীবিত ওকে বের হতে দিব না আমি। হয় তার হয়ে এই দেশ শাসন করতে দেবে আমাকে, নয়তো মরবে সে। এবং খুবই করুণ হবে তার মৃত্যু। কিছু সময় পর্যন্ত নিজের জ্ঞান দিয়ে হয়তো তাকে রক্ষা করবে নায়া। কিন্তু ওর আয়ু আর, কয়দিন, খুব তাড়াতাড়িই মরবে নায়া। দরকার হলে নায়ার গাছের নীচে আগুন দেব আমি। তখন, শ্বেতাস্বিনী, আমার শাসন অথবা নিজের ধ্বংস থেকে যে কোন একটা বেছে নিতে হবে তোমায়।’

আর সহ্য হলো না নোয়ির। চিৎকার করে বলল, ‘কুণ্ডা কোথাকার, নিশাচর বেইমান, কত বড় সাহস তোর, ইনকোসাজানাকে নিয়ে বাজে কথা উচ্চারণ করছিস? আর একটা বাজে শব্দ উচ্চারণ করলে তোর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে এনে সূর্যের কাছে ভেট দেব আমি,’ বলে ছোঁ মেরে র্যাচেলের হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে ছুটে গেল এডোর দিকে।

আঁতকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এডো। কাছের কাণ্ড পেয়ে ছুট দিল উঁচু ডালের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটা ডালের নাগাল পেয়ে গেল সে। তারপর ঠিক বন মানুষদের মতো ডালে ডালে ঝুলে পালিয়ে গেল বনের গভীরে।

ওদিকে এডোকে পালিয়ে যেতে দেখে হাসতে হাসতে ফিরে এলো নোয়ি। র্যাচেলকে ফিরিয়ে দিল ওর বর্শা। হাসিমুখে নায়াকে তাদের ভাষায় বলল, ‘মুখেই বড় কথা বলে এডো। কিন্তু

ও ব্যাটা আসলে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু না।’

‘খুব একটা ভুল বলোনি। কিন্তু আমাদের জাতির আর সবার মতো ও-ও ভয় পায় লাল মৃত্যুকে। তবে জেনে রেখো, এডো আসলেই খুব খারাপ লোক। ও আমাকে ঘৃণা করে। কারণ কালো জাদু নয়, সাদা জাদু দিয়ে শাসন করতাম আমি। যতদিন আমার গাছ দাঁড়িয়ে ছিল আমার হুকুম মানতে বাধ্য ছিল ও। আমিও নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু এখনকার কথা ভিন্ন। আমাদের রীতি অনুযায়ী চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারবে ও। তারপর স্বর্গের নির্দেশে যার গাছের ওপর আমার গাছ হেঁলে পড়েছে তাকে নির্বাচন করবে আমাদের নতুন রাণী হিসেবে। বেঁচে থাকলে বাকি সবার মতো তাকে রাণী মানতে বাধ্য হব আমিও। তার মাধ্যমেই ভূত রাজাদের জাগিয়ে তুলবে ও। তবে জেনে রাখো, কোন পুরুষ তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে না, পারে কেবল বৃক্ষমাতা। বলা বাহুল্য মাতা কেবল একজন নারীই হতে পারে। এখন চলো, নোয়ি; তুমিও চলো, শ্বেতাঙ্গ লেডি। আমাদের পালাতে হবে। নিরাপদ জায়গার ঠিকানা জানা আছে আমার। লেডি, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করো। কথা দিচ্ছি, বিনিময়ে যা তুমি চাও পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব।’

নায়ার বক্তব্য যখন বুঝল উল্টো র্যাচেলই বলল, ‘আমার কোন বিনিময় মূল্যের দরকার নেই। তবে মনে হচ্ছে, ওই বদমাশ বামুনের হাত থেকে আপাতত আপনার চেয়ে আমার নিজেরই নিরাপত্তার প্রয়োজন বেশি।’

নায়ার সাথে সাথে নীচে নেমে এল নোয়ি আর র্যাচেল। নীচে নেমেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নায়া। গাছের একটা ডালে চুমু খেল সে। বলল, ‘বিদায়, মহীরুহ। আমি আর আমার আগে অনেক রাণী রাজত্ব করে গেছে তোমার ছায়ায় বসে। তোমার ছায়ায় বসেই স্বপ্নদৃশ্য দেখেছে তুরা। স্বর্গের হুকুমে

পতন হয়েছে তোমার। আমার রাজত্বও শেষ হয়েছে তোমার পতনের সাথে সাথে। লাল মৃত্যু থেকে আমার আত্মাকে রক্ষা কোরো, আমার গাছের আত্মা। যেন মৃত্যুর পর তোমার ছায়াতেই এসে ঘুমাতে পারে আমার ভূত,’ বলেই নায়া ছুটে গেল গাছটার একটা ডালের দিকে। ভেঙে নিল সবচেয়ে সবুজ একটা ডাল। তারপর বলল, ‘এটা আবার রোপণ করব আমি। হয়তো এটা আবার পরিণত হবে বিশাল এক মহীরুহে। হয়তো আবার এর ছায়ায় বসবে ভূত জাতির অনাগত রাণী। কিন্তু এখন পালাতে হবে। চলো চলো,’ বলে র্যাচেল আর নোয়িকে নিয়ে ছুট দিল বনের দিকে।

ঝড় সরে গেছে বহু আগেই। বজ্র গর্জনও সরে গেছে। আকাশে প্রবল বিক্রমে উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে আফ্রিকার সূর্য। সেই তাপের এতোই তেজ যে, গাছের ছায়ায় সরে যেতে বাধ্য হলো জড়ো হওয়া বাকী সব বামুনরা। র্যাচেলদের চলে যেতে দেখল সবাই। হাত তুলে র্যাচেলকে সম্মান দেখাল তারা। কিন্তু সাবের্ক বৃক্ষমাতাকে সামান্যতম সৌজন্য দেখানোরও দরকার মনে করল না কেউ। উল্টো এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ‘নায়া, আমাকে একবার শান্তি দিয়েছিলে তুমি। এখন আমি যদি তোমায় মেরে ফেলতে চাই তো কীভাবে বাঁচবে বলো?’

লোকটার দিকে দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকাল নায়া তথা সাবের্ক বৃক্ষমাতা। বলল, ‘অনেক বড় অন্যায় করেছিলে তুমি। মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা ছিল তোমাকে। কিন্তু তোমাকে লঘু দণ্ড দিয়েছিলাম আমি। আর হ্যাঁ, মনে রেখো, আমার গাছ পড়ে গেছে বটে কিন্তু এখনও মরে যায়নি। আর আমার জ্ঞানও আমাকে ছেড়ে যায়নি,’ বলে হাতের সবুজ ডালটা চোখের সামনে তুলে ধরল সে। মুহূর্তখানেক ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর লোকটাকে বলল, ‘শুনে রাখো, আমার মৃত্যুর আগেই মারা যাবে তুমি। তবে

মৃত্যুটা তোমার মোটেও সুখকর হবে না। তোমরাও আমার এই কথাগুলো মনে রেখো, ও ভূত জাতির লোকেরা,' বলে হাঁটা শুরু করল সে।

পেছন থেকে নায়ার দিকে তাকিয়ে রইল সেই লোকটা। তার চেহারা যুটে উঠেছে ভয়ের ছাপ। কিন্তু যেন ভয়কে অতিক্রম করে যুটে উঠতে চাইছে তীব্র ঘৃণা। লোকটা চিৎকার করে বলল, 'তুই মিথ্যুক, নায়া।'

কথাটা তার মুখ থেকে বের হয়েও সারতে পারেনি, ওপর থেকে মট করে একটা আওয়াজ এল। কাণের মায়া ছেড়ে খসে পড়ল বজ্রপাতে ভেঙে যাওয়া বিশাল একটা ডাল। কাউকে নড়ার এক মুহূর্ত সময়ও দিল না। সোজা এসে পড়ল লোকটার মাথার ওপর। ভারী ডালের আঘাতে পিষে গেছে সে। নায়ার বাণী সত্য হয়েছে। লাল মৃত্যু পেয়েছে হতভাগ্য লোকটি। রক্তাক্ত দৃশ্যটা থেকে চোখ সরিয়ে নিল বামুনরা। বলতে লাগল, 'আসলেই নায়ার ক্ষমতা চলে যায়নি। কেউ যদি ওকে আসলেই মারতে চায় তো ওর গাছের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে।'

এসবের দিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না নায়া। এগিয়ে চলল গভীর বনের দিকে। এই মুহূর্তে নায়ার সাথে র্যাচেলরা হাঁটছে বনের ভেতর দিয়ে। চারদিকে কেবলই গাছ আর গাছ। প্রতিটাই বিশাল। গাছের ডালপালাগুলো এমনভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে যে বহু ওপরে লতাপাতার নিশ্চিন্দ ছায়া তৈরি হয়ে গেছে। সেই ছাদের ফাঁক-ফোকর গলে সূর্যের আলোর নীচে নেমে আসার উপায় নেই। ফলে নীচে মাটির কাছাকাছি হয়ে আছে ঘোর সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। নিশ্চিন্দ নীরবতায় ডুবে আছে পুরো বন। ঝড়ের ভয়ে বন ছেড়ে ভেগেছে সমস্ত পাখ-পাখালি আর পশুর দল। নীরবতা ভাঙছে যখন বজ্রপাতের মতো শব্দ তুলে ভেঙে পড়ছে কোন গাছ। তখন আঁতকে উঠে নায়া বলছে আরেক

জন মানুষ মারা গেল ।

পরে র‍্যাচেল বুঝতে পেরেছে যে, ভূত জাতির অধিবাসীরা বিশ্বাস করে প্রতিটা গাছের সাথেই জড়িয়ে আছে কোন না কোন মানুষের আত্মা । হয়তো সেই মানুষটি আছে এই দেশ থেকে বহু দূরে কোথাও । কিন্তু তবুও, গাছটি যখন মারা যায়, মারা যায় সেই লোকটিও । কখনো হয়তো অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে, কখনো হয়তো সাথে সাথে । সাথে সাথে যারা মারা যায় তারাই প্রবেশ করে ভূতদের দুনিয়ায় ।

নির্দিষ্ট করে বলার মতো কোন পথচিহ্ন নেই তবুও একটা নির্দিষ্ট দিকেই এগিয়ে চলেছে ওরা । আবছা একটা ট্রাক হয়তো ধরা যায় । কারণ ওরা ক্রমাগত যদিকে এগুচ্ছে সেদিকে ওদের সামনে কোন ডালপালা পড়ে নেই । যদিও আশপাশে অভাব নেই ওসবের । এভাবে মাইলের পর মাইল হাঁটার পর বিরাট বিরাট ঘাসে ভরা খোলা এক প্রান্তরের প্রান্তে এসে পৌঁছুল ওরা । জায়গাটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়ে না থাকলে বলতেই হবে বহু বহুকাল আগে জায়গাটা পরিষ্কার করেছিল কেউ । তবে এখন খোলা জায়গাটায় কেবল ঘাসের রাজত্ব । এর মাঝে এলোমেলোভাবে জন্মে আছে বন্য ফুলের গাছ । এই প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট উঁচু পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা এলাকা । দেয়ালের প্রায় পুরোটাকেই ঢেকে রেখেছে ফার্ন । বিরাট বড় পাথরগুলো কীভাবে একটার ওপর আরেকটা তোলা হয়েছে ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল র‍্যাচেল আর নোয়ি । এটা কোনও রক্ত মাংসের মানুষের কীর্তি বলে ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে ওদের ।

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে নান্নকে প্রশ্ন করল নোয়ি, 'এসব কে বানিয়েছে, মা?'

'বহু, বহুকাল আগে এখানে বাস করত বিশালাকৃতির ভীষণ

শক্তিশালী কিছু মানুষ। এই দেয়াল তারাই বানিয়েছে,’ বলল নায়া। বলতে বলতে হাতের ডাল থেকে সবুজতম কুঁড়িটা ছিঁড়ে ঝুঁকে সেটা রোপণ করল সে। তারপর বলল, ‘চলতে থাকো, মেয়ে। এই জায়গাটা নিরাপদ নয়।’

আর ঠিক তখনই বাতাস কেটে কিছু ছুটে যাওয়ার হিসানো শব্দ শুনতে পেল ওরা। দেখল ওদের সামনে লতায় গেঁথে আছে ডাট আকারের ছোট্ট একটা তীর। জিনিসটা ধরতে এগুলা নোয়ি।

হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল নায়া। বলল, ‘ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না। তীর বিষ মাখানো আছে ওটার গায়ে। এ নির্ধাত এডোর কীর্তি। কিন্তু আমার মরার সময় আসেনি এখনও। অমন তীর আরেকটা আসার আগেই ছুটে খোলা প্রান্তরে ঘাসের ভেতর ঢুকে পড়ো।’

এবার শুরু হলো দৌড়। তবে তীরন্দাজের নাম-নিশানা আর দেখা গেল না। জঙ্গল থেকে বের হয়ে খোলা প্রান্তরে আসার পর বিশাল দেয়ালটার বেশ বড়সড় অংশ দৃশ্যমান হলো। এই দেয়ালের ঘেরের ভেতর আছে একটা টিলা। সেই টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সিডার-সদৃশ বিরাট এক গাছ। সেটার ডালপালা এত বেশি ছড়িয়েছে যে, দেয়ালের ঘেরের ভেতরের অর্ধেকের বেশি এলাকাই নিজের ছায়ায় ঢেকে রেখেছে গাছটা। তবে অবাক কাণ্ড হচ্ছে দেয়ালটার কোন ফটক বা প্রবেশমুখ নেই। র‍্যাচেল আর নোয়ি ভেবেই পেল না এর ভেতর মানুষ ঢুকেছে কী করে। তবে ওরা এসব ভাবতে ভাবতেই ওদেরকে ফাটলের স্বতো সরু একটা পথের মুখে নিয়ে এল নায়া। মুখটা টেনেটেনে হয়তো দুই ফুট চওড়া হবে। এর মুখে আবার গজিয়ে আছে শেকড়-বাকড়। ওগুলো ছিঁড়েই ভেতরে ঢুকল নায়া। তার পেছন পেছন ভেতরে গেল নোয়ি আর র‍্যাচেল। হঠাৎই ওপর থেকে একটা আওয়াজ পেল ওরা। মুখ তুলে তাকাতেই দেখল ফাটলের ওপরে দাঁড়িয়ে

আছে সাদা পোশাক পরা ক'জন বামুন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই তীর ধনুক। তীরগুলো ওদের দিকেই তাক করা।

ইশারা করে তাদেরকে কিছু একটা বলল নায়া। সাথে সাথেই তীর সরিয়ে নিল তারা। এবং পরমুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেল সব ক'জন। খোদা মালুম কোথায় ডুব দিল মানুষগুলো।

ব্যাখ্যা দিয়ে নায়া বলল, 'এরা এই মন্দিরের অভিভাবক। মূক ও বধির। তবে এখানে ঢোকার সময় আমরা যে শিকড়ের জাল ছিঁড়ে ঢুকেছি সেটা টের পেয়েই দেখতে এসেছে ওরা,' বলতে বলতে আগে বাড়তে থাকল নায়া।

সরু পথটা কখনো ডানে বাঁক নিয়েছে আবার কখনো বামে। আর মাথার ওপরে দেয়ালের চূড়াটা এত উঁচুতে যে নীচটা প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে। আর এভাবে বারবার বাঁক নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে যেন ওপর থেকে নিরাপদে তীর ছুঁড়তে পারে মন্দিরের অভিভাবক তীরন্দাজরা। যা হোক, হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল সরু পথটা। দেখা গেল এটা একটা কার্না গলি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল র্যাচেল আর নোয়ি। তখন আরেকটু সামনে বাড়ল নায়া। খোদা মালুম কোথায় কী হলো, কেঁচির মতো খুলে গেল সামনের বিশাল একটা পাথর, তৈরি হলো ততোধিক সরু একটা ফোকর। ওটা গলেই কষ্টে সৃষ্টে ভেতরে ঢুকল ওরা। এভাবেই ওরা প্রবেশ করল বিশাল উঁচু ও ভীষণ চওড়া পাথরের দেয়ালের ঘেরের ভেতর।

ঘেরের ভেতরটা অন্যরকম। সুন্দরভাবে গোছানো বাইরে থেকে যে সিডার গাছটা দেখেছিল ওরা সেটাই এখন সামনে থেকে দেখছে। টিলার ওপর কোথাও একটা মরা পাখি পড়ে নেই। পরিষ্কার করে রাখা আছে সব। টিলা থেকে দেয়াল পর্যন্ত জায়গাটা বেশ চওড়া ও সমতল। এই জায়গাটাও ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা। পুরো টিলার পাদদেশ ঘিরে আছে এই

সমতল জায়গাটা। টিলার পাদদেশে এক পাশে ছোট ছোট মাটির
স্তূপ দেখা যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা পিঁপড়ের ঢিবির মতো।

নায়া ব্যাখ্যা দিল, 'এটা ভূত জাতির পুরোহিতদের শেষ
গন্তব্য, তাদের কবর। খুব শীঘ্রই আমাকেও ওখানে গুতে যেতে
হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছে গেল টিলার গোড়ায়। গাছের
ছায়ায় ঢেকে আছে পুরো টিলা। অনেক বয়স এই গাছটার। এর
ডালে ঝুলে থাকা ধূসর মসগুলোও লম্বা হয়েছে বেশ। বাতাসে
উড়ছে সেগুলো।

এদিকে উদয় হয়েছে বেশ কিছু বামুন লোক। তাদের মধ্যে
খানিক আগে দেখা সেই তীরন্দাজরা ছাড়াও আরো কিছু লোক
আছে। এই দলে নারী পুরুষ উভয়ই আছে। তাদের সবার
ছেহারাতেই ফুটে আছে বিষণ্ণতার ছাপ! নায়াকে সম্মান দেখাল
তারা সবাই তবে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল র্যাচেলের দিকে।
ইশারার মাধ্যমে ওদেরকে কী যেন বলল নায়া। তখন ওদের
বিষণ্ণ চেহারা আরো বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নায়া ব্যাখ্যা দিল, 'অভিভাবকরা ওদের শিশির-পানি দিয়ে
জেনেছে আমার গাছটা পড়ে গেছে তবে মরেনি এখনও। সেটাই
নিশ্চিত হতে চাইছিল ওরা। আমিও জানালাম ঘটনা সত্য।
তাতেই মন খারাপ করেছে ওরা। আর এই জায়গাটা হচ্ছে
আমাদের জাতির পুরোহিতদের সমাধিক্ষেত্র। সবাই তাদের শেষ
যাত্রায় এখানেই আসে। এই জায়গায় রক্তপাত নিষেধ। এমনকী
সবচেয়ে খারাপ পুরোহিতও যদি এই দেয়ালের ভেতর চলে আসে
তাহলে এখানে তারও রক্তপাত করা হবে না। আর যদি কোন
পুরোহিতের কোন বংশধর এই অভয়াশ্রমে জীবিত অবস্থায় ঢুকতে
পারে তাহলে তার জন্যও সাদা মৃত্যু নিশ্চিত। এসো নিজেরাই
দেখবে।'

নায়ার পেছন পেছন টিলার এক পাশে চলে এল ওরা। পেছনে ফেলে এল গুহামুখের মতো দেখতে একটা জায়গা। গুহার সামনে নলখাগড়ার বেড়া। তবে বেড়ার দরজাটা খোলা। সাবেক বৃক্ষমাতা ফিসফিস করে ওদের বলল, ‘এই দরজা সবসময়ই খোলা থাকে। কিন্তু মরতে না চাইলে ভুলেও কখনো এই দরজার ভেতর পা রাখবে না। এর ভেতর প্রবেশকারী বেশিদিন বাঁচে না। এর নাম মৃত্যু গুহা। ওই দেখো, লেডি...’

দেখা গেল বেড়ার পর পরই একটা গুহামুখ। সেদিকে তাকিয়ে প্রথমে তেমন কিছুই র্যাচেলের চোখে পড়ল না। তবে মুহূর্তখানেকের মধ্যে গুহার ভেতরের আবছায়া চোখে সয়ে গেল ওর। তখন দেখতে পেল বিশাল গাছটার গোড়ায় মাটিতে বসে আছে সাদা পোশাক পরা দু’তিনজন বামুন। তাদের প্রত্যেকের সামনে মাটিতে রাখা আছে একটা করে কাঠের টুকরো। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে আছে তারা। ওই দলে নারী পুরুষ উভয়ই আছে। এমনকী একটা বাচ্চা আছে বলেও মনে হলো র্যাচেলের। দেখতে দেখতেই একজন বসা থেকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে স্থির হয়ে গেল। মারা গেছে। পাশে থাকা মানুষগুলো কেঁদে উঠল। তবে অবাক কাণ্ড হচ্ছে তাদের চোখে কান্নার পানির সাথে যেন মিশে রয়েছে কৃতজ্ঞতা। কী অদ্ভুত! কয়েকজন বামুন অভিভাবক মিলে সম্মানের সাথে তুলে আনল মৃত মানুষটাকে। র্যাচেলদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় র্যাচেল দেখল মানুষটি তরুণী এক মেয়ে। কী মিষ্টি আর বিনয়ী চেহারা তার! যেন মারা যায়নি, ঘুমিয়ে আছে।

দুঃখিত কণ্ঠে র্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘মেয়েটি কি অসুস্থ ছিল?’

জবাবে সাবেক বৃক্ষমাতা বলল, ‘হয়তো। বা কোন কারণে হয়তো অসুস্থ ছিল সে। তাই এখানে এসেছিল মারা যেতে। তবে

এখন আর ওসবে কিছু আসে যায় না। সুখ খুঁজে পেয়েছে সে।’

নোয়িকে র্যাচেল বলল, ‘জিজ্ঞেস করো তো, ওই গাছের নীচে বসলে সবাই যদি মারাই যায়, তাহলে অভয়াশ্রমের অভিভাবকরা দিনের পর দিন গাছের নীচে বসে থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকে কীভাবে?’

নায়া বলল, ‘ওখানে বসলে ওই মূক বধির অভিভাবকরা ছাড়া বাকি সবার জন্য মৃত্যু নিশ্চিত। এই গাছের ডাল স্পর্শ করলে মৃত্যু হবেই। সেটা আজ হোক বা কাল। কারণ এই গাছ জীবন-মৃত্যুর গাছ। আমাদের জাতির আত্মা বাস করে এই গাছের ভেতর।’

কৌতূহলী র্যাচেল প্রশ্ন করল, ‘কী হবে যদি, এই গাছটাও বৃক্ষমাতার গাছের মতো পড়ে যায় বা মারা যায়?’

‘ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের জাতি। কারণ জাতির আত্মার একটা বাসস্থান দরকার। সেটা না থাকলে জাতিও চলে যাবে ভূতাদের দেশে। একই সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে এই জাতির সবাই।’

‘আর গাছটা যদি কেটে ফেলে কেউ, তখন কী হবে?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

দেখার মতো হলো নায়া আর নোয়ির চেহারা। মুখ তো নয় যেন আতঙ্কের মুখোশ। ফিসফিস করে নায়া বলল, ‘শ্বেতাঙ্গ রমণী, এই চিন্তাটাকে মনের ধারে কাছেও আসতে দিয়ে না। কিছু করা বা হওয়া দূরে থাক, শুধু এই চিন্তার ফলেই আমাদের সবার ওপর অভিশাপ এসে পড়বে। কারণ এই গাছ কাটার অর্থ আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলা। লোকালয় ছেড়ে আমাদের লোকেরা সব বনের এমন গহীনে পালাতে বাধ্য হবে যে, কেউ আর কখনো তাদের দেখা পাবে না। আর যে মানুষ এই অপকর্ম করবে তার ওপর কঠিন প্রতিশোধ নেয়া হবে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু

পাবে সে। উপরন্তু তাকে ভূতের রাজাদের কাছে হিসাব দিয়ে তারপর অন্য কোথাও যেতে হবে। ওহ, ভূতদের প্রতিশোধ, সে বড় ভয়ানক ব্যাপার! এমন কঠিন সেই প্রতিশোধ যে তার কথা মুখে না আনাই উদ্ভম। মন থেকে চিন্তাটা চিরতরে মুছে ফেলো, লেডি। প্রার্থনা করছি, এই চিন্তাটা যেন আর কখনো তোমার মুখ থেকে উচ্চারিত না হয়।’

‘এসব কি তুমিও বিশ্বাস করো, নোয়ি?’ হাসিমুখে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল র্যাচেল।

একবার কেঁপে উঠল নোয়ি। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ, জুলা, বিশ্বাস করি। কারণ এটা সত্যি। আমার বাবাও এই ব্যাপারে বলে গিয়েছে। আর বলেছে জোর করে অভয়াশ্রমের ভেতর ঢুকে যাওয়া কিছু জংলী লোকের ঘটনা। তারা তীর ছুঁড়েছিল এই গাছটার দিকে। না, না, আর কিছু বলব না। এই ভয়ানক গল্প বলা যায় না।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা বোকামি নয়? প্রাণী হলেও গাছ একটা জড় পদার্থ। জড় পদার্থ কী করে মানুষের ওপর ক্ষমতা রাখে?’

‘কীভাবে রাখে জানি না। কিন্তু রাখে, এটাই সত্য। ওটার দিকে যদি একটা পাথরও ছুঁড়ে মারি তো গাছটা মারা যাবে। সেই সাথে মারা যাব আমি। এমনকী আপনিও মরবেন, লেডি। কেউ বাঁচাতে পারবে না,’ বলতে বলতেই ঘুরে হঠাৎ র্যাচেলের হাত ধরে আকুতিভরা কণ্ঠে নোয়ি বলল, ‘কথা দিন, লেডি, কখনো এমন কিছু করবেন না, ভুলেও কখনো ছুঁতে যাবেন না ওই গাছটাকে, কথা দিন।’

গাছের ক্ষমতার গল্প শুনতে শুনতে কান্ড হয়ে গেলেও নোয়িকে খুশি করতে কথা দিল র্যাচেল।

টিলা থেকে নেমে একটা গুহায় গিয়ে ঢুকল ওরা। নায়া বলল, ‘ভেতরে চলো। আমার মৃত্যুর পরে হয়তো তুমিই হবে নতুন

বৃক্ষমাতা । কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই গুহাই তোমার ঘর । চলো ।’

গুহামুখটা বাইরের আলোয় মৃদুভাবে আলোকিত আর ভেতরটা প্রদীপ জ্বলে আলোকিত করা হয়েছে । ভেতরটা বেশ সুন্দরভাবে গুছানো । গুহার ছাদটাকে ধরে রেখেছে স্ট্যালাক্টাইটের বড়সড় একটা কলাম । গুহার শেষের দিকে মাটি থেকে বের হয়েছে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণার মুখ । আর একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চওড়া একটা কলাম । এটাকে দেখতে লাগে গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির মতো । এর মাথা থেকে গাছের মতো ডালপালাও বের হয়েছে । র্যাচেলের বুঝতে বাকি রইল না যে এটার জন্যই এই জায়গাটাকে মন্দির বলে জ্ঞান করে এখানকার বামনরা ।

ওটার দিকে ইঙ্গিত করে নায়া বলল, ‘আমার জাতির গাছের “ভূত” ।’ একমাত্র গাছ যা কখনো মরবে না । অনেক বছর ধরে “বঁচে” আছে এটা, বেড়েও চলেছে আমার মা ছোট থাকতে এটাকে যেমনটা দেখে গেছে এখন এটা তার থেকে অনেক বড়!’

আরেকটু এগিয়ে গেল র্যাচেল । দেখল ওটার আশপাশে পড়ে আছে নানা রকম মূল্যবান ও মহামূল্যবান জিনিসপত্র । সেগুলোর মধ্যে, গহনা, মূল্যবান রত্ন-পাথর থেকে শুরু করে হাজার পদের হাবিজাবিও আছে । আছে পাথর ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, পশমী ক্যারোস ইত্যাদিও ।

নায়া বলল, ‘এগুলো হচ্ছে ভূত জাতির কাছ থেকে ঋণমর্শ নিতে আসা বিভিন্ন লোকদের উপহার ও ভেট । তারা এগুলোকে মূল্যবান মনে করে দিয়ে গেছে । কিন্তু সত্যি বলতে আমাদের কাছে এসবের মূল্য নেই । আমাদের কাছে একমাত্র মূল্যবান জিনিস হচ্ছে জ্ঞান ও ক্ষমতা । ওই দেখো ডিনগানের কাছ থেকে উপহার হিসেবে ওগুলো নিয়ে এসেছিল নোয়ি ।’

মাথা ঝুঁকিয়ে তাতে সম্মতি জানাল নোয়ি । বলল, ‘হ্যাঁ ।

ওগুলো আর ইনকোসাজানার ভবিষ্যদ্বাণী। লেডিকে শিশির ভরা বাটি দিয়েছিল এডো। সেটা সে নিজেও দেখেছে আর দেখিয়েছে ডিনগানকে।’

একগাল হেসে নায়া বলল, ‘না, এডো কিছু দেখেনি। আমি দেখেছি এবং সেটাই দেখিয়েছি এডো আর এই শ্বেতাঙ্গ রমণীকে। জানি, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করতে পারছ না। কিন্তু ঠরুও এটাই সত্য। এডোর দৃশ্য দেখার ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু আমার ক্ষমতা অনেক। সেই কারণেই লম্বা সময় ধরে আমার শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সবাই। আর সেই কারণেই সেদিন ডিনগানের সামনে আমার মনের কথা উচ্চারিত হয়েছে এডোর মুখ দিয়ে। কিন্তু যেদিন আমি মারা যাব সেদিন থেকে ওসব আর মনে করতে পারবে না তারা। তোমার মন যখন শূন্য ছিল তখন হয়তো তোমাকে দিয়ে ওসব ওরা মনে করাতে পারত। কিন্তু তুমিও নিজেকে ফিরে পেয়েছ। তাই ওই জ্ঞান এখন আর তোমার মধ্যেও নেই।’

র্যাচেলকে এসব অনুবাদ করে শোনাল নোয়ি। কিন্তু ডিনগানের নাম শুনেই অন্য চিন্তা মাথায় চলে এল ওর। বাকি কথার দিকে আর নজরই দিল না ও। প্রশ্ন করল, ‘ডিনগান! ডিনগানের কী হয়েছে? রিচার্ড যখন জুলুল্যাওে এল ডিনগানকে তো বেশ সুস্থ সবল দেখেছিলাম বলেই মনে পড়ে। কী হয়েছে তার? সে কি মারা গেছে?’

‘না, লেডি, মরেনি। কিন্তু আপনিই বলেছিলেন মরতে ডিনগানের খুব বেশি দেরিও নেই। তবে আপনার মনই কিছুদিনের জন্য মারা গিয়েছিল বলা চলে। সময় মতো সবই আপনি জানবেন। তবে এখন অনেক ক্লান্ত আপনি। বিশ্রাম নিন।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আসলেই, রিচার্ড মারা যাওয়ার সাথে সাথেই আমার মনটাও মারা গিয়েছিল। এখন স্মৃতি ফিরে পেয়েছি

আমি। কিন্তু স্মৃতি ফিরে পাওয়াটা আরো বেশি খারাপ হয়েছে।
আহ, নোয়ি, কেন ফিরিয়ে আনলে আমাকে। সব ভুলে থাকতে
দিলেই বেশি ভাল করতে।’

‘হয়তো, লেডি। কিন্তু আপনার ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা
আছে। না না, আবার হাসতে বা কাঁদতে শুরু করে দেবেন না
যেন,’ বলে নায়াকে কানে কানে কী যেন বলল নোয়ি।

জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল নায়া। তারপর হাতে ধরে
র্যাচেলকে টেনে নিয়ে গেল বিছানার দিকে। তারপর ফিসফিস
করে ওকে বলল, ‘শুয়ে পড়ো, লেডি। বিশ্রাম নাও,’ তারপর
সরাসরি র্যাচেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল, ‘পরে
উঠে খাওয়া দাওয়া করবে,’ তারপর ফিসফিসিয়ে একঘেয়ে কণ্ঠে
একটা গান ধরল সে।

সমস্ত আবেগের ছাপ মুছে গেল র্যাচেলের চেহারা
থেকে। ভারী হয়ে এল চোখের পাতা। ঘুমিয়ে পড়ল ও। এরপর
লম্বা সময় ধরে ঘুমোল র্যাচেল। যখন চোখ খুলল, দেখল, ওর
মাথার পাশে বসে আছে নোয়ি। আর একটু দূরে বসে ওদের
দিকে তাকিয়ে আছে সাবেক বৃক্ষমাতা নায়া। সে বলল, ‘সুন্দর
কিছু স্বপ্ন দেখেছ তুমি। তাই না, মেয়ে? সুস্থ বোধ করছ তো
এখন?’

‘হ্যাঁ। খুব বেশি সুন্দর ছিল স্বপ্নগুলো। এতই সুন্দর যে, মনে
হচ্ছে ঘুম না ভাঙলেই বেশি ভাল হতো। আর হ্যাঁ, সুস্থ আছি
অথচ মরতে চাই আমি।’

রহস্যময় কণ্ঠে নায়া বলল, ‘সে আর কঠিন কী? মৃত্যুর খোলা
দুয়ার তুমি নিজেই দেখে এসেছ। ওই দরজার ভেতর ঢুকে পড়ো।
পেয়ে যাবে যা চাইছ।’ কিন্তু পরমুহুর্তেই সে বলল, ‘নাহ,
খুব অল্প বয়স তোমার। তোমার শিরা-উপশিরায় বয়ে চলা রক্ত
এখনও উষ্ণ। ভূত, মৃত্যু আর গাছতলীর অন্ধকারাচ্ছন্নতা তোমার

জন্য নয়। তুমি হচ্ছে রোদ আর বাতাসের মানুষ। মৃত্যু তো হবে বামুনদের, স্বপ্নদ্রষ্টাদের যারা মৃত্যু পছন্দ করে। তোমার জন্য আছে জীবন, জীবনের জয়গান।’

এবার নোয়িকে র্যাচেল বলল, ‘নোয়ি, নায়াকে বলো, আমার মা-ও ভবিষ্যৎ বলতে পারত। সে-ই বলে গেছে যে, একাকী জীবন কাটাতে হবে আমাকে।’

‘হ্যাঁ, তোমার মা হয়তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমার মনে হয় তা ছিল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা কথা। কাজেই ভবিষ্যতে কী হবে সেটা ভবিষ্যতের হাতে ছাড়াই সবচেয়ে ভাল। এখন নির্ঘাত ক্ষুধা পেয়েছে তোমার। আগে খাও পরে আরার কথা বলব আমরা।’

পাশেই খাবার রাখা আছে। সেদিকে হাত বাড়াল র্যাচেল। অত্যন্ত সুস্বাদু এক ধরনের পরিজ আর অনেক ফলফলাদি আছে ওর সামনে। তবে মাংসের কোন পদ নেই। মন ভরে খেল র্যাচেল। নোয়িও খেল। তবে নায়া খেল খুবই সামান্য। নিজেকেই যেন শোনাল, ‘মরণ ঘনিজে আসছে আমার, খেয়ে কী করব আমি!’

খাওয়া শেষ হলে পরে মন্দিরের মূক ও বধির সেবায়েতরা এসে সরিয়ে নিয়ে গেল সব প্লেট-বাটি। এরপর বর্ণার পানিতে গোসল করল তিনজনেই। র্যাচেলের চুল আঁচড়ে দিল নোয়ি। পরতে দিল একদম নতুন একটা সিল্কের রোব। র্যাচেল ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় এটা তৈরি করেছে নোয়ি আর নায়া। কাপড় পরা শেষ হতেই এক সেবায়েত এসে ইশারার মাধ্যমে নায়াকে কিছু একটা বলল।

নায়া জানাল যে, অভয়াশ্রমের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এডো। কথা বলতে চায় সে।

র্যাচেল বলল, ‘আমার ভয় করছে। এডো যাবে বলে মনে হয়

না।’

‘না, ভয় পেয়ো না, লেডি। এ জায়গাটা হচ্ছে অভয়াশ্রম। এখানে তোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা কারো নেই। চলো পুরোহিতের সাথে দেখা করতে হবে। দেখা করলে ওর কাছ থেকে নতুন কোন খবর হয়তো জানতে পারব আমরা,’ বলল নায়া।

একুশ

র্যাচেল আর নোয়িকে নিয়ে এডোর সাথে দেখা করতে গেল নায়া। সূর্যের সরাসরি আলোর বাইরে ছায়ার মধ্যে বড়সড় একটা ব্যাঙের মতো বসে আছে এডো। সাথে এনেছে হানা ও আরো ক’জন পুরোহিতকে। র্যাচেলকে দেখে এডো ছাড়া বাকি সবাই উঠে দাঁড়াল। স্যালুট করল ওকে। তবে নোয়ি ও নায়াকে সম্মান দেখাল না কেউ।

নায়াকে উদ্দেশ্য করে এডো বলল, ‘মৃত্যুগুহার বাইরে কেন তুমি, নায়া? তোমার গাছটা তো পড়ে গেছে। গত রাতে আমরা ক’জন মিলে ওটার ডালগুলো ভেঙে রেখে এসেছি। যাতে কাণ্ডটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে মারা যায়।’

‘আমার গাছ মারা গেলে তবেই মরব আমি, পুরোহিত। তার আগে কিছুতেই নয়। আর মারা যাওয়ার আগে কিছু কাজ আছে আমার সেগুলোও সেরে রেখে যাব। আমার গাছের একটা অংশ

নতুন এক জায়গায় রোপণ করেছি আমি। সেটাও আবার গজিয়ে উঠতে পারে,' বলল নায়া।

‘দেখেছি। অভয়াশ্রমের দেয়ালের বাইরেই আছে সেই গাছটা। ওটার ছায়ায় কোন শাসনকারীর বসতে বসতে কয়েক প্রজন্ম পার হয়ে যাবে। তবে এখন যেহেতু তুমি আর আমাদের রাণী নও, সেহেতু তোমার যখন ইচ্ছা মরতে পার। হাতে শোনা দুয়েকজন অবশ্য আছে যারা এখনও তোমার পক্ষে বলবে। তবে তাদেরও বেশ কিছু অভয়াশ্রমের মৃত্যুগুহায় চলে গেছে। ওরা অপেক্ষা করবে ভূতরূপে তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য,’ বলল এডো।

‘তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমি। ভূতের দুনিয়ায় একসাথে রাজত্ব করব আমরা।’

‘আর হ্যাঁ, আমাদের একজনকে তোমার কালো জাদু দিয়ে কীভাবে লাল মৃত্যু দিয়েছ তা দেখে বাকি সবাই তোমার বিপক্ষে চলে গেছে। এই কথা অবশ্য আগেও বলেছি।’

‘কে আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে, এডো? এখানে আসার পথে কে আমার দিকে বিষাক্ত তীর ছুঁড়েছে?’

‘জানি না কে ছুঁড়েছে। তবে যে-ই ছুঁড়ুক, ভাল তীরন্দাজ সে নয়। নইলে এখনও তুমি দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকো কী করে? আসল কথা হচ্ছে, তোমার কূট-শাসন অনেকদিন ধরে সহ্য করেছি আমরা। ব্যাপারটা বোকামি ছাড়া কিছু ছিল না। তবে এসবের অবসান হয়েছে। আগের রাণীর গাছ যেমন তোমার পায়ে পড়েছিল, তেমন তোমার গাছও পড়েছে এই শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজের পায়ে। অনেকদিন ধরে ক্ষমতার জন্য লেড়েছি তুমি আর আমি। কিন্তু অবশেষে জয় হয়েছে আমার। তোমার কথা কেউ আর মনে রাখবে না। রাখার দুরকারই বা কী? না আছে তোমার সৌন্দর্য, না তারুণ্য, না আছে ক্ষমতা আর না আছে ধৈর্যশক্তি। কাজেই

তীরের ব্যর্থ নিশানা, শান্তিতে থাকো তুমি।’

বিষাক্ত হুলের মতো শব্দের খোঁচায় ভীষণ রেগে গেছে নায়া। তাই এডোর কথার জবাবে সে বলল, ‘আমি শান্তিতেই থাকব। কিন্তু তুমি শান্তি পাবে না। যারা তোমাকে অনুসরণ করে তারাও না। আরেকটা কথা মনে রেখো, পুরোহিত। যখন তারুণ্য ও লাভণ্য বিদায় নেয় তখন থেকেই জ্ঞানী হতে শুরু করে মানুষ। গত রাতে আমার শিশিরের বাটিতে চোখ রেখেছিলাম। ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি। মহা দুর্য়োগ ঘনিয়ে আসছে। যখন থেকে আমাদের জাতির আত্মা এই গাছের ভেতর প্রবেশ করেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনো এত বড় বিপর্যয় আমাদের ওপর আসেনি। কিন্তু ওসব লুকিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের দৃষ্টি থেকে।’

‘তা-ই? বলো তো ঠিক কী দেখেছ?’ চেহারা থেকে নিজের মনোভাব সরাতে লুকিয়ে রাখলেও এডোর চোখে ফুটে ওঠা ভীতির ছাপ নায়ার অভিজ্ঞ চোখে ঠিকই ধরা পড়ে গেল।

‘না, পুরোহিত। আমি আর কিছু বলব না। দেখতে থাকো, নিজেই একসময় জানবে। তোমরা সবাই দেখবে। বহুদিন ধরে তোমাদের সেবা করেছি আমি। সবসময় সাদা জাদুর চর্চা করেছি। কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিইনি। বাঁচানো সম্ভব এমন কাউকে মরতে দিইনি। কষ্ট দিইনি এমন কাউকে, যাকে রক্ষা করা সম্ভব। এমনকী দাস হিসেবে যারা আমাদের সেবা করে তাদের সাথেও অবিচার করিনি আমি। শুধু ভেবে, পুরোহিত, আমি সবসময়ই জানতাম, পেছনে থেকে সর্বদাই আমাকে হত্যার ছক কষছ তুমি। চেষ্টা করছ জাদু দিয়ে বা বাণ মেরে আমার গাছটাকে হত্যা করতে। আমি আরো জানতাম আমাদের শেষ হবে কীভাবে। আমি আগেই জেনেছিলাম যে এই শ্বেতাঙ্গ তরুণীর পায়েই পড়বে আমার গাছ। তাই আমিই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম ওকে আনতে। কিন্তু মাঝখান থেকে তুমি

ভাবলে অসহায় মেয়েটিকে তোমার কজায় নিয়ে তার হয়ে শাসনক্ষমতা দখল করবে তুমি। বোকা এডো। আমি আগে থেকেই জানতাম কী হতে যাচ্ছে আর কীভাবে তা হবে। সেয়াপির কথা মনে আছে তোমার? আমার রক্তের লোক ছিল সে। বিনা কারণে, অন্যায় অপবাদ দিয়ে গোত্র থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি। তার ভূতই আমাকে বলেছে তার মেয়ে ন্যায়ির কথা। সেই সাথে বলেছে এই শ্বেতাঙ্গ তরুণীর কথা। কীভাবে কী হবে সেই কথাও সে বলেছে আমাকে। আর তুমি বুদ্ধ কিনা ভাবছ, তুমিই একে জুলুল্যাও থেকে নিয়ে এসেছ। আমাদের যার ভাগ্যে যা হওয়ার ছিল তা-ই হয়েছে। আমার গাছ ওর পায়ে পড়েছে। কিন্তু আমাকে লাল মৃত্যু দেয়ার বদলে সে দিয়েছে ভালবাসা। বিনিময়ে তাকেও ভালবাসা আর মমত্ব দিয়েছি আমি। আর কিছু আমার বলার নেই। বাকিটা যখন ঘটবে নিজেরাই দেখবে। হ্যাঁ, আমি মারা যাচ্ছি। তবে অন্য জায়গায় আবার বেঁচে উঠব। আর সবার মতো তোমরাও তা দেখবে।’

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এডো। কিন্তু নায়ার কথা শুনে যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেছে হানা। তাই এডোর আস্তিন ধরে নিষেধ করল ওকে। তারপর ফিসফিস করে কিছু একটা বলল তার কানে।

নোয়িকে অনুবাদ করতে বলে র্যাচেলের উদ্দেশ্যে সে বলল, ‘মেয়ে, এই বুড়ির কথায় কান দিয়ো না, আমার কথা শোনো। যখন তোমার আত্মা তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল এমনকী তখনও তোমার ভেতর বিশাল কিছুর আভাস দেখেছিলাম আমি। তাই আমিই ডিনগানের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি তোমায়। আমি, হানা আর পানি আমরা তিনজনই দেখেছিলাম যে, নায়ার গাছ পড়বে তোমার পায়ে। তাই তুমিই হবে আমাদের পরবর্তী রাণী। ভূত জাতির সবাই এই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। তাই তারা

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে তাদের শাসক বৃক্ষমাতা বলে মেনে নিয়েছে। তোমার জন্য নতুন, অনেক বড় ও শক্তিশালী এক গাছ বেছে দিয়েছে তারা। অনেক অনেক দিন বাঁচবে তোমার জন্য নির্ধারিত ওই গাছটি। চলো আমার সাথে। ওই গাছের ছায়ায় নিজের আসল জায়গা খুঁজে নাও। রাণী হয়ে শাসন করো ভূত জাতির লোকদের।’

‘কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তোমরা বামুনরা তোমাদের রাণীর জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু কামনা করো না। না, আমি যাব না। অন্য কাউকে খুঁজে নাও,’ বলল র্যাচেল।

‘এই কাজটা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই, ইনকোসাজানা। কে পরবর্তী রাণী হবে তা নির্ধারণ করে আমাদের জাতির আত্মা। কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করব, মহান এক রাণী বানাব তোমাকে। তোমার ছায়ায় বড় হয়ে উঠব আমরাও। তুমিও তোমার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবে আমাদের। যদিও নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এখনও তুমি অবগত নও। সাগরের এক তীর থেকে অপর তীর পর্যন্ত সবাই মাথা ঝোঁকাবে তোমার সামনে। শুনতে চাইবে তোমার মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী। তাদের সমস্ত সম্পদ তোমার হবে। রাতাস যেমন মেঘকে তাড়িয়ে বেড়ায় তেমন তাদেরকে এখান থেকে ওখানে তাড়িয়ে বেড়াবে তুমি। তোমার হুকুমে যুদ্ধ শুরু হবে আর তোমার হুকুমেই আসবে শান্তি। ইচ্ছামতো শত্রুর জীবন মৃত্যুর ভাগ্য নির্ধারণ করবে তুমি। ওইসব জাতির রাজারা হাঁটু মুড়ে বসে কাঁপতে থাকবে তোমার সামনে। ভেট নিয়ে তোমার সামনে হাজির হবে তাদের রাজকুমাররা। দেবীর মতো রাজত্ব করবে তুমি।’

পেছন থেকে ফিসফিস করে নায়া ঝিল্ল, ‘যতদিন এডোকে সম্ভ্রষ্ট রাখতে পারবে, ততদিনই এসব পাবে তুমি। কিন্তু তারপর

তোমার শেষ ডেকে আনবে এডো। ঠিক যেমনটা এনেছে আমার বেলায়। তাই বলছি, শাসকের আসনে না বসলেই ভাল করবে, মেয়ে। সাধারণ মানুষ হয়েই বরং জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবে।’

এবার নোয়িকে অনুবাদ করতে বলে র্যাচেল বলল, ‘তুমি বলতে চাইছ, এডো, যে আসলে দেশ শাসন করবে তুমি আর আমি হব তোমার আজীবন দাস। কিন্তু আমি কখনোই কারো দাস হব না। এখানে যখন এসেছিলাম তখন প্রচণ্ড বেদনায় মানসিক ভারসাম্য ছিল না আমার। কিন্তু এখন আমি স্বাভাবিক। কাজেই কারো কথার পুতুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।’

এবার ভীষণ রেগে গেল এডো। বলল, ‘সমগ্র ভূত জাতির নামে শপথ করে বলছি, জুলা, এখান থেকে তুমি জীবিত বের হতে পারবে না। অভয়াশ্রমের ভেতরে অবশ্যই তুমি নিরাপদ। কিন্তু আজ হোক বা কাল, এখান থেকে তোমাকে টেনে বের করার একটা উপায় আমি অবশ্যই খুঁজে বের করব। তখন বুঝবে কে বেশি শক্তিশালী, তুমি না এডো। তোমার পেছনে বসে থাকা বুড়ি নায়াও সেটা বুঝেছে, সময়মতো তুমিও বুঝবে। কিছুদিনের জন্য বিদায়। লোকদের বলব তুমি অসুস্থ তাই এখানে বিশ্রাম নিচ্ছ। তুমি এখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তোমার নামে শাসন করব আমি। বিদায়, ইনকোসাজানা,’ বলে হানা ও অন্যান্য পুরোহিতদের সাথে নিয়ে উঠে চলে গেল এডো। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। মৃত্যু বৃক্ষ দেখিয়ে নায়াকে বলল, ‘যারা তোমাকে পছন্দ করত তারা সবাই মরার জন্য এখানে চলে গেছে। তুমি কেন পিছে পড়ে রইলে? মরতে ভয় পাও নাকি, বুড়ি ভাম?’

জবাবে নায়া বলল, ‘না, কাপুরুষ এডো। ভাল মানুষগুলোকে মরতে বাধ্য করেছে তুমি, যাতে ইচ্ছেমতো শয়তানি করতে পার।

কিন্তু মনে রেখো, আমার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। সময়ের আগে আমি মরব না। এমনকী আমি নিজে চাইলেও না।’

দূরে দাঁড়িয়েই শুনল এডো। সাদা হয়ে গেল ওর চেহারা। তারপরই রাগে লাফালাফি জুড়ে দিল। তারপর ব্যাঙ যেভাবে বিষ ছুঁড়ে দেয়, সেভাবেই অভিশাপ “ছুঁড়তে” লাগল সে। তবে ওসবে বিন্দুমাত্র কান দিল না নায়া। নিজের গুহায় ফিরে এল। শান্তভাবে বসে পড়ল বিছানার ওপর।

র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল, ‘লোকটা তোমাকে এত ঘৃণা করে কেন, নায়া?’

স্মিত হেসে নায়া বলল, ‘এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। যারা খারাপ তারা ভাল মানুষদের সহ্য করতে পারে না, ঘৃণা করে। বহু বছর ধরেই এডো চাইত আমার নাম ব্যবহার করে এদেশ শাসন করতে। চাইত ওর খারাপ ইচ্ছাগুলো আমাকে দিয়ে পূরণ করিয়ে নিতে। কিন্তু ওকে সেই সুযোগ কখনোই আমি দিইনি। ও শাসকের আসনে বসলে সবার কাছেই আমাদের জাতির গোপন ব্যাপারগুলো ফাঁস করে দিত। শুদ্ধ জ্ঞানের বদলে জুলু রাজা ডিনগানের মতো বাহুবলে, ভয় দেখিয়ে শাসন করত ও। দাস জাতিগুলোকে পাঠিয়ে দিত লড়াই করার জন্য। তাদের দিয়ে দেশ জয় করত। নিজের জন্য বিশাল বাড়ি বানাত, অজস্র স্ত্রী গ্রহণ করত। আর ওসব করার পথে আমিই ছিলাম ওর সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই অহোরাত্রি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে সে। কিন্তু ওর চেয়ে আমার জাদু অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার গাছ যতদিন দাঁড়িয়ে ছিল আমার হুকুম মানতে বাধ্য ছিল ও। কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডন করা যায় না। আমার গাছটা তোমার পায়ে আছড়ে পড়ল। তখনি আমাকে লাল মৃত্যু দিত এডো। কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। সেজন্য প্রাণভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি আমি।’

‘কিন্তু তোমার জায়গায় আমাকে কেন বৃক্ষমাতা বানাতে চায় এডো?’ র্যাচেলের প্রশ্ন।

‘কারণ আমার গাছটা তোমার পায়েই পড়েছে। আর ভূত জাতির সবার ইচ্ছা তোমাকে আমাদের রাণী বানাবে। উপরন্তু গাছটা তোমার পায়ে পড়ায় তোমার আর আমাদের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। তাছাড়া এডো মনে করে, কোনভাবে তোমার সাথে ওর রক্তের বন্ধন আছে। যেহেতু তোমার আত্মা বিশুদ্ধ, তাই ও শাসন করলেও ওর পাপের পরিণাম থেকে ওকে বাঁচাবে তোমার আত্মা। আর তোমার ভেতরে বিশেষ জ্ঞান আর ক্ষমতা আছে। এডোও সেটা দেখেছে। তাই ও ভাবে তোমার জ্ঞান ও ক্ষমতা ব্যবহার করে ভূত জাতির যে কারো চেয়ে অনেক বড় মানুষ হতে পারবে ও। তবে কোনভাবে তুমি যদি ওকে অসন্তুষ্ট করো, তাহলে ছলে-বলে-কৌশলে তেঁমাকে শাসকের আসন থেকে সরিয়ে দেবে। তারপর আবার নিজের ইচ্ছে মারফিক কাউকে বসাবে ওখানে। তবে চিন্তা করো না। এখানে অভয়াশ্রমের ভেতর অবশ্যই নিরাপদ তুমি।’

‘হয়তো তা-ই, মা। কিন্তু এখানে তো আজীবন থাকতে পারব না। আমার নিজের ভেতরও গুমরে মরছে অনেক দুঃখ। হয়তো ওই দুঃখী মানুষগুলোর মতো আমাকেও ওই মৃত্যুগুহায় আশ্রয় নিতে যেতে হবে,’ বলল র্যাচেল।

নায়া বলল, ‘তোমার কষ্টের সব কারণ আমি এখনও জানি না। সব খুলে বলো আমায়। হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি।’

জ্ঞান থাকা পর্যন্ত যা যা র্যাচেল দেখছে সেভাবে জুলুল্যাও যাওয়া, থাকতে বাধ্য হওয়া, বাবা মা আর শেষ আশ্রয় ভালবাসার মানুষটির মৃতদেহ চোখের সামনে দেখা পর্যন্ত খুলে বলল সব। এর মধ্যে একবারও বাঁধা দেয়নি নায়া। র্যাচেলের গল্প শুনে খুবই

কষ্ট পেল সে। আফসোস করে বলল বাইরের দুনিয়া আসলেই খুব খারাপ। এখানে অন্তত মানুষকে ইচ্ছাকৃত রক্তপাত দেখতে হয় না বললেই চলে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘বলো, মেয়ে, তোমার ইচ্ছা কী? কী চাও তুমি?’

র্যাচেল বলল, ‘আমার বাবা মা আর প্রিয়তমের সাথে মিলিত হতে চাই আমি।’

‘কিন্তু তারা সবাই যদি মারাই গিয়ে থাকে তো মৃত্যু ছাড়া তাদের সাথে তুমি মিলিত হবে কী করে? আর মৃত্যুই যদি তোমার চাহিদা হয়, তো জীবন-মৃত্যু বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসো। ওই গাছের বিষ বাষ্পে অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু খুঁজে পাবে তুমি।’

‘না, মা, তা করব না। কারণ সেটা হবে আত্মহত্যা। আমার ধর্ম বলে এর চেয়ে বড় পাপ খুব কমই আছে।’

‘তাহলে স্বয়ং মৃত্যু তোমাকে খুঁজে না নেয়া পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করতেই হবে। তবে সেই পথটা হবে অনেক লম্বা,’ বলল নায়া।

‘হ্যাঁ, মা। জীবনটা এখনই আমার কাছে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে। জানি না কীভাবে বাকি জীবন কাটাব আমি। এক নোয়িকে ছাড়া এখানে আমার এমনকী আর কোন বন্ধুও নেই।’

‘না, আরেকজন আছে,’ বলে নিজেকে দেখাল নায়া। তারপর বলল, ‘তবে আমার সময় খুব কম।’ তারপর চুপ হয়ে গেল সবাই। হঠাৎ নায়া প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি সাহসী, মেয়ে?’

‘জুলুরা তো বলত আমার নাকি অনেক সাহস। কিন্তু এখানে এই অবস্থায় সাহস আমার কী কাজে লাগবে?’

‘শোনো, মেয়ে, শরীরের সাহসে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু মনে সাহস থাকাটাই আসল। ওটার অনেক মূল্য। আচ্ছা, তুমি বললে তোমার ভালবাসার পাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এখন ওকে যদি ওপাড়ে তোমার জন্য অপেক্ষারত দেখ তাহলে কি তোমার ভাল

লাগবে?’

একটা যেন আনন্দ আলো জ্বলে উঠল র্যাচেলের চোখে। বলল, ‘ভাল লাগবে কি না? কী জানি, হয়তো লাগবে। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। জীবন আর মৃত্যু, দুই নদীর পথ দু’দিকে চলে গেছে। স্বয়ং মৃত্যু ছাড়া ওই নদীতে চোখ বুলানো কোন জীবিত মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।’

‘অন্যদের জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু আমার এখনও অনেক ক্ষমতা আছে,’ বলছে নায়া, ‘তোমার আত্মা শুদ্ধ। সম্ভবত তোমাকে মৃত্যু নদীর ওপাড়ে পাঠিয়ে আবার জীবিতদের মাঝে ফিরিয়েও আনতে পারব আমি। কিন্তু সেটা হবে ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ। অবশ্য আমার জন্য সেই বিপদ কিছুই না। তবে তোমাকেই বিপদের মোকাবেলা করতে হবে বেশি। এমনও হতে পারে, যেখানে তোমাকে পাঠাব সেখানেই হয়তো তোমাকে থেকেও যেতে হতে পারে।’

‘যদি ওই জগতে ওকে খুঁজে পাই তো ওখানে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। পাঠাও, মা, যতো শীঘ্র সম্ভব ওখানে পাঠিয়ে দাও আমায়। বাঁচি বা মরি, সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করব আমি,’ বলল আপ্ত র্যাচেল।

একটু চিন্তা করল নায়া। তারপর বলল, ‘কেবল তোমার জন্য চেষ্টা করব আমি। কারণ লাল মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছে তুমি। তবে এখনই না। আগে খাও। নইলে কিছুই করব না।’

কাজেই খেল র্যাচেল। একটু ঝিমুনি আসার ঘুমিয়েও নিল খানিক। হয়তো ক্লান্ত ছিল ও, হয়তো খাবারের সাথে কোন ওষুধ মেশানো ছিল যার প্রভাবে ঘুমিয়েছে ও। তবু আসলে কী হয়েছে কে জানে। যা হোক, ঘুম ভাঙার পর র্যাচেলকে নিয়ে গুহামুখে গেল নায়া। নীরবে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখল দু’জনে। এক

ফোঁটাও বাতাস নেই কোথাও। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কিছুক্ষণ পরপর বন থেকে ভেসে আসছে বজ্রপাতের মতো আওয়াজ। মৃত গাছের কাণ্ড ফেটে আছড়ে পড়ার শব্দ ওটা। কখনো বজ্রপাতের মতো আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ছে কোন গাছ, আবার ভোঁতা “ধুপ” আওয়াজ কানে আসছে। অর্থাৎ গাছটা দূরে কোথাও পড়েছে। এক এই কাণ্ড ফাটা ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। বিশ্ব চরাচর যেন ডুবে আছে নিস্তন্ধতার সাগরে।

আজই প্রথম এই নীরবতা আর রহস্যময়তার অনুভবে ভয় ভয় লাগছে র্যাচেলের। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎই সাহস ফিরে পেল ও। এটাও অনুভব করল হঠাৎ পাওয়া সাহসের অনুভূতির উৎস হচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাবেক বৃক্ষমাতা নায়া। যার কাছে রয়েছে ওদের জাতির কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার।

নরম কণ্ঠে নায়া বলল, ‘দেখো, এই রাত আর আকাশের তারাগুলো দেখে নাও। হতে পারে এদের সাথে এটাই তোমার শেষ রাত। যেখানে যাবে সেখান থেকে আর না-ও ফিরতে পার তুমি। কি, ভয় পাচ্ছ? ভয় পেলে বলো, তাহলে আর ওখানে তোমাকে পাঠাব না।’

‘না, মা, ভয় পাচ্ছি না। তবে যাচ্ছি কোথায় বলুন তো।’

‘মৃতদের দেশে যাবে। এসো, সময় হয়ে গেছে প্রায়। পবিত্র গাছের মাথার ওপর চলে এসেছে বড় তারাটা।’

তখন নোয়ি বলল, ‘মা, লেডির সাথে আমিও যেতে চাই। মৃতদের দেশে আমার পরম আত্মীয়রা আছে। হ্যাঁড়া আমার বোন যেখানে যায় সেখানে আমিও তার সাথে যাই।’

‘বেশ তুমিও যাবে, সেয়াপির মেয়ে। তবে আমি এখানেই থাকব। যেহেতু তুমি আমার রক্ত তাই তোমাকে সহ লেডিকে মৃত্যুলোক থেকে এদিকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে,’ নোয়িকে

বলল নায়া। এ পর্যন্ত বলে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ওখানে স্ট্যালাকটাইটের খুঁটির সামনে কতগুলো জ্বলন্ত মোম পাশাপাশি দাঁড়া করিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। সেই বৃত্তের ভেতর ঢুকে মেঝেতে বসল সে। তারপর নোয়ি আর র্যাচেলকে বলল তার দিকে মুখ করে বসতে। তখনি গুহায় ঢুকল দু'জন বোবা কালা মহিলা। নায়ার দু'পাশে বসল তারা। তাদের সামনে রাখা শিশির পাত্রের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দু'জনেই। ওদেরকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল নায়া। তখন মহিলা দু'জন কোথেকে যেন বের করল ছোট দুটো ড্রাম। কাঠির আঘাতে ড্রাম থেকে অদ্ভুত একটা একঘেয়ে সুর তুলল তারা। সেই সাথে ততোধিক অদ্ভুত ও বন্য ধরনের একটা গান ধরল সাবেক বৃক্ষমাতা নায়া। ভীষণ লম্বা একটা গান। তারপর র্যাচেল আর নোয়ির ডান হাত ধরে ওদের চোখে তাকিয়ে রইল সে।

র্যাচেল অনুভব করল কিছু একটা পরিবর্তন আসছে ওর আশপাশে। ইতিমধ্যেই ওর চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে নায়ার দু'পাশে বসে থাকা মহিলা দু'জন। তবে ড্রামের আওয়াজ তখনও কানে আসছে। শুধু আসছেই না, পূর্ণাঙ্গ গানের রূপ নিয়েছে সেটা। আশপাশের দৃশ্যগুলো অন্যরকম হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছে আকাশের তারা। ড্রামের সুরে এমনকী নাচতে শুরু করেছে সেই তারাগুলোও!

নায়ার গানের শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সূর্যমুখীনে। র্যাচেলের মনে হলো যেন পুরো আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে গানের শব্দে। গানের শব্দে যেন ঝড় উঠল বন বন্যাসীতে। বিশাল সব ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল কূলের ওপর। রণহংকার দিয়ে উঠল হাজার হাজার সৈন্য। একই সাথে কানে আসতে লাগল হাজারো নারীর আর্তনাদ! ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করল এই সমস্ত শব্দ। মনে হলো যেন এসব ছেড়ে এগিয়ে চলেছে র্যাচেল।

ওর অনেক নীচ থেকে ভেসে আসছে মৃদু থেকে মৃদুতর হতে থাকা এসব শব্দ। কমতে কমতে একসময় নেই হয়ে গেল দুনিয়াবি এসব আওয়াজ।

শুরু হলো নতুন এক গান। যেন শূন্য স্থান থেকে উঠে আসছে রহস্যময় শব্দগুলো, এ যেন অন্য জগতের গান। র্যাচেলের চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্ধকার আকাশ তারপর একাধিক গ্রহ নক্ষত্র। মনে হতে লাগল বজ্রধ্বনিতে কেউ একজন গাইছে কিছু একটা। আর তার উত্তরে ভেসে আসছে লাখো কণ্ঠে তার জবাব। এমনই গুরুগম্ভীর সেই আওয়াজ, মনে হচ্ছে যেন একটা সূর্যকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অপর একটা সূর্য। ফলে প্রলয়ঙ্করী সেই শব্দের দাপটে কেঁপে উঠছে স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক। তীব্র গতিতে ছুটে চলা র্যাচেল একে একে ওসবকেও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। হারিয়ে গেল অপার্থিব গানের আওয়াজও।

একসময় র্যাচেলের মনে হতে লাগল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমার বাইরে চলে এসেছে ও। এখানে প্রাণের কোন নাম নিশানা নেই। প্রাণ ধারণের উপযোগী কিছুই নেই। গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু, ধূম্রজাল কিছুই নেই। আছে কেবল নিঃসীম শূন্যতা। তবে হ্যাঁ, বহুদূরে অতি উজ্জ্বল একটা আলোক বিন্দু আছে। ভীতিকর কিছু একটা আছে সেই আলোর ভেতর। র্যাচেলের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিল অপার্থিব জিনিসটার উপস্থিতি। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওঁদিকে অসিয়ে নেয়া হলো র্যাচেলকে। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ও। মুহূর্তের ভেতর আলোর উৎসটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও। তারপর অনেক লম্বা একটা সময় অপেক্ষা করতে হলো র্যাচেলকে। একসময় ও ভাবল, ‘দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা যদি পেতাম!’

ওহ, কী অদ্ভুত। সত্যিই ওর সামনে আকৃতি পেতে থাকল চারদিকে ক্রিফ ঘেরা টাওয়ারের মতো উঁচু একটা ধাতব কাঠামো।

ঠিক যেন একটা বন্দর। সেই বন্দরের তীরে যেন আছড়ে পড়ছে মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা অন্ধকারের ঢেউ। পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরেও যাচ্ছে সেগুলো। সেখানে আলো আছে বটে, কিন্তু সেই আলোর এমনই প্রকৃতি যা বর্ণনারও অতীত। বলা বাহুল্য, এমন কিছু দেখার কোন অভিজ্ঞতা র্যাচেলের নেই। সম্ভবত কোন মানুষেরই নেই। অন্তত তা-ই র্যাচেলের ধারণা। এই আলো দূর্য থেকে আসা নয়, এমনকী কোন নক্ষত্র থেকে ধার করাও নয়। কিন্তু তবুও তা অদ্ভুত দীপ্তি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে।

ধীরে ধীরে কিছু আকৃতি ধরা দিতে শুরু করল র্যাচেলের চোখে। ওর মনে হলো আলোর জেল্লাটাকে ওপেল থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সেই আলোয় ওর চোখে পড়ল অসাধারণ সুন্দর সব প্রাসাদ, পিরামিড আকৃতির কাঠামো, আদিগন্ত বিস্তৃত সাগর, দুধ-সাদা পাহাড়, বিশাল সমতল ভূমি ইত্যাদি। সেখানে ফুটে আছে অজানা সব রঙের ফুল। আর চোখে পড়ল মলিন রঙা তরল সমৃদ্ধ এক লেক। ওই তরলের ওপর দাউদাউ করে জ্বলছে ভয়াবহ আগুন। যা-ই চোখে পড়ল হয় সেগুলো ভীষণ সুন্দর নয়তো অসম্ভব ভয়ঙ্কর। ফুলের পাপড়ির মতো একের পর এক আশ্চর্য সব জনপদের জন্ম হচ্ছে সেই আলোর ভেতর। এবং মুহূর্তের ভেতর ফুলের পাপড়ির মতো ঝরেও পড়ছে সেগুলো। গায়ের হয়ে যাচ্ছে অতল মহাশূন্যের ভেতর। পরমুহূর্তেই আবার ওখানে তৈরি হচ্ছে আরো সুন্দর, আরো চমৎকার আরো আশ্চর্য এক দুনিয়া। কিন্তু সেটাও ঝরে পড়ছে। সেটার জায়গা নিচ্ছে নতুন, আরো নিখুঁত এক জগৎ।

এই দৃশ্যগুলো একমুহূর্তেই দেখল, নাকি ইতিমধ্যে লক্ষ বছর কেটে গেছে, বলতে পারবে না র্যাচেল। তন্ময় হয়ে আশ্চর্য এই লীলা দেখছে ও। মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল আগুনের সাগর

পরমুহূর্তেই সেখানে হয়ে গেল ফুলে ভরা ঘাসের মাঠ। এক নগরে যদি দেখা যাচ্ছে অনিন্দ্য সুন্দর থাম-কলামে সমৃদ্ধ কোন প্রাসাদ, পরের মুহূর্তেই সেটা হয়ে গেল আরো নিখুঁত শতগুণ সুন্দর এক সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি। একইভাবে বদলে গেল আকাশ, সাগর, পাহাড় সবকিছু। এইসব র‍্যাচেলের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতার অনেক বাইরের ব্যাপার।

এভাবে বহু সময় কেটে যাওয়ার পর র‍্যাচেলের মনে হলো যেন ওর হাত ধরেছে কেউ। ওকে টেনে নীচের দিকে নিয়ে চলল অদৃশ্য সেই হাতটা। একসময় র‍্যাচেল দেখল অগণিত আলোক বিন্দু ঘিরে আছে ওকে। বিন্দুগুলোর পেছনে আছে অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মতো চেহারা। ধোঁয়াশার পেছনে ঝকঝক করছে তাদের উজ্জ্বল সোনালী চোখ। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তারা সবাই। ওকে নিয়েই যেন ফিসফিস করে কথা বলছে তারা। তাদের ফিসফিসানির আওয়াজে তৈরি হচ্ছে শান্ত সাগরে ওঠা ঢেউয়ের মতো শব্দ!

ওপেল রঙা আলোর উৎস পর্যন্ত ওকে সজ্জ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল তারা। ওখান থেকে ওকে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ধূসর রঙের বিরটি এক হলঘরে। মাথার ওপর হেলে থাকা পাহাড়ি ক্লিফগুলো মিলিত হয়ে তৈরি করেছে হলঘরটার ছাদ। এখানে ওকে বসিয়ে রেখে গায়েব হয়ে গেল উজ্জ্বল সোনালী আলোক বিন্দুর মতো চোখওয়ালা অস্পষ্ট মুখচ্ছবিগুলো।

নীরবতা, পিন-পতন নীরবতা। নিস্তর্রতা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে র‍্যাচেলকে। একা এভাবে কত শতাব্দী ধরে র‍্যাচেল বসে আছে বলতে পারবে না ও। একাকীত্ব যেন জীবিত প্রাণী। তার অদৃশ্য হাত যেন আঁকড়ে ধরেছে র‍্যাচেলকে। দম নিতে পারছে না ও। আর কয়েক মুহূর্ত এভাবে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু হবে ওর। র‍্যাচেল বলতে পারবে না যে, এভাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে

গেছে নাকি কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছে। মরতে মরতেও আবার বেঁচে উঠল ও। চোখের সামনে আগের মতোই আকৃতি নিয়েছে একটা শারীরিক কাঠামো। তবে এবার আর আগেরগুলো নয়। এই কাঠামোটাও ধোঁয়ার মতো। কেবল নড়াচড়া করলেই চোখে পড়ে যে কিছু একটা আছে এখানে। তবে এর শরীরটা বিশাল। তার চোখগুলোও দেখতে পারছে র্যাচেল। দানবীয় কাঠামোর অনেক ওপরে সেই চোখগুলো। যেন অনেক ওপর থেকে একটা শিশুর দিকে তাকিয়ে আছে বিশাল এক দানব। কয়েক মুহূর্তেই র্যাচেল অনুভব করল, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বিশাল দেহধারী ধোঁয়াটে কাঠামো।

বড় ভয়ানক সেই চোখ। কিন্তু তবুও খানিক স্বস্তি পাচ্ছে র্যাচেল। অন্তত একাকীত্বের অত্যাচার ওকে সহিতে হচ্ছে না। “তারা” অন্তত জীবিত! বিশালদেহী ছায়াগুলোর মধ্যে ততোধিক বিশাল একটা ছায়া ঝুঁকে এল ওর দিকে। নিজের মাথার ভেতর তার কণ্ঠ শুনতে পেল র্যাচেল। সে জিজ্ঞেস করছে, কী এমন হয়েছে যে, সময়ের আগে, আয়ু শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুলোকে হাজির হয়েছে র্যাচেল। র্যাচেলও মনে মনে জবাব দিল যে, যাদের সে ভালবাসত তাদের সবাই মারা গেছে। তাদেরই খুঁজতে এসেছে সে।

সাথে সাথেই মনের কানে র্যাচেল শুনল, সেই কণ্ঠটা হুকুম করছে, ‘র্যাচেলের সাথে সম্পর্কিত সকল মৃতদেরকে ওর সামনে হাজির করো।’

ধূসর হলটার শেষ প্রান্তে খুলে গেল বিশাল এক দরজার পালা। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল উড়ন্ত ধোঁয়াশার মতো অস্পষ্ট এক কাঠামো। দু’হাতে আলগোছে কোলে করে নিয়ে এসেছে এক শিশু বাচ্চা। বাচ্চাটি হচ্ছে পণ্ডা ল্যাণ্ডের উপকূলে সমাহিত করা ওর ছোট্ট ভাই। চোখ খুলে বাচ্চাটা ওকে দেখল এবং র্যাচেলের

চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার। এরপরই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বাচ্চাটাকে। এরপর এভাবে একে একে আনতে শুরু করল ওর পরিচিত সবাইকেই। সেই স্কুল জীবনের বন্ধু থেকে শুরু করে সবাইকেই। একসময় আনা হলো জুলু যোদ্ধাকে। নোয়িকে বাঁচাতে গিয়ে যাকে হত্যা করেছিল ও। লোকটাকে দেখে খানিক কঁকড়ে গেল র্যাচেল। কারণ ওর রক্ত লেগে আছে র্যাচেলের হাতে। তবে বাকি সবার মতো এই লোকটাও র্যাচেলের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার। এরপরই এল সেই নারী ওঝা, ইনকোসাজানা হিসেবে জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশের সময় জুলুদের হাতে মারা গিয়েছিল যে। সে হাসলও না আবার রাগও করল না। স্রেফ চলে গেল। এবার এল ওর মা। তার চোখে আনন্দের দৃষ্টি। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে র্যাচেলের মাথার ওপর হাত তুলে দিল সে। র্যাচেল চেষ্টা করল তার সাথে কথা বলতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এরপর আনা হলো ওর বাবাকে। সে-ও আশীর্বাদ করে গেল ওকে। তার উপস্থিতিতে র্যাচেলের মনে হলো ওর আত্মা তো দটেই, পুরো জায়গাটাতেই শান্তির ছায়া পড়ল। এরপরে উপস্থিত করা হলো কালো আত্মা ইসমাইলকে। চোখে আবেদন নিয়ে মাথা তুলে তাকাল সে। ঝড় উঠল র্যাচেলের মনে। ক্ষমা চাইছ! ক্ষমা করব? কিন্তু কেন? তুমিই তো হত্যা করেছ আমার পছন্দের সব মানুষকে।

মুহূর্তের মধ্যেই ঘরে হাজির হলো প্রথমে দেখা সেই জুলু সোনালী চোখওয়ালা আত্মা। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমনকী ধোঁয়ার মতো দানবীয় কাঠামোগুলোও ওকে দেখছে। সবাই অপেক্ষা করছে ওর সিদ্ধান্তের জন্য। একসময় মন নরম হয়ে গেল র্যাচেলের। আশীর্বাদের মতো করে হাত তুলল ও। প্রথমবারের মতো মুখে কিছু বলার ক্ষমতা পেল র্যাচেল। বলল, 'আমিও যেহেতু ভবিষ্যতে ক্ষমার আশা করি, তাই ক্ষমা করলাম

তোমাকে । শান্তিতে থেকো ।’

ঘণ্টা ধ্বনির মতো পুরো ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল র্যাচেলের কথাগুলো । ইসমাইলকে সরিয়ে নেয়ার পর থামল এই আওয়াজ । এরপর নিজ পায়ে হেঁটে এল বামুন একজন মানুষ, সাথে সাথেই তাকে চিনে ফেলল র্যাচেল । এ হচ্ছে পানি, এডোর ভাই ও সহ-পুরোহিত । পৃথিবীতেই সে ছিল আধা ভূত, কাজেই এখানে পায়ে হাঁটার ক্ষমতা পেয়েছে সে । র্যাচেলকে কিছুই বলল না সে । লজ্জিতমুখে ওর সামনে এল আর অধোবদনেই চলে গেল ।

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল হলঘরটার শেষ মাথার দরজা । মেঘের মতো ধোঁয়ায় ভরে গেল ওই প্রান্ত । চলে গেল সবাই । গায়েব হয়ে গেল পরিচিত, অপরিচিত, দানবীর, ছোট, বড় সব ধরনের আত্মা ।

আবার একাকীত্ব ঘিরে ধরল ওকে । জোর হারিয়ে ফেলল ওর হাঁটু । মেঝেতে বসে পড়ল ও । অব্যোরে বরতে শুরু করল চোখের পানি । তখনই কারো উপস্থিতি অনুভব করল ও । মুখ তুলে তাকিয়ে এক জোড়া চোখ দেখল র্যাচেল । আর মাথার ভেতর সেই আগের কণ্ঠটাই প্রশ্ন করল যে, ‘ইচ্ছা পূরণ হওয়া সত্ত্বেও মন খারাপ কেন র্যাচেলের । কেন কাঁদছে সে । জবাবে র্যাচেল বলল, যাকে ও খুঁজছে তাকেই পায়নি । খুঁজছে রিচার্ড ড্যারিয়েনকে । কণ্ঠটা চিৎকার করে ডাকল, ‘রিচার্ড ড্যারিয়েন, রিচার্ড ড্যারিয়েন!’ কিন্তু কেউ এল না । কণ্ঠটা র্যাচেলকে বলল, ‘এই জগতে নেই সে, অন্য কোন জগতে তার খোঁজ করো ।’

রেগে গেল র্যাচেল । বলল, ‘আমাকে নিয়ে উপহাস করছ তুমি? ও মারা গেছে । আর যেহেতু এটাই মৃতদের দেশ তাই এখানে থাকতেই বাধ্য সে ।’

‘আমি কাউকেই উপহাস করি না । দেখ, মরণশীলা মেয়ে,

দেখে নিশ্চিত হও ।’

পরমুহূর্তেই যেন বিস্ফোরিত হলো হলঘরের প্রান্তের দরজা । ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করল অগণিত সংখ্যক আত্মা । কী নেই সেখানে! সাদা, কালো, হলুদ, সব গাত্রবর্ণের, সব জাতির লোক আসতে থাকল । প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসতেই থাকল । র্যাচেলের কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেল তাদের সংখ্যা । একই সাথে তাদের সবাইকে জায়গা দিতে গিয়ে ক্রমেই বড় হতে থাকল হলঘরের আয়তন । নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, রাজা, ভিখারি, পুরোহিত, সৈনিক কী নেই! সাগরের ঢেউয়ের মতো ধেয়ে এল তারা । তাদের ভাসমান চুলগুলো যেন সেই ঢেউয়ের ফেনাময় চূড়া! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বছরের বছর ধরে আসতেই থাকল তারা । আর তাদের প্রত্যেকের মুখে একটাই প্রশ্ন উচ্চারিত হলো, ‘তুমাকেই কি তুমি খুঁজছ?’

প্রত্যেকের চেহারা দেখল র্যাচেল । কিন্তু এই লক্ষ কোটি আত্মার ভিড়েও রিচার্ডের কাক্ষিত মুখটা ওর নজরে এল না । সব শেষে এল জুলুরা । সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মতো রেজিমেন্টে রেজিমেন্টে এল তারা । ওদের পুরোভাগে রইল চাকা । ডিনগানের সাথে চেহারার মিল দেখে তাকে চিনল র্যাচেল । ধমকে উঠে র্যাচেলকে সে জিজ্ঞেস করল যে, কীভাবে জুলু জাতির আত্মার আসনে বসল র্যাচেল । জবাবে র্যাচেল বলতে শুরু করল ওর কাহিনি । কিন্তু তখনই হলঘরটা ভরে উঠল উচ্চস্বরের হাসির আওয়াজে । ধসে পড়ল ঘরের ছাদ । হলঘরটাকে আবার নতুন করে তৈরি করল সেই দানবীয় আত্মাগুলো । তবে এবার সেটা বানানো হলো মর্ত্যলোকের যে অভিযাত্রার গুহায় বসে এই যাত্রা শুরু করেছিল র্যাচেল, সেই আবির্ভাব ।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ট্রান্সপেটের আওয়াজ । অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক । কানে এল ছোট ড্রাম বাজানোর শব্দ । চোখ খুলল

র্যাচেল। সামনেই বসে আছে সাবেক বৃক্ষমাতা নায়া। তার দুপাশে বসে ছোট ড্রাম বাজাতে বাজাতে শিশির-পাত্রের দিকে তাকিয়ে আছে বোবা কালা মহিলারা।

“হাজার হাজার” বছর আগে এই অভাবনীয় যাত্রা শুরু করেছিল র্যাচেল। তখন দেখেছিল নায়ার পাশে বসা বামুন মহিলাটি তার সামনের বাটিটাকে স্থির করছে। এখনও তা শেষ করতে পারেনি মহিলাটি! যাত্রা শুরু করার আগে র্যাচেল দেখেছে, কুপির আগুনে পুড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল বিরাট একটা মথ। এখনও সেটা মাঝপথে রয়েছে! মাটিতে পড়ে সারতে পারেনি! নিজের ঘাড়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নোয়ি। ওই হাতটা মাত্র ওর ঘাড় ছুঁতে যাচ্ছে! তাহলে কি এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল সময়ের ঢাকা!

বাইশ

গান বন্ধ করল নায়া। বামুন মহিলারাও তাদের বাদ্য-বাজনা বন্ধ করল। র্যাচেলকে নায়া জিজ্ঞেস করল, ‘গিয়েছিলে, মেয়ে?’ প্রশ্নটা করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে র্যাচেলের দিকে তাকিয়ে রইল নায়া।

‘হ্যাঁ, মা। অনেক দূরে আর ভীষণ অদ্ভুত এক ভ্রমণে গিয়েছিলাম।’

‘আর, নোয়ি, ভাতিজি আমার, তুমি গিয়েছিলে?’

উত্তর দিতে গিয়ে কেঁপে উঠল নোয়ি। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ। কিন্তু আমার বোনের সাথে যেতে পারিনি আমি। একাকী গিয়েছি। বছরের পর বছর ধরে ঘুরে বেরিয়েছি। সম্পূর্ণ একা।’

এবার নায়া বলল, ‘অনেক দূর আর অনেক লম্বা এক যাত্রায় গিয়েছিলে বলছ তুমি, ইনকোসাজানা। নোয়িও বলছ, ওই যাত্রায় পার করে এসেছ অনেক বছর। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখ, এই মথটার ডানায় আগুন লেগেছে। কুপির মাথা থেকে ওটা মেঝেতে পড়তে যতটুকু সময় লাগে তা পার হওয়ারও আগেই ফিরে এসেছ দু’জনেই! আমার কী মনে হয় জানো? তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এক মুহূর্তের একটা স্বপ্ন দেখেছ, তারপরই ঘুম ভেঙেছে দু’জনের।’

জবাবে র্যাচেল বলল, ‘হয়তো তা-ই, মা। তবে আমার স্বপ্নটা ছিল খুবই অদ্ভুত। এমন স্বপ্ন আর কখনো দেখিনি, ভবিষ্যতেও আর কখনো দেখতে চাই না। গ্রহ নক্ষত্র সব ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম আমি। গিয়েছিলাম মৃতদের দেশে। এই জীবনে আমার দেখা, না দেখা লক্ষ কোটি মানুষকে দেখানো হয়েছে আমায়। ওদেরকে নিয়ে এসেছিল আকার আকৃতিবিহীন কতগুলো অদ্ভুত “কাঠামো”।’

‘যাকে খুঁজছিলে তাকে কি পেয়েছ?’

‘না, শুধু তাঁকেই পাইনি। ওকে যখন খুঁজলাম মৃতদের রক্ষক বা অভিভাবক সমস্ত মৃত আত্মাকে ডেকে আনল। ওদের প্রত্যেকের চেহারা দেখেছি আমি। কিন্তু সেখানে ও ছিল না। অভিভাবকরা আমাকে বলল অন্য কোন জগতে তাকে খুঁজতে।’

‘আহ, তা-ই বলেছে ওরা! কিন্তু এমন জগৎ অনেক। এভাবে খুঁজতে অনেক অনেক সময় লাগবে।’ তারপর নোয়িকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কী দেখেছ, মেয়ে?’

‘আমি কোন তারার দেশে যাইনি, মা। অগণিত সংখ্যক সিঁড়ি

বেয়ে নেমে গেছি পাতালের অতল গর্ভে। এত ধাপ বাইতে হওয়ায় এখনও আমার পায়ে ব্যথা করছে। ওখানে গিয়ে পেয়েছি হাজার হাজার অন্ধকার গুহা। মৃত লোকদের হেঁটে চলে বেড়ানো দেখেছি সেখানে। তাদের শক্তি নেই কিন্তু তারা অসুখী নয়। তারাও দেখেছে আমাকে। এখানকার খবরাখবর জানতে চেয়েছিল তারা। আমিও মুখ খুলতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। যতবারই মুখ খুলতে গেছি আমার মুখ চেপে ধরেছে অদৃশ্য একটা শীতল হাত। অনেক অনেক চাঁদ ধরে তাদের মাঝে হেঁটে বেড়িয়েছি আমি। অবশ্য ওখানকার আকাশে কোন চাঁদ ছিল না। ছিল কেবল অন্ধকার। পলিশ করা কয়লার মতো চকচকে কালো আকাশ! গুহা থেকে গুহায় ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। ওখানেই এক গুহায় খুঁজে পেয়েছি আমার বাবা সেয়াপিকে। তার সাথে আমার মা ও অন্যান্য সৎ মা-দেরকেও পেয়েছি। জুলুদেরকে দিয়ে ওদের সবাইকেই খুন করিয়েছিল শয়তান ইবুবেসি।’

এবার র্যাচেল বলল, ‘ইবুবেসির দেখা পেয়েছি আমি। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছিল সে। ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি আমি।’

রাগত স্বরে নোয়ি বলল, ‘ইবুবেসির দেখা আমি পাইনি। ওকে কখনোই ক্ষমা করব না আমি। এমনকী আমার বাবা বা আমার পরিবারের অন্যান্যরাও তাকে ক্ষমা করত বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, ঈশ্বরের সামনে ইবুবেসির অপকর্মের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তারা।’

‘এ কথা কি সেয়াপি নিজে তোমাকে বলেছে, নোয়ি?’ প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘নাহ্। বাবাকে দেখেছি বিশাল বড় এক কালো গাছের নীচে বসে আছে। ওটার আকার আকৃতি আমাদের জাতির প্রাণ এই গাছটার মতোই। তবে সেটা এতই বড় যে চেষ্টা করেও ওটার শেষ মাথা দেখতে পাইনি। ওখানে কালো পানি দিয়ে ভরা একটা

পাত্রে দিকে তাকিয়ে বসে ছিল বাবা। ওই পানিতে অনেক কিছুই আমাকে দেখিয়েছে সে। তার মধ্যে অতীত যেমন ছিল তেমন ভবিষ্যতের কিছু ব্যাপারও ছিল। তবে ওসব গোপন ব্যাপার। তাই ওসব নিয়ে কিছু বলব না।’

‘শেষ পর্যন্ত কী দেখলে, ভাতিজী আমার?’ প্রশ্ন করল নায়া, চোখে তীব্র কৌতূহল।

‘দেখলাম, ওই কালো গাছটায় আগুন ধরে গেছে। আগুনে পুড়ে ধরসে গেছে গুহাগুলোর ছাদ। হাসতে হাসতে আর গান গাইতে গাইতে সেই ভাঙা ছাদ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল গুহাবাসী বামুন মানুষগুলো,’ বলে একটু থামল নোয়ি। ওর চোখে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টি। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠেই সে বলল, ‘তবে, অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর একা কেবল আমিই রয়ে গেছিলাম। আমি আর গাছের সাদা আত্মা। তখন একটা অদৃশ্য কণ্ঠ আমাকে সাহস দিল। বলল যে, ভালবাসার জন্য যে এতকিছু করতে পারে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। তাই ধৈর্য ধরতে বলল আমাকে। এরপরই জেগে উঠেছি আমি। কিন্তু, মা, এর কোন অর্থ আমি পাচ্ছি না। জীবিত কোন পুরুষকেই তো আমি ভালবাসি না, কখনো বাসিনি, বাসবও না,’ বলে আনমনা হয়ে গেল নোয়ি।

‘জানি। সেজন্যই এর অর্থ করা খুব কঠিন,’ বলতে বলতে র্যাচেলের দিকে তাকাল নায়া।

র্যাচেল বলল, ‘আমার অতৃপ্তি রয়েই গেছে। জাদু করে আবার আমাকে মৃতদের দেশে পাঠাতে পারেন না, মা? আরেকবার খুঁজে দেখতাম ওকে পাই কিনা। ওকে পেলে আবার বুকের নিতেও আমি রাজি।’

‘না, মেয়ে, তা সম্ভব নয়। খুব কম মানুষই এই পথে যেতে পেরেছে। আর দ্বিতীয়বার এই যাত্রা করার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু।’

শুনে কাঁদতে শুরু করল র্যাচেল।

নায়া তখন ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘কেঁদো না। অন্য আরো উপায় আছে। সব ঠিক থাকলে কাল সেই পথেও তুমি হাঁটবে। এখন শুয়ে পড়ো। দু’জনেই ঘুমাও। তবে এখন আর স্বপ্ন দেখবে না কেউ।’

দু’জনেই শুয়ে পড়ল। তবে জেগে বসে রইল নায়া। র্যাচেলের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে, ‘তোমার ব্যাপারটা বুঝেছি। তোমার আত্মা শুদ্ধ আর অনেক কষ্ট সহিতে হয়েছে তোমায়। তাই অভিভাবকরা তোমাকে মিথ্যা বলবে না। বুঝতে পেরেছি। তোমার ইচ্ছা পূরণ করা যাবে। নিশ্চিত্তে ঘুমাও, মেয়ে, আশাহত হয়ো না।’

কিন্তু নোয়ির দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল সে। বলল, ‘আমাদের জাতির গাছের মতো গাছের নীচে বসে শিশির-পাত্র দেখছে সেয়াপি। সেই গাছে আবার আগুন লেগে গেছে। এর ফলে বামুনরা মুক্তি পেয়ে চলে গেল আলো আর মুক্তির রাজ্যে। অর্থ কী এসবের? ভালবাসার জন্য যে ঝুঁকি নেয়... আচ্ছা, এবার মনে হয় ধরতে পারছি! তাই তো, কোন পুরুষের জন্য ভালবাসার কথা তো বলেনি কেউ। একজন নারী তো তার বোনকেও ভালবাসতে পারে। কিন্তু, এত বড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস কি ওর আছে? থাকতে পারে, অবশ্যই থাকতে পারে। কারণ ওর শিরায় জুলু রক্তও বইছে। জুলুরা অবশ্যই সাহসী জাতি। ওহ এডো! তোর জন্যই সব অঘটন ঘটবে। কিন্তু তারপর? কোথায় নিয়ে যাবি তুই বৃক্ষজাতির মানুষদের? না, এসব নিয়ে ভাবব না। অপচিন্তা যা করার এডোই করুক। আমি ওসব নিয়ে ভাবব না।’

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল র্যাচেলের। শরীর মন দুটোই একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে। তবে গত রাতের স্মৃতি এখনো একদম স্পষ্ট। এখন ওর ধারণা গতরাতে আসলেই স্বপ্ন দেখেছিল

ও। তবে এতটা অভাবনীয় স্বপ্ন কীভাবে ওর মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারল সেটাই ওর মাথায় ঢুকছে না। আত্মা, মৃত আত্মার দানবীয় অভিভাবক, ধূসর হলঘর, পরিচিত অপরিচিত কোটি কোটি লোকের দেখা পাওয়া, আসলেই অভাবনীয়! র্যাচেল ভাবছে, মায়ের মতো ওরও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভাল কাজ করে বটে, তবে সেটার কাজের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহলে কি মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওর ভেতর এই ক্ষমতাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি মাতা? নাকি এখনও ওর মাথা পুরো ঠিক হয়নি? বিকৃতির কারণেই উন্মাদদের মতো আজগুবি সব শব্দ শুনেছে আর অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেছে ও? তবে সত্যি বলতে ওসব নিয়ে র্যাচেলের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। ওর কেবল একটাই চিন্তা। ভালবাসার মানুষটাকে পেতে চায় ও।

‘নোয়ির ঘুম ভেঙেছে। উঠে বসেছে ও। র্যাচেল ওকে বলল, ‘গতরাতে আমরা নির্ঘাত স্বপ্ন দেখেছি, নোয়ি। হয়তো খাবারের সাথে কোন ধরনের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল মা। তাই ওসব দেখেছি আমরা, কী বলো?’

‘সঠিক জানি না, জুলা। তবে ঘটনা যা-ই হোক, অমন স্বপ্ন আমি আর দেখতে চাই না। আমার জন্য ওতে শুভ কিছুই ছিল না। তাছাড়া কে বলতে পারে কোন্টা সত্য আর কোন্টা স্বপ্ন। হয়তো আমাদের এই পৃথিবীটাই আসলে স্বপ্ন, গত রাতে যা দেখেছিলাম হয়তো সেটাই সত্য। কে নিশ্চিত করে বলতে পারবে?’ বলে থেমে গেল নোয়ি। ভাবটা এমন যে মা বলার বলেছি আর কিছু বলব না।

সেই দিনটায় আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটল না। যারা মারা যাওয়ার, মারা গেল। তাদের কবর দেখা হলো। তবে গাছের নীচে বসলেই কেন মানুষগুলো মারা যাচ্ছে তা র্যাচেল কখনো জানতে পারেনি। হয়তো সেই গাছটাই আসলেই বিষবাস্প ছড়ায়,

কে জানে। এদের সবাই স্বেচ্ছায় মরতে এসেছে এমন নয়। বেশিরভাগের বেলায়ই দেখা যাবে এডোর কারণে আসতে বাধ্য হয়েছে তারা। এবং বেচারাদের মূল অপরাধ সাবেক বৃক্ষমাতা নায়াকে সমর্থন দেয়া। মৃত্যুগুহায় ঢোকান আগে নায়ার সাথে হয়তো দুয়েকটা বিদায়ী বাক্য বিনিময় করে তারা। বলা বাহুল্য সেসব অবশ্যই হয় বিষাদমাখা কথা।

মৃত্যুকামী এই লোকগুলোর মধ্যে যারা অভয়াশ্রমের বোবা-কালার অভিভাবকদের কোন পারিশ্রমিক দিতে পারে তারা পায় সম্মানজনক দাফন-কাফন। আর যারা তা পারে না, তাদের ভাগ্যে জোটে নাম চিহ্নহীন এক কোণের একটা গর্ত। কখনো এমনও হয় যে, তিনজনের ভাগ্যে জোটে একটা গর্ত। তবে তাতে বামুনদের কিছুই আসে যায় না। অভয়াশ্রমের দেয়ালের ভেতর শেষ আশ্রয় পেয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। এটা তাদের “মৃত্যুগত” অধিকার!

অভয়াশ্রমের বামুন অভিভাবকরা বিষ সংক্রান্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। ওদের জন্ম মৃত্যু বিয়ে সবই হয় অভয়াশ্রমের পুরু দেয়ালের ভেতর। এর বাইরে কখনোই ওরা বের হয় না। বিয়ে শাদি ওরা করে বটে, তবে সন্তান জন্মহার খুবই কম। এবং সন্তান হলেও সাধারণত তারাও বাবা-মায়ের মতো বোবা কালাই হয়। আর ভুলেও যদি কোন স্বাভাবিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তো সাথে সাথে সেই সন্তানটিকে নিয়ে গিয়ে মৃত্যু বৃক্ষের সাথে বেঁধে ফেলা হয়। এভাবে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে এই কুটিল বামুনরা। কারণ, ওদের ধারণা, এরা বেঁচে থাকলে বৃক্ষজাতির প্রাণ এই জীবন-মৃত্যু বৃক্ষের সকল গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে। কী অমানবিকতা!

এই বামুনদের জীবনে বিনোদন বলতে কিছু নেই বললেই চলে। এক আছে শুধু পূর্ণিমার রাতে এই মৃত্যুবৃক্ষের ডালে ডালে বেবুনের মত ঝুলে লাফালাফি করা আর গাছের নীচে আগুন

জ্বালিয়ে হই-হুল্লোড় করে ভোজ করা ।

এরা জীবন ধারণের জন্য কোন কাজই করে না । বাইরে থেকে কিছু লোক খাবার দিয়ে যায় । সেটাই ওদের ভোজ । এই খাবার সরবরাহকারীদের বলা হয় দেয়ালের দাস । এই বামুন লোকগুলো হাসিখুশি হলেও দুধে ধোয়া তুলসি পাতা নয় । এদের মধ্যেও কুপ্রবৃত্তি ভালই কাজ করে । র্যাচেল যেদিন এখানে এল সেদিনই চুরির দায়ে ধরা পড়ে একজন । এমন অপরাধ ধরা পড়লে বামুনদের সর্দার তার বিচার করে । বিশেষ একটা তরল খেতে দেয় তাকে । খেয়ে ফেললে ভাল, নয়তো সে অপরাধী প্রমাণিত হয় । অপরাধীকে পাঠিয়ে দেয়া হয় মৃত্যুগুহায় । সাধারণত ওখানে কাজ করাকালীন অভিভাবকদের ওপর মৃত্যু রক্ষের কোন প্রভাব পড়ে না । কিন্তু যখন অপরাধী হিসেবে ওখানে যায় তখন মরতে বাধ্য সে । এই ভেদটাই র্যাচেলের কাছে পরিষ্কার নয় । এমনকী নায়ার কাছেও নয় । সে শুধু এতটুকুই বলতে পেরেছে যে, হয়তো অপরাধীর মন ভেঙে যাওয়া আর প্রায়শ্চিত্ত করার চিন্তার কারণেই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে তার মানসিক প্রতিরোধ । মৃত্যুকে মেনে নেয় সে । ফলে সত্যিই মৃত্যু এসে তার জীবনাবসান ঘটায় । অন্তত এটাই নায়ার খিওরি ।

এতসব দেখে র্যাচেলের মনে হয়েছে জুলুরা রক্তপিপাসু বটে, কিন্তু তারপরও ওদের ভেতর কুটিলতার জায়গা নেই । অথচ এই লোকগুলো এতই ফুটিল যে এদের তুলনায় জুলুদেরকে বীতিমত ফেরেশতা বলে মনে হয় । জুলুরা অন্তত র্যাচেলকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা করেছে, সম্মান দিয়েছে । কিন্তু এখানকার বোবা কালা অভিভাবকরা তাদের শিশির-পাত্রে র্যাচেলকে নিয়ে যা দেখে সেসব নিয়ে নানা রকম কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে না । বীতিমতো উপহাস করে ওকে নিয়ে ।

রাত হয়ে গেছে । বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সিডারের কড়া

গন্ধ। গুহায় কুপির আলোয় নায়ার সামনে বসে আছে র্যাচেল আর নোরি। র্যাচেলকে নায়া জিজ্ঞেস করল, ‘যাকে খুঁজছ তাকে তো ছায়ার দেশে পাওনি। এখন বলো, তুমি সম্ভ্রষ্ট নাকি অসম্ভ্রষ্ট? আবারও নতুন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?’

‘আছে, মা। ওর খবর পাওয়ার জন্য দরকার হলে স্বর্গ মৃত্যু সবখানে যাব আমি।’

‘বেশ, বুঝেছি। কাজটা আমাকে ক্লান্ত আর শক্তিহীন করে দেয়। কিন্তু তবুও আমি তোমার জন্য চেষ্টা করব। কারণ লাল মৃত্যু থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি।’

আজ আর নোরি ওর সাথে যাবে না। তাই সরে বসেছে ও। ওদিকে গান ধরল নায়া। ঘুমের ঘোরে গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে বলে মনে হলো র্যাচেলের। বহুকিছু দেখল ও। এতকিছু যে, ওসবের স্মৃতিই ওর মাথায় রইল না। তবে একবার ও কেবল অনুভব করল যে রিচার্ড ওর কাছাকাছি। এরপরই জেগে ওঠে র্যাচেল।

এসব শুনে নায়া বলল, ‘বুঝেছি। আজ বিশ্রাম নাও। আগামী কাল তোমার আত্মাকে আরো শক্তিশালী করে দেব আমি। তখন তার আত্মা তোমার কাছে আসতে পারবে। আজ ঘুমাও।’

পরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। তবে এদিন র্যাচেলের মনে হলো পৃথিবী ছেড়ে যায়নি ও। বহু কষ্টের পর যেন খুঁজে পেল রিচার্ডকে। যদিও তাকে দেখেনি ও। তবে তার কণ্ঠ শুনেছে। জেগে উঠে সব নায়াকে জানাল র্যাচেল। প্রতিটা শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনল নায়া। তারপর বড় বোলে করে শিশির পাত্র আনার জন্য বলল। তারপর নায়া নিজে এবং অপর দুই মহিলাও তাকাল সেই পাত্রের দিকে। অনেক লম্বা সময় ধরে ওদিকে তাকিয়ে থেকে পরে পানিগুলো ঢেলে ফেলে দিল একটা পাথরের ওপর।

আঙুলের ইশারায় নায়াকে কিছু একটা বলল তারা।

উদ্ভিগ্ন র্যাচেল প্রশ্ন করল, ‘কিছু দেখলেন, মা?’

‘হ্যাঁ, দেখেছি। আমি এবং এই দুই জ্ঞানী মহিলাও দেখেছে। একই জিনিস দেখেছি সবাই। তারমানে যা দেখেছি সত্য দেখেছি। তবে যা-ই দেখেছি, ওসব তোমার শোনার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো আশা আছে তোমার।’

পরের রাতে আবার নায়াকে র্যাচেল অনুরোধ করল ওকে যেন রিচার্ডকে খুঁজতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় সে।

কিন্তু আপত্তি করল নায়া। বলল, ‘তিনবার তোমার আত্মাকে শরীর থেকে বের করে এনেছি। এর বেশি আর সম্ভব না। সম্ভব হলেও আমি আর পারতাম না। কারণ ব্যাপারটা আমাকে নিঃশক্তি করে ফেলে। কিন্তু তাঁরচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ তোমার আত্মা তাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তাকে সান্ত্বনাদি দিয়ে এসেছে।’

‘মানলাম, মা, কিন্তু কোথায় আছে সে? আমাকেও শিশির পাত্রে দেখতে দিন।’

‘ঠিক আছে, দেখো,’ বলে পাত্র আনতে ইশারা করল নায়া।

পানিতে তাকিয়ে আগে দৃষ্টি যাওয়া কিছু বিষয় ছাড়া নতুন আর কিছুই দেখল না র্যাচেল। তির্যক হয়ে উঠল ওর মন। চোখ তুলে বলল, ‘মা, পুলের পানিতে রিচার্ডের আগমনের দৃশ্য দেখেছি আমি। তারপর এডোর পাত্রে দেখেছি ডিনগানের অন্ত। কিন্তু এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কেন?’

‘পুলের পানিতে কী দেখেছ বলতে পারব না। ওটা তোমার মন তোমাকে দেখিয়েছে। আর এডোর পাত্রে যা দেখেছ সেগুলো হয় ছিল এডোর দেখা দৃশ্য, নয়তো আমার দেখা। যা তোমার খোঁজে এডো রওনা হবার আগেই আমি দেখেছিলাম। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ধারী হওয়া সত্ত্বেও সঠিক প্রশিক্ষণ না নিলে আমাদের পাত্রে তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। এবং

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের রক্তের সাথে তোমার যোগ না থাকলে যতই শেখানো হোক কিছু দেখার সামর্থ্যই হবে না তোমার,' বলল সাবেক বৃক্ষমাতা নায়া।

‘অর্থাৎ?’

‘অর্থাৎ, এডো যদি সত্যিই তোমাকে দিয়ে বৃক্ষজাতিকে শাসন করাতে চায় তাহলে বিশেষ কিছু কাজ করতে হবে ওকে। তোমার আর নিজের হাত কাটতে হবে ওকে। তারপর তোমার শিরায় মিশিয়ে দিতে হবে ওর রক্ত। একই সঙ্গে ওর শিরায় মেশাবে তোমার রক্ত। তারপরই কেবল আমাদের শিশির পাত্রে দেখতে পাবে তুমি। কিন্তু এর ফলে যতদিন বাঁচবে এডোর ইচ্ছের দাস হয়ে রইবে তুমি।’

‘তা-ই যদি হয় তো বলব আমাদের কারোই বেশিদিন বাঁচা হবে না,’ বলল র্যাচেল।

সেই রাতে খুবই ক্লান্ত বোধ করল র্যাচেল। অথচ সারাদিনে কোন কাজই ওকে করতে হয় না। এটা চিন্তা করেই বরং বেশি অবাক হলো ও। ঘুম ভেঙে উঠে বসে আছে এমন সময় দেখল ছোট একটা ড্রাম হাতে গুহা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে নায়া। তাড়াতাড়ি নোয়িকে জাগিয়ে তুলল ও। তারপর নায়ার পিছু নিল দু’জনে। র্যাচেলের সন্দেহ অভয়াশ্রমের আশ্রয় ছেড়ে বোধহয় চলে যাচ্ছে সে। কিন্তু না। ওর সন্দেহ অমূলক। তবে দারুণ কসরতের দেখা পেল ওরা।

অভয়াশ্রমের বিশাল উঁচু দেয়ালের গা থেকে বুলেখাকা লতা ধরে ধরে বেড়ালের দক্ষতায় ওপরে উঠে গেল নায়া। ওই জায়গায় দেয়ালের উচ্চতা পঞ্চাশ ষাট ফুট হতে হবেই। ওপরে উঠে দেয়ালের কিনারায় পা বুলিয়ে বসল নায়া। তারপর বাজাতে শুরু করল হাতের ড্রামটা। পাঁচটা বা দশটা আঘাত করছে এক তালে আবার পরের পাঁচ বা দশটা আঘাত করছে দ্রুততর তালে।

র্যাচেল ধরেই নিল, কোথাও কোন সংবাদ পাঠাচ্ছে সে।

একসময় থামল নায়া। নেমে এল ঘোর নীরবতা। অটুট নীরবতায় ফাটল ধরাচ্ছে কেবল অদূরবর্তী বন থেকে ভেসে আসা গাছের ধসে পড়ার আওয়াজ। লম্বা একটা সময় নীরবতার পর বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল মৃদু ড্রাম বাজার আওয়াজ। নিঃসন্দেহে আওয়াজটা নায়াও শুনেছে। ওটা থেমে যাওয়ার পর নায়া তার ড্রামে একটা আঘাত করল। র্যাচেল বুঝল, নায়া জবাব দিল, “শুনতে পেয়েছি”। এরপর থেমে থেমে ড্রামের শব্দ আসতেই থাকল। মাঝে বিরতি যেহেতু দিচ্ছে তাই র্যাচেল অনুমান করল ওপাড়ের ড্রাম বাদকও কারো কাছ থেকে শুনে শুনে এদিকে কোন একটা সংবাদ পাঠাচ্ছে। আকাশে ধূসর আভা ফুটতে শুরু করা পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকল। আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নীচে নামার প্রস্তুতি নিল নায়া। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গুহায় চলে এল র্যাচেলরা।

শুয়ে ভান ধরল যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু এত সহজে ভবী ভুলবার নয়। ওদের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে নায়া বলল, ‘নায়াকে এত সহজে ধোঁকা দিতে পারবে?’

কাজেই মাথা তুলল র্যাচেল। ‘আমাদের দেখে ফেলেছেন তাহলে?’

‘নাহ্, নিজ চোখে কাউকেই আমি দেখিনি। তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ করেছ তা অনুভব করেছি। আর তোমরা যা বলাবলি করেছ, তার সবই মনের কানে শুনেছি আমি। বলো দেখি, ইনকোসাজানা; নতুন যাত্রার জন্য তুমি প্রস্তুত?’

‘হ্যাঁ, মা। কিন্তু আপনার অসুবিধা না থাকলে আমাদের জানাবেন, যে, ড্রামের মাধ্যমে কী খবর জানলেন আপনি?’

‘সানন্দে জানাব। ভূত জাতির দাসদের কাছে কিছু হুকুম পাঠাচ্ছিলাম। ওরা এখনও আমাকে বৃক্ষমাতা হিসেবেই জানে।

তাই আমার কথা ওরা মানে। উমকুলুদের সর্দারকে হুকুম করেছি আমার বিশেষ একটা কাজে বাইরে লোক পাঠানোর জন্যে।’

‘কী কাজ, মা?’

‘বললামই তো কাজটা আমার, তোমার নয়। আরেকটা ব্যাপার, বুঝতে পারছি না আমি আর কয়দিন টিকব। তার আগেই সব কিছু ঠিক-ঠাক করতে হবে।’ এই পর্যন্ত বলে আন্ত দ্বিতীয় কোন কথা না বলে মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নায়া।

পরে র্যাচেলকে আর কোন সম্মোহন বা কোন “যাত্রায়” পাঠায়নি নায়া। র্যাচেলের পাগলামিও একদম চলে গেছে। কিন্তু তারপরও, সাধারণ কোন নারী নয় র্যাচেল। শারীরিকভাবে হেঁটে চলে বেড়ালেও শরীর ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় ওর মন। তবে এসবের বেশিরভাগ সম্বন্ধেই ওর কিছু মনে থাকে না। রাতে তো বটেই এমনকী দিনেও এই ঘটনা ঘটে। তবে ওর কেবল এতটুকু মনে থাকে যে, প্রতিদিন ওর আরো ক্লাছে আসছে রিচার্ড।

ব্যাপারটা নিজের ভেতর খুব ভালভাবে অনুভব করছে র্যাচেল। র্যাচেলের এই কর্মহীন উদ্যমহীন দিনাতিপাতের মধ্যে রিচার্ডের কাছে আসতে থাকাটাই কেবল ওর আনন্দের উৎস। যদিও র্যাচেলের ধারণা এটা স্রেফ ওর স্বপ্ন। কিন্তু ওর ভেতর প্রশ্ন জাগে এত অদ্ভুত স্বপ্ন কেন দেখে ও। আর স্বপ্নগুলোই বা ওকে এতটা উদ্বেলিত করে কেন? প্রতি সকালেই ঘুম থেকে জেগে কেনই বা ওর মনে হয়, পুরো রাত ধরে হেঁটেছে। ওর মনে হতে থাকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, হিমশীতল রাত বা উনুনসম উত্তপ্ত মরু পাড়ি দিয়ে এসেছে ও। কিন্তু কেন? কীভাবে? বাহ্যিক দেখা যাচ্ছে, এসব “অদৃশ্য” কারণে দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে ও! আর সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে র্যাচেলের মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই ওর দিকে এগিয়ে আসছে রিচার্ড ড্যারিয়েন।

এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে কেবলই মাথা নাড়ে নায়া। হয় আসলেই কিছু জানে না, নয়তো না জানার ভান করে। তবে আচার আচরণে মনে হয় আসল ঘটনা জানে কেবল অভয়াশ্রমের বোবা কালা মহিলারা। তারা র্যাচেলকে দেখিয়ে হাসাহাসি করে আর কয়েক মাথা এক হয়ে একটা শিশির পাত্রে তাকিয়ে কী যেন দেখতে থাকে।

নোয়ি বা নায়া কিছুই জানে না, ব্যাপারটা আসলে ঠিক নয়। কারণ চোখের সামনেই ওরা দেখতে পাচ্ছে আরোগ্য-অযোগ্য জরাত্তস্ত মানুষের মতো দিনে দিনে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে যাচ্ছে র্যাচেল। এভাবে কেটে গেল তিন সপ্তাহ। এরপর হঠাৎ করেই একদিন নায়ার মনে হলো মনে মনে (টেলিপ্যাথি) তার কাছে খবর পাঠিয়েছে এডো যে, 'নায়ার সাথে কথা বলতে চায়।' এবং পূর্ণদিন সত্যিই হাজির হলো এডো। সঙ্গে এনেছে কেবল হানাকে। গুহামুখে তাদের সাথে দেখা করল নায়া।

এডো বলল, 'বুড়ি, শুকিয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছ, তবে বহাল তবীয়তেই বেঁচে আছ দেখছি। লোকেরা তো ভাবছিল এতদিনে তুমি বোধহয় মৃত্যুগুহায় গিয়ে ঢুকেছ। তোমার সুস্থতার খবর কি তাদের জানাব?'

রাগ চেপে রেখে নায়া বলল, 'শুকিয়েছি, ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। আমার গায়ের হাড়গুলো এখন বাইরে থেকে দেখা যায়। শিরা-ধমনীতে পর্যাপ্ত রক্তও বইছে না। এটাও ঠিক যে, কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে মৃত্যুগুহায় আশ্রয় নিতে যেতে হবে। সেই সাথে এটাও ঠিক, বিষাক্ত ব্যাঙ এডো, যে, আমাদের জাতির হাজার হাজার লোকদের জ্ঞান ব্যবহার করে নিজেকে ধনী আর বড় করতে চাও তুমি। চাও একা এই জাতিকে শাসন করতে। তবে এখন বিশেষ কিছু কথা বলব। সেগুলো শুনলে তোমার জন্যই ভাল। তাই অবশ্যই আমার কথা তুমি

শুনবে।’

‘শুনছি, বলো। আমিও জানি এখনও তোমার ভেতর জ্ঞান আছে। মারা যাওয়ার আগে ওই জ্ঞানের ভাগ যতটা সম্ভব আমিও নিতে চাই।’

‘ভাল করে দেখো, এডো। আমি একাই এখানে বসে দিনকে দিন শুকিয়ে ফ্যাকাসে হচ্ছি না। আরো একজন হচ্ছে, বলে ইশারায় র‍্যাচেলকে দেখাল নায়া।

এডো বলল, ‘তাই তো দেখছি। এই অশুভ জায়গা মেয়েটার ভেতর থেকেও জীবনী শক্তি শুষে নিচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, ওর আত্মাকে দূরে কোথাও পাঠিয়েছিলে তুমি। ওই যাত্রাও মানুষের প্রাণশক্তি কেড়ে নেয়।’

‘হয়তো। তবে বেশি দেরি হওয়ার আগেই সশরীরে মেয়েটিকে নতুন জায়গায় পাঠাতে চাই আমি। কিন্তু ওকে বাধা দেয়ার মতো একমাত্র মানুষ হচ্ছে তুমি, এডো।’

‘হ্যাঁ, আমরা জানি, এক ভবঘুরের সাথে এই মেয়েটার মোলাকাত করাতে চাও তুমি। সেই রাতের ড্রামের শব্দ শুনে আর শিশির-পাত্র দেখেই যা বোঝার আমরা বুঝে নিয়েছি।’

‘বেশ, এডো, তুমি যদি সত্যিই জ্ঞানী হও, তো মেয়েটাকে চলে যেতে দেবে তুমি।’

‘কেন দেব? ওকে যেতে দিলে আমার স্বপ্নও অধরা রয়ে যাবে। তোমার পর ও-ই হবে এখানকার রাণী। এটা কেবল আমার নয়, জনতার ইচ্ছা। বামুন রাণী দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে তারা। শাসকের আসনে তাই নতুন মানুষ দেখতে চায়। উপরন্তু, আমার রক্তের সাথে ওর রক্ত মিশলে ইতিহাসের যে কোন বৃক্ষমাত্র চেষ্টা অনেক বেশি জ্ঞানী হয়ে উঠবে ও। কারণ এখনও কুমারী ও। আর যে কারও চেষ্টা বিশুদ্ধ তার আত্মা। না, ওকে আমি যেতে দেব না। আমার সাথে না গেলে,

এই পবিত্র জায়গার বাইরে পা দেয়া মাত্রই ওকে হত্যা করা হবে। তারপর যেখানে ইচ্ছা গিয়ে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে মিশতে পারবে ওর আত্মা।’

‘মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, এডো। বোকামি করছ। লোভে, অহংকারে অন্ধ হয়ে গেছ তুমি। মেয়েটাকে চলে যেতে দাও। বৃক্ষমাতা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নাও। এমনকী নোয়িকেও নিতে পারো,’ বলল নায়া।

‘নোয়ি তো তোমারই ছায়া। যাদের তুমি পছন্দ করো, ও-ও তাদের পছন্দ করে। সুতরাং যাদের তুমি অপছন্দ করো তাদের অপছন্দই করবে ও। কারণ নোয়ি তোমারই ভাতিজী। না, ওই দোআঁশলা মেয়ে আমাদের রাণী হবে না। রাণী হলে ইনকোসাজানাই হবে, অন্য কেউ নয়।’

একটু ঝুঁকে এল নায়া। সরাসরি এডোর চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টভাবে বলল, ‘তাহলে, এডো, জেনে রাখো, ভূত জাতি তার শেষ রাণী দেখে ফেলেছে। গর্দভ, তুমি চেন না, এমন অনেকে চাইছে ওকে। তারা তাদের শক্তি লুকিয়ে রাখছে। তুমি তাদের চেন না, কিন্তু আমি চিনি। ওকে পাওয়ার জন্য আমাদের জাতিকে ধ্বংস করতেও প্রস্তুত তারা। যাক, তোমার যা ইচ্ছা করো। আর হ্যাঁ, ওই বেচারীর হয়ে আজ আমি কথা বলিনি। বলেছি আমাদের প্রাচীন ভূত জাতির মানুষদের হয়ে। কারণ তাদের অন্ত ঘনিষ্ঠে আসছে। জাল বুনছ, বুনো। কিন্তু মনে রেখো, তোমার জালে তুমিই ফাঁসবে। শুনে রাখো, এডো, তোমার মৃত্যু হবে যে কারো চেয়ে অনেক বেশি লাল, রক্তাক্ত। এখন বিদায় হও। অন্য জগতে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যেদিন আমার খোঁজ করবে সেদিনের আগে আর তোমাকে দেখতে চাই না। আমার কাছে একটা পাতা থাকা পর্যন্তও আমি মৃত্যুগুহায় পা রাখব না। আর তোমার লোকদের বোলো, তাদের সাবেক বৃক্ষমাতা মারা

গেছে। তাদেরও সময় ঘনিয়ে আসছে, তারাও প্রস্তুতি নিক।’

মুখ খুলতে চাইল এডো। কিন্তু নায়ার চোখে আগুন দেখে আসলেই ভয় পেয়েছে সে। এডো আর হানা পরস্পরকে দেখল একবার। তারপর কথা না বাড়িয়ে উঠে গেল দুই পুরোহিত।

তেইশ

অচেতনতার ঘোর কেটেছে, সচেতন হচ্ছে রিচার্ড। ওর মনে পড়ল যে ঘরে ওকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানেই খাওয়ার জন্য দুধ দেয়া হয়েছিল ওকে। সেটা ও খেয়েওছিল। খাওয়ার সাথে সাথেই ওর সমগ্র অস্তিত্ব গ্রাস করে অদ্ভুত একটা শীতল অনুভূতি। তারপর আর কিছুই বলতে পারবে না ও। এই ঘটনার বহু সময় পার হওয়ার পর অত্যন্ত ধীরে ধীরে রিচার্ডের সচেতনতা ফিরতে শুরু করল। যখন হুঁশ ফিরে পেল, দেখল কাফ্রি ধাঁচে বানানো ছোট্ট এক কুটিরের শুয়ে আছে ও। ঘরে ও নিজে ছাড়া আছে আরেকজন কাফ্রি মহিলা।

মহিলাটিকে ও জিজ্ঞেস করল, ‘কে তুমি?’

‘আমার নাম মামি,’ বলল মহিলাটি।

‘মামি, মামি! দাঁড়াও দাঁড়াও, নামটা আমার পরিচিত! আচ্ছা, তুমি কি ইবুবেসির স্ত্রীদের একজন? বেডার ফুটো দিয়ে আমার সাথে কি তুমিই কথা বলেছিলে?’ বলতে বলতে আগ্রহের আতিশয্যে শোয়া থেকে উঠতে যাচ্ছিল রিচার্ড। কিন্তু দুর্বলতার

কারণে পারল না। পড়ে গেল।

মামি বলছে, ‘হ্যাঁ, সর্দার, ইবুবেসির স্ত্রী ছিলাম আমি।’

‘ছিলাম মানে? ইবুবেসি কোথায়?’

‘মারা গেছে, সর্দার। মাফুটিতে ভয়ানক আগুন লেগেছিল। সেই আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইবুবেসি।’

‘মাফুটি নেই?! ইনকোসাজানা তাহলে কোথায়? তাড়াতাড়ি বলো...’ আত্ননাদ করে বলল রিচার্ড।

‘তিনিও নেই, সর্দার। তার ক্রালে যখন আগুন লাগে তখনও ওখানেই ছিলেন ইনকোসাজানা। ক্রালের ছাদে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকে আর কোথাও তাকে দেখা যায়নি।’

‘ঈশ্বর! আমি তাহলে আর একা বেঁচে থেকে কী করব,’ বলে বিছানায় আছড়ে পড়ল রিচার্ড। ওভাবেই বিছানায় পড়ে রইল পরের কয়েক দিন। তবে মরল না ও। কারণ বয়সে তরুণ হওয়ায় ওর শরীর আর মন দুটোরই সহ্য ক্ষমতা খুব বেশি। ধীরে ধীরে শক্তিও ফিরতে শুরু করল। তারপরই শুনল দুঃখজনক কাহিনির অজানা অংশ। জানল, ডিনগানের প্রতিশোধের ভয়ে মাফুটির লোকেরা ঘর দোর ফেলে পালায়। আর যাদের দায়িত্ব ছিল রিচার্ডের দেখাশোনা করা তারাও ভয়ে পালিয়ে যায়। মৃত ভেবে সাথে নেয় ওকে। নয়তো ওদের অপকর্মের প্রমাণ থেকে যাবে, মূলত সেটাই ছিল ওদের আসল ভয়।

ইবুবেসি আর হাঁটতে চলতে অক্ষম এমন দুয়েকজন ছাড়া কেউই আর মাফুটিতে থাকেনি। মাফুটিতে কীভাবে আগুন লেগেছে কেউ জানে না। আগুন জুলুরাও লাগিয়ে থাকতে পারে, আবার বজ্ররূপে নেমে আসা স্বর্গের প্রতিশোধও আগুন জ্বলে থাকতে পারে। আসল ঘটনা কী কেউ জানে না। ওই আগুনে বলসেই মারা গেছে ইবুবেসি। ইনকোসাজানাও একই আগুনে মরেছে বলে সবাই ধারণা করে। মাফুটি থেকে পালানো সাধারণ

লোকজন রাত দিন যতটা জোরে সম্ভব ছুটে পালিয়ে চলে এসেছে কোথলাম্বা পাহাড় শ্রেণীর কাছে। শেষে আশ্রয় নিয়েছে এখানে।

জায়গাটা ভীষণ দুর্গম। চাকার হাতে অত্যাচারিত লোকজন প্রথম এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে চলে গেছে ওরা। বর্তমানের মাফুটি থেকে পলাতকরা ভেবেছে ডিনগানের সৈন্যরা হয়তো এতদূরে ওদেরকে ধাওয়া করে আসবে না। তাই এখানেই আশ্রয় নিয়েছে মাফুটিবাসীরাও। সৌভাগ্যবশত পথে ওরা গবাদি পশু হারায়নি বললেই চলে। এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই বসতি গড়েছে ওরা। এবং উর্বরা জমি পেয়ে যাওয়ায় মিলির খেতও করেছে।

আরো ক'দিনের বিশ্রামের পর হামাগুড়ি দিয়ে ক্রালের বাইরে আসার শক্তি পেল রিচার্ড। বাইরে এসে দেখল মামির কথা সত্য। আসলেই প্রাকৃতিক এক দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে ওরা। জায়গাটা টেবলটপের মতো (উঁচু মালভূমি)। এবং এখানে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে সরু একটা খাড়াই বেয়ে ওঠা একটা পথ।

মালভূমিতে বসবাসকারী লোকজন আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানাল ওকে। এতটাই আন্তরিক যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে রিচার্ড। ওদের সাথে কথা বলল ও। জানল, অনেক জুলুর সাথে সাথে ওই আগুনের ভেতর আসলেই হারিয়ে গেছে র্যাচেল। ভগ্ন হৃদয়ে ক্রালে ফিরে এল রিচার্ড। সব হারিয়ে একা বেঁচে আছে ও। ওর মনে হচ্ছে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মারা গেলেও ভাল হতো। কিন্তু মরল না রিচার্ড। উল্টো দিনে দিনে শক্তি ফিরে পেল ও। একসময় যাত্রা করার মতো শক্তিও পেয়ে গেল। সর্দারের কাছে গিয়ে বলল যে এবার বের হতে চায় সে। কেপ কলোনিতে ফিরে যাবে। কিন্তু সর্দারের মত ভিন্ন। তার ধারণা, এখান থেকে বের হয়েই আসল বের বের করার জন্য ও চলে যাবে জুলুল্যাণ্ডে। কিন্তু জুলুরা যদি পলাতক মাফুটিবাসীদের

ট্রাক করে এদিকে চলে আসে আর সাদা সর্দার ডোরিয়াকে এখানে না পায়, তাহলে ওদের সবাইকে শূলে চড়াবে। কারণ সর্দার খুব ভাল করেই জানে ডিনগান আর টাম্বুসা যে শপথ করেছে তা তারা পূরণ করবেই। উপরন্তু ডোরিয়োর মাথার ওপর ছায়া হয়ে আছে ইনকোসাজানার দেয়া নিরাপত্তা। কাজেই রিচার্ডকে সে কোথাও যাবার অনুমতি দিতে পারে না।

ওদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল রিচার্ড। বৃথা চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ওদের উপহাস করে ফিরে এল রিচার্ড। মনে মনে পরিকল্পনা করতে থাকল কীভাবে পালানো যায়। পালানোর উদ্দেশ্যে এক গভীর রাতে বেরও হলো ও। কিন্তু মালভূমি থেকে বেরুবার সরু মুখে ধরা পড়ে গেল। পরদিন সকালে গ্রামের সর্দার এসে ওকে বলল যে, কেবল ওদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই এখান থেকে পালাতে পারবে রিচার্ড। এরপর থেকে সরু পথটার ওপর তো বটেই, রিচার্ডের ওপরও শুরু হলো রাত দিন নজরদারি।

এর দিন কয়েক পর সর্দার এল রিচার্ডের কাছে। একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে। সর্দার বলল যে, রিচার্ড যেহেতু সাদা মানুষ, অবশ্যই কালোদের চেয়ে জ্ঞানী সে। তাই মালভূমির বাসিন্দাদের সর্দারের পদ গ্রহণ করুক সে। সাথে গ্রহণ করুক ইবুবেসির স্ত্রীদেরও। এই এলাকার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নিক। তবে একটাই শর্ত যে, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না ও।

প্রস্তাবটা গ্রহণ বা বর্জন কিছুই করল না রিচার্ড। অবশ্য ইসমাইলের স্ত্রীদের গ্রহণ করার কথা এমনকী ভেবেও দেখেনি। সাথে সাথেই বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে ওর কোন কাজ নেই। স্রেফ সেই কারণে অযথা বসে যা থেকে মালভূমির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার কাজ ধরল ও। অবশ্য ইবুবেসির স্ত্রীরা ওর কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করলেও ওদেরকে পাত্তা দিল না রিচার্ড। এতে

ওরা আহত হলো খানিক, লোকেরাও অল্পবিস্তর হাসাহাসি করল। কিন্তু ওসব পাত্তাও দিল না রিচার্ড। এভাবেই পরের কয়েকটা লম্বা সপ্তাহ সর্দারি করে কাটাল রিচার্ড। দিনের বেলায় কাফ্রিদের ঝগড়া বিবাদ মেটানো, ফসল ফলানোর তদারকি, ঘর বানানো, নিরাপত্তা দেয়াল তোলা, বিচার আচার করা ইত্যাদি করে কাটাল। কিন্তু রাত হলেই একা হয়ে পড়ে ও। তখন কোন কাজ থাকে না। ফলে মনে চলে আসে র্যাচেলের চিন্তা। শোকে কাতর হয়ে ওঠে ওর মন। অস্থির হয়ে ভাবে ওকে একা ফেলে চলে গেছে র্যাচেল।

এমনই এক রাতে র্যাচেলকে স্বপ্নে দেখল রিচার্ড। তবে পরদিন সকাল হতেই আর দশটা স্বপ্নের মতো এটাও মিলিয়ে গেল। কিন্তু রিচার্ডের অস্থিরতা কাটল না। পরের রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখল ও।

এবার র্যাচেলকে ও বলতে শুনল, ‘অনেক কষ্ট সয়েছি, রিচার্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি তোমাকে। চোখ খোলো, আমাকে দেখতে পাবে।’

চোখ খুলল রিচার্ড। কী আশ্চর্য, সত্যিই চোখের সামনে দেখতে পেল সোনালী চুলের ফ্রেমে র্যাচেলের মিষ্টি চেহারাটা। যদিও তা ছিল মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু রিচার্ড হলফ করে বলতে পারবে, র্যাচেলের মুখ দেখেছে ও।

এই ঘটনার পর থেকে র্যাচেলের উপস্থিতির অনুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও ওকে ছেড়ে যায়নি। নিজের পাশে সবসময়ই ওর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করছে রিচার্ড, যেন র্যাচেলের নিঃশ্বাসের উত্তাপটাও অনুভব করতে পারছে ও। আর ঘুমের মধ্যে রিচার্ড প্রতি রাতেই স্বপ্নে দেখে, র্যাচেল বলছে, ‘এসো, রিচার্ড, চলে এসো। তোমাকে যে খুব দরকার আমার। আমিই তোমাকে পথ দেখাব, চলে এসো...’

ঠিক এই জায়গায় এসে প্রতিবার রিচার্ডের ঘুম ভেঙে যায়।

মনে পড়ে, র্যাচেল মৃত। গুমরে ওঠে ও। মনে হতে থাকে
রিচার্ডকেও মৃতদের দেশে যেতে ডাকছে র্যাচেল। কিন্তু এরপর
থেকে রিচার্ডের পা উত্তর ছাড়া আর কোন দিকেই সরতে চায় না।
কেবল উত্তরে চলে যায় সে। যদিও কয়েক গজ এগিয়ে আর
যেতে পারে না। উঠানের সীমার মধ্যে বসে পড়তে বাধ্য হয় ও।

এক বিকেলে ঘুমাতে গেল রিচার্ড। তখনই স্বপ্নে দেখল,
র্যাচেল বলছে, ‘প্রিয়, আমার কথা কি তুমি শুনবে না? খুব শীঘ্রিই
আমার আর ক্ষমতা থাকবে না। তখন আর আমাকে খুঁজে পাবে
না তুমি। ওঠো, বেশি দেরি হওয়ার আগেই রওনা হও। আমিই
তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব।’

ঘুম ভেঙে গেল। রিচার্ড ভাবছে, ‘এসব কি পাগলামির লক্ষণ?
হতে পারে। কিন্তু তবুও এই পাগলামিটা আমি করব। রওনা হব।
সূদূর উত্তরের কোথাও হয়তো পাব র্যাচেলের মৃতদেহটা। তবুও
যাব। অন্তত ওর পাশের কবরে শুতে তো পারব। এখান থেকে
বের হতে চাইলে কাফ্রিরা বাধা দেবে। মেরেও ফেলতে পারে।
বেশ, মারলে মরব। তবু উত্তর দিকে মুখ করেই মরব। ওদিক
থেকেই আমাকে ডাকছে র্যাচেল।’

উঠে ছাগলের চামড়ার আলখেল্লায় নিজেকে মুড়ে নিল
রিচার্ড। ব্যাগে নিল শুকনো মাংস আর ভুট্টা। আর চামড়ার একটা
মশাকে নিল পানি। হাতে লাঠি, কোমরে বড় ছোরা আর বাড়তি
অস্ত্র হিসেবে নিল চওড়া ফলার একটা বর্শা। আত্মবিশ্বাসী
পদক্ষেপে উত্তরের সরু পথটার দিকে পা বাড়াল ও। প্রাণ অবাক
কাণ্ড, সাথে সাথেই রিচার্ডের মনে হলো সমস্ত অস্থিরতা কাটিয়ে
উঠেছে। ওর একবার মনে হলো বটে, যে, হয়তো নিশ্চিত অন্তের
দিকে এগিয়ে চলেছে ও। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে বিশ্বাস ফিরে
এলো। মনে হলো, মরলেই বা কী, আমার তো হারাবার কিছু
নেই। কোন লুকোছাপা না করে দৃঢ় পদক্ষেপে সরাসরি এগিয়ে

গেল মালভূমিতে প্রবেশের সরু মুখটার দিকে ।

পাথরের পেছন থেকে প্রহরী বেরিয়ে এল । জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন, লর্ড ডোরিয়ো? আপনি তো জানেন, আপনাকে এই পথ পাড়ি দিতে দেয়া হবে না ।'

'উত্তরে যাব । একটা আত্মা ডাকছে আমায় । জীবিত বা মৃত, আমি যাবই,' বলে গোয়ারের মতো ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়েই রইল রিচার্ড ।

ভূতের কথা শুনে ভয় পেলেও প্রহরী লোকটা তার সঙ্গীদের বলল, 'কোন ভূতের কথা আমি জানি না । তবে আপনাকে যেতে দেয়া যাবে না । ধরো তাকে । পারলে কোন ক্ষতি না করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ।'

পাথরের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকজন মানুষ । ঘিরে ফেলতে চাইল ওকে । কিন্তু হঠাৎ কী যেন হলো ওদের । তাঁদের আলোয় রিচার্ড দেখল, নিখাদ আতঙ্ক ফুটে উঠল ওদের চেহারায় । মাটিতে পড়ে গেল ওরা । পাথরের পেছনে মুখ লুকাল । কী হলো রিচার্ড বলতে পারবে না । পরোয়াও করে না । ওদের পার হয়ে সরু পথটা বেয়ে নীচের সমতলে নেমে এল ও ।

সারা রাত ধরে উত্তরদিকে মুখ করে হেঁটে চলল ও । সময় সময় পেছন ফিরে তাকাল । বুঝতে চাইল কেউ অনুসরণ করে আসছে কিনা । না, কোন অনুসরণকারী নেই । কোথাও কেউ নেই । স্বপ্ন অনুসরণ করে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলেছে একা রিচার্ড । পথ চেনা নেই কিন্তু একটা পদক্ষেপেও ওর সন্দেহ হয়নি যে, ভুল পথে এগুচ্ছে । যেন, কোথায় যেতে হবে সেটা ওর আগে থেকেই জানা আছে । সাথে আনা খাবার রাতেই শেষ করে ফেলল ও ।

সকালে দেখা হলো একদল কাফির সাথে । ওরা জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছে রিচার্ড । স্পষ্ট জবাব না দিয়ে বলল স্বপ্ন

অনুসরণ করছে ও। ওকে “পবিত্র” (জুলু বিশ্বাস মতে উন্মাদ মাত্রই পবিত্র) ভেবে ছুটে পালাল ওরা। যদিও কিছুক্ষণ পরই কয়েকজন ফিরে এসে ওর পথের ওপর কিছু খাবার রেখে গেল। খুশিমনেই খাবারটুকু তুলে নিল রিচার্ড। তারপর আবার আগের পথ ধরল।

একসময় মাফুটিতে পৌঁছে গেল রিচার্ড। দেখল আগুনে পোড়া মাফুটির ধ্বংসাবশেষ। এখানে ওখানে ছাইয়ের মধ্যে পড়ে থাকা হাড়গোড় উল্টে পাল্টে দেখল। রাতটা ওখানেই কাটাল। ভাবল, যাত্রা শেষ। এখানে র্যাচেলের মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের পাশে শুয়েই মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু সকালে অনুভব করল আগের চেয়েও জোরালভাবে ওকে ডাকছে র্যাচেল।

মাফুটির দেয়াল পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় নদীর পাড়ে চলে গেল রিচার্ড। এই নদীটা একসাথে পার হয়েছিল ও আর রম্ভেল। তখন এটা ছিল ফুলে ফেঁপে থাকা প্রলয়ংকরী এক নদী। কিন্তু এখন তলানীতে চলে গেছে পানি। অনায়াসে নদীটা পার হয়ে গেল ও। পথে দেখা হলো জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সাথে। ওরা যেন আগে থেকেই ওর আগমনের কথা জানত। তাই অনেকে এসে জুটল ওকে এক নজর দেখতে। ওদের প্রশ্নের জবাবে রিচার্ড যখন বলল যে স্বপ্ন অনুসরণ করছে ও, তখন “মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ” বলতে বলতে ছুটে পালাল তারা। অবশ্য ওর জন্য খাবার পাঠাতে ভুল করল না জুলুরা।

এগিয়ে চলল রিচার্ড। প্রতি রাতেই দেখল ওর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে একটা ঘর আর পর্যাপ্ত খাবার। এভাবে এক সন্ধ্যায় রিচার্ড পৌঁছে গেল জুলু টাউন উমগুনগুন্ডলোভুতে। হাজার হাজার লোক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না কেউ। এক জুলু ক্যাপ্টেন হাত তুলে একটা ক্রাল দেখিয়ে দিল রিচার্ডকে। বিনা প্রশ্নে সেই ক্রালে ঢুকে গেল ও।

খৈয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েও পড়ল। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় ঘুম ভাঙল ওর। আবার নিজের পথে রওনা হলো রিচার্ড। কিন্তু আজ দলবল নিয়ে ওর পথের ওপর বসে আছে স্বয়ং রাজা ডিনগান। অবশ্য ওদের দিকে রিচার্ডের নজর নেই। আপন গতিতে চলতে শুরু করল ও। ওর পথ আটকাল এক জুলু। একটা হাত পোড়া তার। বলা বাহুল্য লোকটি হচ্ছে মোপো।

‘কে আপনি? এই দেশে আপনার কী কাজ?’ প্রশ্ন করল মোপো।

‘আমার নাম রিচার্ড ড্যারিয়েন। এদেশে আমার কোন কাজ নেই। উত্তরে যাচ্ছি আমি। আমায় দেরি করিয়ে দিয়ো না।’

‘আমরা জানি আপনি লর্ড ডোরিয়ো। ইনকোসাজার্নার ছায়া আছে আপনার ওপর। সাদা শয়তান ইবুবিসি তো মাফুটিতে আপনাকে মেরে ফেলেছিল। তাহলে আপনার ভূত কেন এখানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে?’

‘আমি ভূত না মানুষ, জীবিত না মৃত কিছুই জানি না। শুধু জানি উত্তরে যাচ্ছি আমি। আমায় দেরি করিয়ে দিয়ো না, সর্দার।’

‘উত্তরে কী খুঁজতে যাচ্ছেন, লর্ড ডোরিয়ো?’

‘স্বপ্ন খুঁজতে যাচ্ছি। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে এক আত্মা। কিন্তু, হাত পোড়া মানুষ, তাকে কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?’

স্বগতোক্তি করল মোপো, ‘স্বপ্ন খুঁজতে উত্তরের পথে যাচ্ছে! স্বপ্নটা কেমন, সাদা সর্দার?’

‘এসো, দাঁড়াও আমার পাশে। নিজেই দেখতে পাবে। অবশ্য যদি আত্মা দেখার চোখ তোমার থাকে।’

এসে দাঁড়াল মোপো। সাথে সাথেই তার হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। বলল, ‘তার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি, সাদা সর্দার। তাকে আমি ভাল করেই চিনি।’

এবার মুখ খুলল ডিনগান, ‘বুড়ো গাধা, তুমি চেন ওকে! কে, কে সে?’

‘তার নাম মুখে আনা নিষেধ, ও, রাজা। চেহারাটা তারই যে আপনাকে একবাটি পানির ভেতর বিশেষ দৃশ্য দেখিয়েছিল। মনে আছে রাজা?’

এবার ডিনগানের কাঁপার পালা। কারণ ওই দৃশ্যগুলো রাত দিন ওকে তাড়া করে ফেরে। এমনকী ইদানীং রাজা অনুভব করছে যে, পানিতে দেখা দৃশ্য বাস্তব হওয়ার সময়ও খুব কাছে চলে এসেছে। তবে মুখে রাজা বলল, ‘এই সাদা লোকটা পাগল হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিও পাগল হয়ে গেছ, মোপো। তোমার “স্বাস্থ্য” পুনরুদ্ধারের স্বার্থেই দূরে কোথাও থেকে ঘুরে এলে ভাল করবে। আর আমাদের এখানেই ক’দিন থাকবে জেরিয়ো। চাই না, ও ঘুরে ঘুরে স্বপ্ন দেখা নিয়ে আবোল তাবোল বলে আমার প্রজাদের মাথা খারাপ করুক। চিকিৎসকেরাই ওর দেখাশোনা করবে।’

আসলে ডিনগানের ভয়, বামুনদের হাতে অপ্রকৃতিস্থ ইনকোসাজানাকে রাজা তুলে দিয়েছে সেটা ডোরিয়ো জেনে ফেললে পরিণতি হয়তো ভাল হবে না। উপরন্তু সবাই জানে ডোরিয়ো মারা গেছে। তাহলে মৃত মানুষ হেঁটে চলে বেড়ায় কী করে! তাই ডোরিয়োকে বন্দি করে আসল ঘটনা জানতে চায় ডিনগান। নিশ্চিত হতে চায় ডোরিয়ো আসলেই মানুষ, নাকি মৃত, না মৃত লোকের ভোল ধরে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন দুষ্ট জাদুকর।

রাজার হুকুম ফেলা যায় না তাই উঠে দাঁড়াল ইন্দুনারা। কিন্তু রিচার্ডকে ধরার বদলে মাটিতে শুয়ে পড়ল ইন্দুনাদের দল। আকুতিভরা কণ্ঠে রাজাকে বলল, ‘চাইলে আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারেন, কালো রাজা, কিন্তু আপনার এই হুকুম আমরা

পালন করতে পারব না।’

রেগে গিয়ে ডিনগান বলল, ‘জাদুকরটা তোদের জাদু করেছে।’ তারপর সাথে থাকা আট বা দশজন ওঝাকে ডেকে বলল, ‘দুষ্ট জাদুকর ধরা তোমাদের কাজ। যাও, ডোরিয়াকে তোমরাই বন্দি করো।’

যথেষ্ট অনিচ্ছা নিয়ে সামনে বাড়ল তারা। যার যার “পদ্ধতি” অনুসারে কাজ শুরু করল ওরা। কেউ গান ধরল কেউ আবার শুরু করল মন্ত্র পড়া।

এবার মুখ খুলল রিচার্ড, ‘সাবধান, আবানগোমা-রা (ওঝারা), আমার সামনে ভেসে থাকা আত্মাটি খুব রেগে গেছে।’

আর সাহস দেখাতে পারল না ওরা। পথের দু’পাশে পড়ে গেল। রাজাকে বলল, ‘এই জাদুকরের ওপর আমাদের শক্তি কাজ করে না, ও, রাজা।’

রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে ডিনগান। চিৎকার করে সৈন্যদের বলল সাদা লোকটাকে ধর, বাধা দিলে হাতের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেল তাকে। সৈন্যরা লাফিয়ে উঠল বটে, হুম্বিতম্বিতও শুরু করল কিন্তু এগিয়ে এল না কেউ। কেবল এক ক্যাপ্টেন দুই কদম এগিয়ে গেল।

তখন রিচার্ড বলল, ‘পথ ছাড়ো। আর থাকা সম্ভব না। এখনই আমাকে রওনা হতে হবে।’

সেই ক্যাপ্টেনটি তখন বলল, হাতের বর্শাটা ছেড়ে দিয়ে রিচার্ড যেন আত্মসমর্পণ করে। ওদিকে ক্যাপ্টেনের পেছনের সৈন্যরা তাদের হাতের কেরিগুলো শক্ত করে ধরে এগুতে শুরু করল। ইচ্ছা এক আঘাতেই যেন ঘিলু বের করে ফেলা যায়। ঠিক তখনই সবাই দেখল, ওদের চোখের সামনে উদয় হয়েছে অস্পষ্ট, সাদাটে একটা অবয়ব। রিচার্ডের সামনে সামনে হাঁটছে সে। আর অপেক্ষা করে কে, হাতের কেরি ছুঁড়ে ফেলে ছুট দিল সৈন্যরা।

ফটক খোলার চেষ্টাও করল না কেউ। উদ্ভ্রান্ত এক পাল গরুর মতো স্বেচ্ছা নলখাগড়ার বেড়া ভেঙে চলে গেল সবাই।

অস্পষ্ট মূর্তিটাকে রাজাও দেখেছে। সত্যি বলতে অন্যদের চেয়েও ভাল করে দেখতে পেয়েছে সে। ইন্দুনারাও দেখেছে। আত্ননাদ করে উঠল ওরা, ‘ইনকোসাজানা! ইনকোসাজানা! ইনকোসাজানা হাঁটছে ডোরিয়োর সামনে সামনে,’ বলতে বলতে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল তারা। তবে নিজের জায়গায়ই বসে রইল রাজা ডিনগান। বলল, ‘তোমার যদিও ইচ্ছা চলে যাও, সাদা মানুষ। তবে সাথে করে ইনকোসাজানার আত্মাকেও নিয়ে যেয়ো। আমার দেশের ওপর অভিশাপ বয়ে এনেছে সে।’

কাজেই আবার পথে নামল রিচার্ড। দিক পথ কিছুই ওর জানা নেই তবুও কম্পাসের কাঁটার মতো ঠিক উত্তরে পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে ও।

যে পথে র‍্যাচেলরা গেছে ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল রিচার্ড। যদিও সেই ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয় ও। পথে কখনোই ওর খাবারের অভাব হলো না। যখনই খাবার শেষ হয়ে গেল, দেখল খোঁজার আগেই ওর সামনে হাজির হয়ে গেছে খাবার। কখনো ঈগলের থাবা থেকে খসে পড়ল বাস্টার্ড পাখি, তো কখনো পেয়ে গেল চিতার সদ্য শিকার করা তাজা হরিণ। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তো উঠেই আবিষ্কার করেছে ঠিক অস্ট্রিচের বাসার বাইরেই ঘুমিয়েছে ও। আর বাসাটার ঠোঁটের পড়ে আছে অস্ট্রিচের বড়সড় একটা ডিম। নেটিভ কার্ণার কাঠির সাথে কাঠি ঘষে আগুন জ্বালিয়ে ডিমটা হয়তো ঝুঁকি করে খেয়ে নেয় ও। রাতে আগুন না জ্বালিয়েই ঘুমাচ্ছে রিচার্ড। সিংহ এসে ওর পাশে হাঁক ডাক করে চলে যায় কিন্তু কিছু বলে না। প্রয়োজনের সময় সাথে সাথেই পেয়ে যায় পানির উৎস। সোজা কথা সবসময়ই অদৃশ্য একটা শক্তি ওকে পাহারা দিয়ে রাখছে।

এগিয়ে নিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে।

জলাভূমি এলাকা পার হতে মোটামুটি তিন সপ্তাহ লাগল রিচার্ডের। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে বিশালদেহী একদল লোক। রিচার্ডের মনে হলো, সব শেষ। যাত্রার শেষে পৌঁছে গেছি আমি। এরা হয়তো এখনি আমাকে খুন করবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে রিচার্ড দেখল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দানব সদৃশ মানুষগুলো। তারপর সসম্মমে স্যালুট করল ওকে। তারপরই এগিয়ে দিল খাবার আর চামড়ার জুতো। সেই সাথে দিল নতুন পোশাক। বলা বাহুল্য, ওর পায়ের জুতো জোড়ার অবস্থা খুবই খারাপ। গায়ের কাপড়ও বহু আগেই ত্য্যানা হয়ে গেছে। প্রায় নগ্নই বলা চলে ওকে। কাজেই আন্তরিক ধন্যবাদের সাথে জিনিসগুলো নিল রিচার্ড।

দানবেরা পালকি নিয়ে এসেছে। ইশারায় রিচার্ডকে অনুরোধ করল পালকিতে উঠতে। কিন্তু এই বার মানা করল ও। পেট ভরে খেয়ে, মশকগুলোও পানি দিয়ে ভরে নিল ও। তারপর আবার রওনা হলো নিজের পথে। কারণ ওর মাথার ভেতর একটাই পোকা ঘুরছে। গন্তব্যে পৌঁছার আগে সেটা কোনমতেই ওকে শান্তি দেবে না। চোখের সামনে কেবল র‍্যাচেলের ধোঁয়াটে অবয়ব ছাড়া আর কিছুই দেখে না ও। জেগে থাকলে প্রায় সবসময়ই ঠুঁকে চোখের সামনে দেখতে পায়। কখনো কিছু সময়ের জন্য অবয়বটা হারিয়েও যায়। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই ওর পাশে থাকে র‍্যাচেলের আত্মা। প্রতি পদক্ষেপে ওকে পুঁথি দেখিয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে।

রিচার্ডের নজরে এসেছে যে, ওই দানব সদৃশ লোকগুলো ওকে অনুসরণ করছে। তবে যেহেতু ওরা তাকে বাধা দিচ্ছে না উল্টো সাহায্যই করছে—খাবার দিচ্ছে, রাত্তির জন্য আশ্রয় বানিয়ে দিচ্ছে তাই ওদের দিকে আর তেমন একটা নজর দিল না রিচার্ড।

খেয়াল করল দানবদের সর্দার লোকটা জুলু ভাষা টুকিটাকি বুঝতে পারে। ওকেই জিজ্ঞেস করল, কেন ওকে সাহায্য করছে তারা। জবাবে সে জানাল যে এটাই বৃক্ষমাতার হুকুম। কিন্তু বৃক্ষমাতাটা কে বা কী সেই তথ্য ওদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হলো না। ফলে এই বিষয়ে চিন্তা বাদ দিয়ে হাঁটার দিকেই মনোযোগ দিল রিচার্ড।

একসময় মরুভূমির প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা। কিন্তু সামনে মরু নাকি সাগর সেদিকে জ্রঞ্জেপই নেই রিচার্ডের। মরু তো মরু, আগুনের সাগর হলেও চোখ বন্ধ করে তাতে নেমে পড়ত ও। সাথেই দানবদের দলের একজন চামড়ার বিরাট বড় এক ব্যাগে করে পানি বয়ে চলেছে। একসময় হাঁটতে হাঁটতে ওরা মরুও পার করে ফেলল। কিন্তু ততক্ষণে রিচার্ডের সাথে টিকে আছে দানবদের কেবল একজনই। মরুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে এই লোকটিও পড়ে গেল। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে সে। তবে রিচার্ডকে দেখে মনেই হচ্ছে না মরু পাড়ি দিয়েছে ও। মোটেও ক্লান্ত নয় রিচার্ড।

ওদিকে পড়ে যাওয়া দানব ওখানে বসেই ছোট একটা ড্রাম বের করল। একবার রিচার্ডের মাথায় হালকা একটা চিন্তা এল বটে যে, এটা কি ড্রাম বাজানোর সময় হলো! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যার মাথা তার ব্যথা। সাথে সাথেই ওই চিন্তা ঝেড়ে ফেলল ও। এগিয়ে চলল নিজের পথে।

সামনেই চোখে পড়ল টাওয়ারের মতো বিশাল বিশাল বৃক্ষসমৃদ্ধ আদিগন্ত বিস্তৃত বনানী। সন্ধ্যার লালিমায় মনে হচ্ছে গাছগুলোর গায়ে যেন আগুন লেগে গেছে। বিশাল গাছের ডালগুলো মাথার ওপর ছায়া করে রেখেছে। ফলে নীচটা হয়ে আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। উপরন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রিচার্ড। বরাবরের মতোই আগুপিছু চিন্তাভাবনা না করে

একটা গাছের শিকড়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে রিচার্ড বলতে পারবে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর। অনুভব করল গায়ের ওপর কিলবিল করে বেঁড়াচ্ছে বাচ্চাসুলভ ছোট ছোট কিছু হাত। দুটো হাত ওর মুখ চেপে ধরে আছে যেন চিৎকার করতে না পারে। এরই মধ্যে ওর হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। তারপর, যে গাছটার নীচে ও ঘুমিয়েছিল সেটার কাণ্ডের সাথেই বেঁধে ফেলা হলো ওকে। মুখ খুলে দেয়া হলো। সাথে সাথে চিৎকার করে সাহায্য চাইল ও। কিন্তু এখানে কোন সাহায্যকারী নেই। চিৎকারের জবাবে ফিরে এল উপহাসের হাসি।

ওদিকে ওর মনের মধ্যে সেই পথপ্রদর্শক আত্মা গেঁয়ে চলেছে যে, গন্তব্যের খুব কাছে পৌঁছে গেছ তুমি। দেরি কোরো না। চলো রওনা হও। কিন্তু রিচার্ডের হাত পা বাঁধা। “যতই ও জোরাজুরি করে ততই গায়ে কেটে বসে রশির বাঁধন। বাঁধনমুক্ত হতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো ও।

চব্বিশ

এডোর সাথে নায়া দেখা করার পরের দিনের কথা। ওহামুখে অস্ত্রির হয়ে পায়চারী করছে নায়া। বেশ কয়েকবারই তাকে পাশ কাটিয়ে গেছে নোয়ি আর র্যাচেল। কিন্তু ওদের দিকে মোটেও মনোযোগ দিল না সে। সন্ধ্যা নাগাদ পায়চারী থামাল। র্যাচেলরা

অবাক হয়ে দেখল কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে নায়া। যদিও ওদের কর্ণকুহরে বিন্দুমাত্র শব্দও আসছে না। এরপরই র্যাচেল আর নোয়িকে কাছে ডাকল সে।

র্যাচেলকে বলল, ‘আমার শেষ সময় চলে এসেছে। তোমাদের ডেকেছি বিদায় নেয়ার জন্য। সূর্য ডোবার আগেই মৃত্যুগুহায় চলে যাব আমি।’

কেঁদে ফেলল র্যাচেল। এই সদয় মনের বামুন মহিলাটিকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে ও। বলল, ‘আমি জানি মৃত্যু নদী পার হওয়াই আপনার ইচ্ছা, তাই বাধা দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু আপনি চলে গেলে আমি কী করব, মা? এ দেশের লোকজন কুটিল। এদের মাঝে আমি বাঁচব কী করে? আমার কী করা উচিত, মা?’

‘সম্ভবত আরেকজন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে তুমি। সে-ই তোমাকে দেখে রাখবে। নিজের মনের কথা শুনবে, মানবে। আর মনে রাখবে, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। না, আর কিছু বলা যাবে না। বিদায়, মেয়ে আমার।’

এবার নোয়ি বলল, ‘আমার জন্য কোন উপদেশ নেই, মা?’

‘আছে। কাছে এসো। তোমার মন খুব শক্ত। তুমিও নিজের মনের কথা শুনবে। হয়তো পাপ করবে তুমি। তবে ভালবাসার শক্তিতে ক্ষমাও পাবে একসময়। আর নিয়তি যা নির্ধারণ করে রেখেছে তা হবেই। মনে রেখ, ধনুকের ছিলায় বসানো তীর তুমি। কাজেই তীরের মতো একসময় তোমাকেও নিয়তি নির্ধারিত কাজ করতে হবে। হয়তো খুব বেশি সময় পার হওয়ার আগেই আবার আমাদের দেখা হবে। এসো আমার পাশে বসো, এরপর নোয়ির কানে কানে কী যেন বলল নায়া। র্যাচেল দেখল একেকবার আগ্রহের আতিশয্যে চকচক করে উঠল নোয়ির চোখ। কখনো আবার ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল গভীর নিরাশা।

পরে একসময় নোয়িকে র্যাচেল প্রশ্ন করেছিল যে, নায়া কি

বলেছে।

জবাবে নোয়ি বলেছিল, ‘এগুলো কাউকে বলা যাবে না, লেডি। তাই দয়া করে এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করবেন না।’

নায়া এখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে নিজের পায়ে আর হাঁটতে পারছে না। তাই ডালপালা দিয়ে বানানো একটা পালকি নিয়ে আসা হয়েছে। ডালগুলো ওরই পড়ে যাওয়া গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওটায় করেই মৃত্যুগুহার যাবে সে। পালকিতে চড়ে শেষ বারের মতো নোয়ি আর র্যাচেলকে কাছে ডাকল সে। মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল ওদেরকে। তারপর পালকি নিয়ে গুহার দিকে রওনা হয়ে গেল বোবা-কালী অভিভাবকরা।

র্যাচেলরা শুনতে পেল গুহার বসে একটা গান গাইছে নায়া। তারপর একসময় গান থেমে গেল। গুহামুখের সামনে থেকে সরে এল র্যাচেল আর নোয়ি। সামান্য একটু খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ল দু’জনেই। ঘুমাতে চাইল। কিন্তু কারো চোখেই ঘুম আসছে না। ছটফট করতে করতে একসময় উঠে বসল র্যাচেল। নোয়িকে বলল, ‘আর পারছি না, নোয়ি। মনে হচ্ছে বনের ভেতর থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে। আমাকে যেতেই হবে।’

‘কে ডাকছে, বোন? এডো?’ প্রশ্ন করল নোয়ি।

‘না; এডো না। মনে হচ্ছে রিচার্ডের আত্মা ডাকছে আমায়। আমি জানি, ও মারা গেছে। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অনুভব করছি, ওর আত্মার সাথে কথা বলছে আমার আত্মা। এখন ভীষণভাবে আমাকে ডাকছে সে। হয়তো ওখানে গিয়ে মরব। তবে মরলেও অন্তত রিচার্ডের আত্মার দেখা পাব। কাজেই আমি যাচ্ছি।’

‘সত্যিই যাবেন, জুলা? আমার ভেঁ মনে হচ্ছে শয়তানে ডাকছে আপনাকে।’

‘না, নোয়ি, শয়তান নয়। আমার বরং মনে হচ্ছে, খুব আনন্দময় কিছুর দেখা পাব আমি। ভেবেই ভাল লাগছে। আর নায়া কী বলেছিল মনে আছে? বলেছিল মনের কথা শুনতে। কাজেই আমি যাচ্ছি। বিদায়।’

‘না না, দাঁড়ান। আপনি গেলে আমিও যাব। আমাকেও নায়া বলেছিল মনের কথা শুনতে। আমার মন বলছে আপনার সাথে যেতে। সুতরাং আমিও আপনার সাথে যাচ্ছি,’ বলল নোয়ি।

র্যাচেল ওকে বাধা দিতে চাইল। কিন্তু ওসব শোনার সময় নোয়ির নেই। ওর এক কথা, র্যাচেল গেলে ও-ও যাবে। সুতরাং উঠে পড়ল দু’জনেই। গায়ে জড়িয়ে নিল কালো আলখেল্লা। আর র্যাচেল হাতে নিল সাথে আনা ভারী উমকুলু বর্শা। ব্যস, বেরিয়ে পড়ল দু’জন। এক বামুন মহিলা ওদের দেখল, কিন্তু বাধা দিল না। ওরা ভেবেছে দেয়ালের সীমার বাইরে বের হওয়ার সময় হয়তো বাধা দেয়া হবে। কিন্তু না, তা-ও না। কেউই বাধা দিল না ওদের। উল্টো, দেয়ালের গোলক ধাঁধার মধ্যে পথ ভুলে গেলে কেউ একজন র্যাচেলের ক্লোকের প্রান্ত ধরে পথ দেখিয়ে এগিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত দেয়ালের বাইরে চলে এল ওরা।

কোন দিকে যাবে তা এক মুহূর্ত মাত্র ভাবল র্যাচেল। পরমুহূর্তেই সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

জঙ্গলের ভেতর ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করল না র্যাচেল। একটা শিকড়েও ওর পা ঝাঁকল না। পথ দেখিয়ে নোয়িকে নিয়ে এগিয়ে চলল ও। একসময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল র্যাচেল। ফিসফিস করে নোয়িকে বলল, ‘আমার মন বলছে, এখানে থেমে একটু দেখে নিতে।’

উপড়ে পড়া একটা গাছের শিকড়-খাকড়ের খাঁজে লুকিয়ে বসেছে ওরা। গাছ পড়ে যাওয়ায় মাথার ওপর ফাঁকা তৈরি

হয়েছে। ওখান দিয়েই দেখা মিলল ধূসর আকাশের। অর্থাৎ, ভোর আসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো, ফুটল। সেই আলোয় চারপাশটা দেখে চমকে উঠল র্যাচেল। কারণ এই জায়গাটা যে ওর বহুদিনের চেনা। সেই যে ছোটবেলায় ঝড়ের রাতে নদীর মাঝে গুহামুখে বসে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই জায়গাটাই এটা!

স্বপ্নে দেখা ঠিক সেই দৃশ্যটার মতোই বিশাল একটা গাছের গায়ে এসে পড়ল সূর্যের প্রথম আলো। আরো অবাক হয়ে র্যাচেল দেখল, গাছটার কাণ্ডের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন লোককে।

অর্ধনগ্ন মানুষটির চুল দাড়ি সব সোনালী, চোখ বোজা! কোন সন্দেহ নেই মানুষটি রিচার্ড ড্যারিয়েন। দেখে মনে হচ্ছে মারা গেছে সে। এজন্যই মনে হয় ওর আত্মা র্যাচেলকে এখানে ডেকে এনেছে, যেন রিচার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে মারা যেতে পারে।

আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল র্যাচেল। এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেল রিচার্ডের কাছে। বুঝেই পাচ্ছে না; মৃত একটা মানুষের আত্মাকে গাছের সাথে কীভাবে বেঁধে রাখা সম্ভব। আরেকটু কাছে যেতেই দেখল মাটিতে লোকটার গায়ের ছায়া পড়ে আছে। আত্মার ছায়া! এ-ও কি সম্ভব?

আরো কাছে যেতেই চোখ খুলল রিচার্ড। ওর চেহারায় ফুটে উঠেছে আনন্দের দৃষ্টি। মুখ খুলল রিচার্ড। বলল, 'অনেক, অনেক দূর থেকে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ তুমি, র্যাচেল। তবু কখনোই তোমার পুরো অবয়ব দেখিনি। কেবল চেহারাটাই দেখতে পেতাম। এখন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। ঝুঁতে পারছি আমার সময় শেষ। আমার সব যন্ত্রণা এখনই শেষ হবে। মৃত্যু নদী পাড়ি দিয়ে তোমার সাথে মিলিত হব আমি। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

র্যাচেলের মনে হচ্ছে ওর গলায় দলা পাকিয়ে আছে কিছু

একটা। কথা বলতে পারছে না ও। হাতের বর্শাটা দিয়ে নিজের ছায়ার দিকে রিচার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল কেবল।

বাঁধা থাকায় কষ্ট করে রিচার্ডকে ওদিকে তাকাতে হলো। পরমুহূর্তেই খানিক ককর্শ স্বরেই ও প্রশ্ন করল, ‘তুমি আত্মা হলে তোমার ছায়া থাকে কী করে? আর যদি ভূত না-ই হও, তো এই ভূতের দেশে এলে কী করে?’

এখনও কথা বলতে পারল না র‍্যাচেল। বলার চেষ্টাও অবশ্য করল না। ছুটে গিয়ে রিচার্ডের ঠোঁটে চুমু খেল ও। দু’জনেই বুঝল, ওরা উভয়ই জীবিত। সাথে সাথে সংবিৎ ফিরে পেল রিচার্ড। বলল, ‘ঘুমের মধ্যে কিছু লোক আমাকে বেঁধে রেখে গেছে। তাড়াতাড়ি আমাকে মুক্ত করো।’

রশি কেটে রিচার্ডকে মুক্ত করে ওর হাতে একটা বর্শা তুলে দিল র‍্যাচেল। সাথে সাথেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল পুরো বন। চারদিক থেকে পিলপিল করে বের হতে শুরু করল বায়ুনেরা। বলা বাহুল্য ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এডো।

লাফিয়ে রিচার্ডকে আড়াল করে ওর সামনে এসে দাঁড়াল র‍্যাচেল। এডোকে প্রশ্ন করল, ‘এসবের অর্থ কী, পুরোহিত?’

র‍্যাচেলের প্রতি এডোর সম্বোধন বদলে গেছে। সে বলল, ‘অর্থ হচ্ছে, আপনাকে অভয়াশ্রম থেকে বের করে আনার একটা উপায় পেয়ে গেছি আমি। নায়ার দেয়া শক্তি দিয়ে এই লোকটাকে বহু দূর থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন আপনি। সেটাও আমরা জানি। এ-ও জানি যে, এই লোককে পথ দেখিয়ে মরুভূমি পার করিয়ে দিতে উমকুলুদেরকে হুকুম করেছিল নায়া। ঢাক বাজিয়ে ওদেরকে হুকুম করেছিল সে। আমরা সবই জানতাম। শিশির-পাত্র দেখে সবাই অপেক্ষা করে ছিলাম, কবে সে আমাদের এলাকায় পা ফেলবে। মরু পার হয়ে এই লোক আমাদের সীমায় ঢুকেছে সেটা ঢাক বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল উমকুলুর সর্দার।

ব্যস, রাতে ওকে ধরে ফেললাম। কারণ খুব ভাল করেই আমরা জানতাম, সে আপনার কাছে যেতে না পারলে আপনি নিজেই ওকে দেখতে চলে আসবেন। হয়েছেও তা-ই।’

‘বুঝেছি, এখন কী চাও?’

‘চাই, আমাদের সাথে যাবেন আপনি, ইনকোসাজানা। বসবেন ভূত জাতির শাসকের আসনে।’

রিচার্ডকে দেখিয়ে র্যাচেল বলল, ‘এই সাদা লর্ড আমার বাগদত্ত। ওর কী হবে?’

কুটিল হাসি ফুটল এডোর মুখে। বলল, ‘বৃক্ষমাতার কোন স্বামী থাকে না। জ্ঞানই তার স্বামী। তাকে আমাদের পবিত্র এলাকায় প্রবেশ করতে দিয়েছি কারণ আপনাকে ‘অভয়াশ্রম থেকে বের করা দরকার ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। এখন ওকে মরতে হবে। তবে যেহেতু আপনার ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে, তাই অবশ্যই সে সম্মানের দাবিদার। সাদা মৃত্যু দিয়ে তাকে সম্মান করব আমরা। এই, তোমরা ওকে গাছের সাথে বেঁধে ফেলো আবার।’

চোখের পলক পড়ার আগেই নিজেকে র্যাচেলের বর্ষার ডগায় আবিষ্কার করল এডো। হিসহিস করে র্যাচেল বলল, ‘বামুন, আমি কোন বৃক্ষমাতা নই। তোমাদের মতো ফ্যাকাসে ভূতই নই, জীবিত মানুষ আমি। তোমার বানরদের কেউ যদি আমার লর্ডের দিকে একটা আঙুলও তোলে তো সবার আগে খুন হবে তুমি। রক্তাক্ত মৃত্যু হবে তোমার, গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তোমার আত্মার যোগ। চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি।’

আতঙ্কিত এডো হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। পালাবার উপায় খুঁজছে সে। অবশ্য মুখে বলল, ‘আমি মরলে আপনিও মরবেন, ইনকোসাজানা।’

‘পরোয়া করি না। আমার লর্ড মরলে আমিও মরব।’ তারপর ইংরেজিতে রিচার্ড আর নোয়িকে বলল, ‘এর এক হাত ধরো, রিচার্ড। আর নোয়ি ধরো আরেক হাত। একটু বেচাল দেখলেই বুকে বর্শা বসিয়ে দেবে। আর তোমরা যদি ভয় পাও তো আমিই ওকে মারব।’

কাজেই এডোকে বন্দি করল ওরা।

র্যাচেল বলল, ‘অভয়াশ্রমে ফিরতে হবে। পানি ছাড়া মরুভূমি পাড়ি দেয়া সম্ভব না। মরু পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করতে গেলেও পিছু নেবে ওরা। তীর ছুঁড়ে আমাদের মেরে ফেলতে চাইবে। ওদেরকে বলো, নোয়ি, ওরা যদি আমাদের কোন ক্ষতি না করে তাহলে অভয়াশ্রমের দেয়ালের ভেতর মুক্ত রাখব এডোকে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তোলবে, তাহলে রক্তাক্ত মৃত্যু হবে এডোর।’

নোয়ি আর বলবে কী, এডো নিজেই হাউমাউ করে নিজের লোকদের বলল, ‘ওদের স্পর্শও কোরো না কেউ। ওদের ক্ষতি করলে আমার আত্মাকে রক্ত থেকে আলাদা করে ফেলবে ওরা। আমি হুকুম করছি, কেউ ওদের ক্ষতি করবে না।’

ভোরের পাখির দলের মতো ক্যাচর-ম্যাচর করে কথোপকথন শুরু করল বামুনদের দল। তারপর চলে গেল তারা। আসলে ওদের থেকে একটু দূরে সরে দুই পাশ থেকে র্যাচেলদেরকে অনুসরণ করে চলেছে ওরা।

নোয়ি আর রিচার্ডের মাঝে বন্দি হয়ে আছে এডো। আর ওদের পেছন পেছন বর্শা হাতে চলেছে র্যাচেল পথ দেখিয়ে তিনজনকে অভয়াশ্রমের সামনে নিয়ে এল র্যাচেল। নোয়ি প্রশ্ন করল, ‘একে নিয়ে কী করব? মেরে ফেলব, বন্দি করে রাখব নাকি ছেড়ে দেব?’

‘বামুনদের আমি বলেছি, অভয়াশ্রমের দেয়ালের ভেতর মুক্ত

রাখব ওকে। তা-ই রাখব। কারণ মরে গেলে আমাদের আরো বেশি ক্ষতি করবে ও। উপরন্তু আমাদের হাতে রক্তের দাগ লাগবে। না, ওকে মারা যাবে না। সাথেই নিতে হবে। ভেতরে ঢুকে ছেড়ে দেব।”

অভয়াশ্রমের অভিভাবকদের অবাক দৃষ্টির সামনে আবারও ভেতরে ঢুকল ওরা। আগের চত্বরে এসে এডোকে ছেড়ে দিল নোয়ি। সাথে সাথে লাফিয়ে কয়েক হাত সরে গেল এডো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘গাধার দল, আমি ফাঁদে পড়িনি, পড়েছ তোমরা। তোমরা শরীরে বড় হতে পার, বেশি শক্তি আছে তোমাদের গায়ে, কিন্তু তোমাদেরও খেতে হয়। খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেব আমি। আমার পায়ে পড়ে দয়া ভিক্ষা না চাওয়া পর্যন্ত অভুক্ত রেখে শাস্তি দেব তোমাদের,’ বলে ইশারায় অভিভাবকদের কিছু একটা বলে অন্ধকারের ভেতর গায়েব হয়ে গেল এডো।

‘ওকে মেরে ফেলা উচিত ছিল, জুলা। এখন আমাদের সবাইকে মারার পরিকল্পনা করবে ও,’ বলল নোয়ি।

‘আমার মনে হয় না। মনে আছে, নায়া কী বলে গিয়েছিল? বলেছিল মনের কথা শুনতে। তা-ই শুনেছি আমি। তাছাড়া আমাদের হাতে রক্ত লাগাতে চাইনি। কারণ রক্তপাত কখনো শুভ পরিণতি ডেকে আনে না।’

এরপর রিচার্ডের দিকে ফিরল ও। দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে রিচার্ডের। মাতালের মতো সামনে পিছে দুলছে। যেন এতদিনের পথ চলার সমস্ত ক্লান্তি একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর। র্যাচেল আর নোয়ি মিলে ধরাধরি করে গুহার ভেতর নিয়ে গেল ওকে। ওর মৃত্যুগুহা থেকে নতুন একটা মৃতদেহ নামানো হচ্ছে। খেয়াল করতেই দেখল পালকিতে শোয়ানো মৃতদেহটা নায়ার। পথের ধারে মাথা

ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল ওরা। দেহটা নিয়ে যাওয়া হলো বৃক্ষমাতাদের জন্য নির্ধারিত সম্মানজনক কবরস্থানে। ওখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে তাকে।

নিজেদের গুহায় চলে গেল ওরা। ওখানে স্ট্যালাক্টাইটের গাছ-সদৃশ খুঁটির পাশে বসে আছে দু'জন বোবা-কালো মহিলা। দু'জনেরই সামনে রাখা শিশির-বাটি। বাটির দিকে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে আছে দু'জন। নায়ার মৃত্যু, নতুন একজন মানুষের আগমন কিছুই ওদেরকে জায়গা থেকে টলাতে পারেনি। র্যাচেলরা বের হওয়ার সময় যেভাবে দেখে গিয়েছিল ফিরেও সেভাবেই ওদের বসা দেখতে পেল।

বিছানা পাতা রয়েছে, খাবারও দেয়া হয়েছে কিন্তু সামান্যই খেল রিচার্ড। এবং পুরোটা সময় এমনভাবে র্যাচেলের দিকে তাকিয়ে রইল যেন আগের সেই আত্মটাকেই দেখছে। তারপর ক্রান্তির কথা বলে শুয়েই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটাল রিচার্ড। ওর পাশে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলেও পরে ক্রান্তির কারণে শুয়ে পড়ল র্যাচেলও। যখন ওর ঘুম ভাঙল দেখল গুহামুখে বসে আছে নোয়ি। আর ওদের মাথার পাশে নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে কুপি বাতিটা।

নোয়ি ডাক দিল ওকে। 'জুলা, বিশ্রাম হলে উঠে পড়ুন। তেল পাচ্ছি না কোথাও। কুপিটা নিভে যাচ্ছে। সাদা সর্দারকে আমরা দু'জনে ধরে বাইরে নিয়ে এলেই হবে।'

র্যাচেলের স্পর্শে জেগে উঠল রিচার্ড। তুলে ওঠানো লাগল না। এবং আশ্চর্য হয়ে ওরা আবিষ্কার করল বোবা-কালো বামুনেরা ওদের সমস্ত মাল-সামান গুছিয়ে নিয়ে সরে যাচ্ছে এখান থেকে।

'ওরা চলে যাচ্ছে কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল র্যাচেল।

'জানি না, জুলা। সম্ভবত খাবার আসছে না। আপনার

নিশ্চয়ই মনে আছে, এডো বলেছিল ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে হবে আমাদের? সম্ভবত তা-ই হয়েছে। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণাই পারে এই বামুনদেরকে তাদের একমাত্র আশ্রয় থেকে বাইরে বের করে নিয়ে যেতে,' র‍্যাচেলের প্রশ্নের জবাবে বলল নোয়ি।

এই মুহূর্তে অভয়াশ্রমের দেয়ালের ভেতর ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। বামুন অভিভাবকরা সবাই চলে গেছে। এমনকী মৃত্যুগুহার ভেতরেও কেউ নেই। এদিকে রিচার্ডেরও ঘুম ভেঙেছে। উঠে বসছে ও। কথা বলতে চাইছে। কিন্তু ঠিকভাবে বলতে পারছে না।

তখনই র‍্যাচেলকে আবার বাধা দিল নোয়ি। বলল, 'জুলা, কথাবার্তা গুরুত্ব আগে চলুন অভয়াশ্রমে প্রবেশপথের মুখটা ভাল মতো বন্ধ করে দিয়ে আসি। নইলে দলবল নিয়ে এডো কখন ঢুকে পড়বে বলা যায় না। শেষে বেঘোরে আমাদের প্রাণটা যাবে।'

'অভয়াশ্রমের দেয়ালের ভেতর এডো রক্তপাতের সাহস করবে বলে আমার মনে হয় না। তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তুত থাকাই ভাল,' বলল র‍্যাচেল।

দেয়ালের প্রবেশমুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। তাই প্রবেশপথের সবচেয়ে সরু একটা জায়গায় এমনভাবে ওরা পাথর এনে রাখল যে বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকা হবে খুবই কষ্টসাধ্য। লম্বা কয়েকটা ঘণ্টা পরিশ্রম করে দেয়ালটা দাঁড় করাল ওরা। তবে এ কাজটা আসলে বৃথাশ্রম দেয়া হলো। কারণ র‍্যাচেলের ধারণাই ঠিক। এ জায়গাটাকে বামুনরা পবিত্র জ্ঞান করে। তাই ভেতরে ওরা আসবে না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওরা নিজেরাই কখন আত্মসমর্পণ করবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকবে এডো আর তার দল।

যা হোক, সন্ধ্যা নাগাদ গুহায় ফিরে গেল ওরা। যৎসামান্য খাবার-দাবার যা আছে সেগুলো খুঁজে বের করল। কিন্তু এ দিয়ে কিছুই হবে না। টেনেটুনে দুই বেলা চলবে হয়তো। গুহার ভেতর থেকে বয়ে যাওয়া ঝর্ণাটা থাকায় কেবল পানিরই কোন অভাব নেই। কোনরকমে দু'মুঠো মুখে দিয়ে ক্লোক আর মাদুর নিয়ে চলে গেল গুহার বাইরে। দেয়ালের গা ঘেষে নতুন ক্যাম্প করেছে ওরা। এখান থেকে পরস্পরের ওপর নজরও রাখা যাবে, আবার একই সমস্যা বাইরেও চোখ রাখা সম্ভব হবে।

বিকেল নাগাদ দেয়ালের ওপর থেকে নেমে এল নোয়ি। ওখানে বসে চারদিকে নজর রাখছিল ও। নেমে এসে বলল, অভয়াশ্রম ঘিরে বসে আছে বিপুল সংখ্যক বামুন। অভয়াশ্রম অপরূক করে রেখেছে ওরা। সেই রাতটা কেটে গেল, এল নতুন প্রভাত। খাবার নেই, তাই শুধু পানি খেল ওরা। ঝিম্মানো, অবসন্নভাবে কাটল দুপুরটা। বিকেলে পরিবেশটা একটু ঠাণ্ডা হবার পর একত্রে বসল ওরা। কী করা যায় তা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করল।

রিচার্ড প্রস্তাব করল যে, যেহেতু পালানো অসম্ভব, তাই এডোর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়। সাথে সাথেই প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল র্যাচেল। কারণ আত্মসমর্পণ করা মাত্রই রিচার্ড আর নোয়িকে মেরে ফেলবে এডো। তারপর র্যাচেলকে ধরে নিয়ে ওর কাঠ-পুতুলিকা হিসেবে বৃক্ষজাতির শাসকের আসনে বসাবে। ওভাবেই ওকে রাখবে যতদিন না এডোর ইচ্ছা পূরণ হয়। তারপর ওকেও চিরতরে সরিয়ে দেবে এডো।

শুনে রিচার্ড বলল, 'তাহলে তো বসে থেকে মরার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

‘মৃত্যুর অপেক্ষা, হ্যাঁ, সেটাই হয়তো করতে হবে। তবে, প্রিয়, সেটাও আমাদের জন্য খুব বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে না।

কারণ আমরা দু'জনেই তো পরস্পরকে বহুদিন ধরে মৃত ভেবে এসেছি,' বলল র্যাচেল।

এবার রিচার্ড বলল, 'কিন্তু তারপরও এটা কঠিন। কারণ মৃত্যুর পর কে কোথায় যাব কে জানে। এত ঝড়-ঝাপ্টার পর তোমার এত কাছে এসে আবার হারানো... না, এটা চিন্তা করাও আমার জন্য অনেক কঠিন।'

'তুমি কী বল, বোন?' নোয়িকে প্রশ্ন করল র্যাচেল।

সরাসরি উত্তর না দিয়ে নোয়ি বলল, 'দেয়ালের ওপরে এই মসগুলো পেয়েছি। এগুলো খাওয়া যায়। সেদ্ধ করে খেয়ে নিই চলুন,' বলে একটু মস বের করল নোয়ি।

'এটুকুই, না আরো আছে?' প্রশ্ন করল র্যাচেল।

'না, আর নেই। ওই বড় গাছটার বিষ বাষ্পের কারণে এখানে কোন গাছ, লতা, গুল্ম কিছুই জন্মাতে পারে না। তবে আজ এটা খেয়ে নিন। আমি একটা খবরের অপেক্ষা করছি। সেটা আগে পাই, তারপর দেখা যাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে কি না,' বলল নোয়ি।

'খবর! এখানে কার কাছ থেকে তুমি খবর পাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল র্যাচেল।

'মৃত্যুলোক থেকে খবর আসবে। নায়াই এ কথা বলে গিয়েছিল। সম্ভবত সে-ই খবর পাঠাবে। খবরটা যদি না আসে, তখন না হয় সর্দার ডোরিয়োর কথা মতো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া যাবে,' নির্বিকারভাবে উত্তর দিল নোয়ি।

কাজেই এবার মস নিয়ে পড়ল ওরা। গুহার ঝর্ণার পানিতে যতটা সম্ভব ভালভাবে ধুয়ে নিয়ে সেদ্ধ করা হলো। তারপর রীতিমতো কষ্ট করে ওরা গলাধঃকরণ করল সেদ্ধ করা মসের নিরতিশয় বিশ্বাস-সুপ। তবে যত বিশ্বাসই হোক, পুষ্টির উৎস সেটা। একটু হলেও গায়ে শক্তি পেল সবাই।

ভয়ানক গরম নিয়ে এল আঁধার রাত। হাঁসফাঁস করতে করতে রাতটা কোনরকমে কাটল। কিন্তু দিনে গরম পড়ল আরো বেশি। যে কোন দিনের চেয়ে অনেক বেশি গরম। নিঃশ্বাস নেয়াই দায়। গরম থেকে বাঁচতে গুহায় আশ্রয় নিল ওরা। কিন্তু ওখানেও একই অবস্থা। বাতাসের অভাবে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে থাকল সবাই। তখনই কানে এল গাছের কাণ্ড ফাটার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। প্রচণ্ড গরমে শুকিয়ে গিয়ে ফেটে গেছে গাছটা। দুপুর নাগাদ বিনা নোটিশে আকাশ কালো হয়ে গেল। ভারী মেঘ জমেছে আকাশে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো বাতাসের ওপর। ক্রীমের মতো ভারী হয়ে গেছে বাতাস। একটু শ্বাস নিতে গুহা থেকে বের হলো ওরা। এবং আবিষ্কার করল দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক বামুন। বলার অপেক্ষা রাখে না; লোকটা হচ্ছে এডো। চিৎকার করে ওদের আত্মসমর্পণ করতে বলল সে।

নোয়ি জানতে চাইল, ‘কী শর্তে?’

‘আগের শর্ত। তুই আর সাদা ভবঘুরে সাদা মৃত্যু পাবি। ইনকোসাজানা বৃক্ষমাতা হবে।’

‘মানি না। আমাদের জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দাও, খাবার আর নিরাপত্তা দাও। তুমি বেঁচে যাবে, পুরোহিত। নইলে নায়া যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা-ই ঘটবে। তোমার লোকজন সহ সবার কপালে জুটবে রক্তাক্ত মৃত্যু,’ বলল নোয়ি।

উপহাসের হাসি হাসতে হাসতে এডো বলল, ‘আগামী কালের মধ্যেই দেখা যাবে কার কথা সত্য হয়,’ বলে দেয়াল থেকে নেমে চলে গেল সে।

হঠাৎ করেই এল শক্তিশালী বাতাসের ঝেঁকটা ঝাপ্টা। গুড়িয়ে উঠল বনের গাছপালা। তখনি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নোয়ি। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে ও!

‘কী শুনছ?’ অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল র্যাচেল।

‘বাতাসের ভেতর একটা কণ্ঠ শুনলাম, বোন। যে খবরের অপেক্ষা করছিলাম সেটা পেয়ে গেছি।’

‘কী খবর!’ অবাক রিচার্ডের প্রশ্ন।

‘গুহায় চলুন, বলছি। বিরাট ঝড় আসছে। খোলা জায়গায় থাকা নিরাপদ না,’ বলে সবাইকে নিয়ে গুহায় চলে এল নোয়ি। র্যাচেলদের অবাক দৃষ্টির সামনে আগুন জ্বালল ও। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করল বিভিন্ন সময়ে ভেট আর উপহার হিসেবে আসা মূল্যবান কাঠের মূর্তি ও দেব-প্রতিমা।

ওদিকে একের পর আসছে তীব্র ঝড়ো বাতাসের দমক। শেষে এল হারিকেনের মতো প্রলয়ংকরী বাতাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসের প্রচণ্ডতা এত বেড়ে গেল যে, মাটির গভীরে মূল থাকা সত্ত্বেও রীতিমতো উপড়ে আসতে চাইছে অভয়াশ্রমের বিশাল মহীরুহটা। বাতাসের প্রচণ্ড চাপ পড়ছে বিশাল দেয়ালটার ওপরও। দেয়ালের ছোট ছোট আলগা পাথরগুলো খুলে গিয়ে বাতাসের টানে গুলির মতো ছুটে যাচ্ছে একেক দিকে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নোয়ি। হাতে আগুন ধরা একটা কাঠের টুকরো। কেউ কিছু বোঝা বা বলার আগেই ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ও। মুহূর্তখানেক পরেই আবার ফিরেও এল। র্যাচেলদের ডাক দিয়ে বলল, ‘বাইরে আসুন। এমন এক জিনিস দেখবেন যা আগে কখনো দেখেননি, ভবিষ্যতেও দেখবেন না।’

কাজেই দুর্বলতা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল ওরা। গুহার মুখে বাতাসের তীব্রতা মারাত্মক। তাই দাঁড়িয়ে না থেকে শুয়ে পড়ল ওরা। এবং যা দেখল তাতে চোখ কপালো উঠে গেল সবার। আগুন ধরে গেছে বৃক্ষজাতির আত্মা মহীরুহটায়। গাছের ডালে ঝুলে থাকা মসগুলো নেই। আগুন ধরে ফুলকি হয়ে উড়ে যাচ্ছে

শুকনো মসগুলো। বাতাসের তোড়ে ওগুলো উড়ে গিয়ে পড়ছে বাইরের বনে।

রীতিমতো আতর্জনাদ করে উঠল র্যাচেল, জিজ্ঞেস করল, 'এই কাজ করল কে?'

'আবার কে, আমি,' জবাব দিল নোয়ি। 'এ কাজ করার হুকুমই বাতাসের সাথে ভেসে এসেছে। আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি। বামুন জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই জন্ম হয়েছিল আমার। যদিও পরিণামে ভুগতে হবে আমাকেও। আমার মৃত্যু অবধারিত। তবে আপনারা বাঁচবেন।'

'জাতিকে ধ্বংস করেছ মানে?'

'মানে, বৃক্ষজাতির প্রাণ এই গাছ। গাছটা যখন ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে ভূত জাতি। এটাই নায়া বলেছিল আমায়, যে, আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে ভূত জাতির প্রাণ ভোমরা এই গাছ। আর সময় নেই, চলুন, দেয়ালের দিকে চলুন, আসুন,' বলে ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল নোয়ি।

খোলা জায়গায় বাতাসের তোড় ভয়াবহ। কয়েক কদম দু'পায়ের ওপর এগুতে পারলেও বাকি পথ হামাগুড়ি দিতে বাধ্য হলো ওরা। বেশ কিছুক্ষণের কঠোর পরিশ্রমের পর ওরা গিয়ে পৌঁছুল দেয়ালের গায়ে পাথুরে সিঁড়ির ধাপের কাছে। পাথুরে ধাপগুলো উঠে গেছে দেয়ালের চূড়ায়। ওখান থেকে আরো অনেকগুলো ধাপ উঠে গেছে একটা ওয়াচ টাওয়ারে। সিঁড়ি ধেয়ে ওপরে ওঠার সময় ওদের মনে হতে লাগল বাতাসের চাপে কাগজ যেভাবে দেয়ালের গায়ে লেপ্টে থাকে সেভাবে সিঁড়ির গায়ে ওদের চেপে ধরে আছে বাতাস। বহু কষ্টে একসময় ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছে গেল ওরা। ওখানে পৌঁছে তারপর একটু দম নেয়ার ফুরসত পেল র্যাচেলরা। কিন্তু লুপহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। তারপর হলো

আতঙ্কিত ।

প্রচণ্ড গরম আর শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে বনের গাছপালা শুকিয়ে উদ্বায়ী হয়ে উঠেছিল । ওই গাছগুলোর ওপরই উড়ে গিয়ে পড়ছে জলন্ত মসের ফুলকি । সাথে সাথেই আগুন লেগে গেছে গাছের শুকনো পাতায় । তীব্র বাতাসের ধাক্কা মুহূর্তের মধ্যে এই গাছ থেকে ওই গাছে, ওই গাছ থেকে সেই গাছে এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন । আস্ত একটা শীটের মতো পুরো বন ঢেকে ফেলেছে আগুনের চাদর । দৃশ্যটাকে রোমহর্ষক বললেও কম বলা হয়ে যায় । মাইলের পর মাইল জুড়ে যতদূর চোখ যায়, দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে । মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সন্ধ্যার লালিমা আর আগুনের সোনালী-কমলা আভা । সেই আভায় দেখা যাচ্ছে একটু আশ্রয়ের জন্য এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে শত শত বামুন । কিন্তু চারপাশে কেবল আগুনের শিখা ছাড়া আর কিছুই নেই । এদিকে ছুটতে চাইছে ওরা, পথ আটকাচ্ছে আগুন; ওদিকে ছুটতে চাইছে, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আগুনের দেয়াল, ডানে আগুন, বামে আগুন, উত্তরে আগুন, দক্ষিণে আগুন । ওদিকে গাছ থেকে ধ্বসে পড়ছে জ্বলন্ত ডালপালা । ছুটন্ত বামুন লোকগুলো সেই আগুনে পুড়ে তো মরছেই, আবার মাথায় ডাল পড়ে খেঁতলেও যাচ্ছে । পাচ্ছে নায়ার প্রতিশ্রুত রক্তাক্ত মৃত্যু ।

একটা দলকে দেখা গেল অভয়াশ্রমের দিকে ছুটছে । লাফিয়ে লাফিয়ে এই ঝোপ থেকে ওই গাছের পেছনে, সেখান থেকে আরেক পাথরের আড়ালে এভাবে ছুটছে ওরা । কিন্তু বনের প্রান্তে আসতে আসতে একজন মাত্র মানুষই জীবিত রইল । বাকিদের কেউ আগুন এড়াতে পারেনি । বেঁচে যাওয়া লোকটির মাথার চুল সব সাদা । পোশাকের নানা জায়গায় জ্বলছে ছোট ছোট শিখা । অভয়াশ্রমের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছেও গেল সে । একটু আগে

বাড়তেই হাতের নাগালে পেয়ে গেল নায়ার রোপণ করে যাওয়া ছোট চারা গাছটা। এক টানে ওটা উপড়ে নিয়ে গাছটা দিয়েই নিজের গায়ে ডলতে থাকল সে। উদ্দেশ্য আগুন নেভাবে। কিন্তু এই গাছের রসও সম্ভ্রত উদ্বায়ী প্রকৃতির। ফলে চারা গাছটায় আগুন লাগতে সময় লাগল না। জ্বলন্ত গাছটা পুড়িয়ে দিল তাকে। চারাটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ালের দিকে ছুটতে শুরু করল লোকটি। এতক্ষণে পরিষ্কার দেখা গেল, লোকটি হচ্ছে পুরোহিত এডো।

হঠাৎ করেই পড়ে গেল নোয়ি। রিচার্ড এগিয়ে গেল ওকে ধরে দাঁড় করাতে। কিন্তু ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল নোয়ি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘ছাড়ুন, আমাকে ধরতে হবে না। মারা যাচ্ছি আমি। গাছটায় আগুন দেয়ার জন্য মৃত্যুগুহার ভেতর ঢুকেছিলাম আমি। ওটার বিষ কাজ করতে শুরু করেছে। তবে আপনাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি, বোন। আপনাকে আর আপনার ভালবাসার মানুষকে, দু’জনকেই বাঁচিয়েছি। ধূসর জাতি এখন ধূসর ছাই হয়ে গেছে। ওরা আর আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বোনের প্রতি ভালবাসার কারণেই এত বড় পাপ করলাম আমি। তবে ভালবাসার শক্তি অনেক বড়। তাই ভালবাসার জন্য কৃত এই পাপেরও ক্ষমা পাব আশা রাখি। বোন, আগামী দিনগুলোয়, সুখের দিনগুলোয় আমাকে মনে রাখবেন। আর পার্থিব জীবনের পর অন্য দুনিয়ায় যখন থাকবেন, ভূতের জগতে আমায় খুঁজবেন।’

নোয়ির কথা শুনতে শুনতে অন্য একটা আগুয়াজ কানে এল ওদের। র্যাচেলদের আশ্রয়ে মাথা জাগাল এডো। পোশাকের জায়গায় জায়গায় ফুলকির মতো আগুন জ্বলছে। কালিঝুলি মেখে বিবর্ণ হয়ে আছে মুখ। দেয়াল ঘেঁষে বসে সে তাকাল নোয়ির দিকে। ‘হিসহিসে কণ্ঠে নোয়িকে বলল, ‘এদিকে

আয়, সেয়াপির মেয়ে। দেখ, কী করেছিস তুই। আদি ভূত জাতিকে ধ্বংস করে ফেলেছিস। বল, কেন এই কাজ করেছিস? কেন? মরার আগে আমাকে জানতেই হবে। ওপাশে গিয়ে পূর্বপুরুষদের কাছে জবাব দিতে হবে আমায়।’

সম্মোহিতের মতো এডোর দিকে এগিয়ে গেল নোয়ি। যেন, হুকুম অমান্য করার সাধ্য ওর নেই। টারেটের বাইরে মুখোমুখি বসল দু’জন। বাতাসের তোড়ে উড়ছে নোয়ির লম্বা চুল। ও বলল, ‘আমার বোন আর তার ভালবাসার মানুষকে বাঁচাতে এই কাজটা করেছি আমি। নায়ার মৃত্যু তোমরা ডেকে এনেছ, তাই ওর হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ কাজ করেছি। এ কাজ করেছি, কারণ তোমার পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। তোমাকে আর পাপী ভূত জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার।’

ওনে এডো মন্তব্য করল, ‘হ্যাঁ, তা-ই হয়েছে। আমার শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে ওই সাদা নারীর জাদু। ওর উপস্থিতিতেই পতন ঘটেছে ভূত জাতির, পতন ঘটেছে বিশাল মহীরুহের বনের। কিন্তু, বেইমান, এবার তোরও সমাপ্তি ঘটবে,’ বলেই লাফিয়ে উঠল এডো। র্যাচেল বা রিচার্ড কিছু করার আগেই আঁকড়ে ধরল নোয়িকে। মুহূর্তেই টেনে নিয়ে গেল টাওয়ারের প্রান্তে। একটু ধস্তাধস্তি করল বটে নোয়ি। কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে হার মানতে বাধ্য হলো ও। র্যাচেলরা আসার আগেই নোয়িকে নিয়ে আছড়ে পড়ল ষাট ফুট নীচের পাথুরে চাতালের ওপর। মারা গেল এডো, মারা গেল নোয়ি।

এভাবেই ভালবাসার মানুষটিকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বলি দিল নোয়ি।

পরের দিন সকাল। বনের আগুন প্রায় নিভে গেছে। গতরাতে ঝড়ো বাতাস থামার পরই নেমেছিল প্রবল বৃষ্টি। তাতেই নিভেছে আগুন। যদিও বনের ধ্বংস হওয়া তাতে থেমে

যায়নি। এখনও এখানে ওখানে ধিকি ধিকি জ্বলছে পোড়া কয়লা। ওর মধ্য দিয়েই অভয়াশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে এল র্যাচেল আর রিচার্ড। বাইরে বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। গতকালই যেখানে দেখেছিল আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল বড় বড় সবুজ গাছের বন, আজ সেখানে কেবল ধূসর ছাই, পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া কাণ্ড আর কাদা ছাড়া আর কিছু নেই।

বহু কষ্টে ছাই-কাদার সাগর পাড়ি দিয়ে ওরা চলে এল সাবেক বনের প্রান্তের সমতলে। এখানে দাস গ্রামে ঢুকে পড়ল ওরা। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আগুনের ভয়ে গ্রামের বাসিন্দারা সব ফেলে পালিয়ে গেছে। যদিও ওদের খোঁয়াড়ে রয়ে গেছে অনেক গবাদি পশু। আর আছে ঘর ভরা খাবার। একখান থেকে দুধ নিল ওরা। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলে উঠে আবার খেল। আস্তে আস্তে শক্তি ফিরতে শুরু করল। পরদিন সকালে গ্রামের প্রান্তে ছোট টিলা আকারের মাটির স্তূপের ওপর উঠল দু'জনে। তাকিয়ে রইল পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বনের দিকে। একবার পেছনে ফিরেও তাকাল। দেখল, পেছনে গ্রামের সীমার বাইরে থেকে নদী পর্যন্ত বিছিয়ে আছে সবুজ ঘাসের চাদর।

বনের ছাই দেখিয়ে রিচার্ড বলল, 'ওই ছাইয়ের তলায় চলে গেছে আমাদের সমস্ত দুঃস্বপ্ন।' তারপর পেছনের উর্বরা ঘেসো প্রান্তর দেখিয়ে বলল, 'আর ওখানে ফুলের ডালি সাজিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সোনালী ভবিষ্যৎ।'

'হ্যাঁ, ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে আছে নোয়ি'র যাদের আমি ভালবাসতাম তাদের সবার স্মৃতি। এখন কেবল তুমি ছাড়া আমার আর কোন অতীত নেই,' বলল র্যাচেল।

'র্যাচেল, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে জীবন ফিরে পেয়েছি আমরা। আর আমি পেয়েছি তোমায়। এতকিছুর পর নিশ্চয়ই দয়াময় বিধাতা আমাদেরকে আর আলাদা করবেন না। আমরা

নিরাপদেই থাকব। আমার সাথে মরু পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই ভয় পাবে না তুমি?’

রিচার্ডের দিকে ফিরে দাঁড়াল র্যাচেল। চোখে আত্মবিশ্বাস আর নির্ভরতার দৃষ্টি। বলল, ‘না, রিচার্ড। আমি ভয় পাই না। নোয়ির কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। ও বলছে সমস্ত বিপদ পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। এখন আমরা নিশ্চিত্তে জীবন কাটাব, ঠিক যেমনটা বলেছিল আমার মা। অবশ্য তুমি যদি চাও তাহলেই।’

পরস্পরের বাহুতে ধরা দিল র্যাচেল আর রিচার্ড।

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG